ধ্বনি
থেকে
কবিতা

ধ্বনি থেকে কবিতা

সন্‌জীদা খাতুন

বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ
শান্তিনিকেতন

প্রথম প্রকাশ : ১৫ ভাদ্র ১৩৬৪

প্রচ্ছদ : শমীন্দ্র ভৌমিক

প্রকাশক : সুব্রত চক্রবর্তী
বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ
শান্তিনিকেতন ৭৩১ ২৩৫

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার
টেকনোপ্রিণ্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

নিবেদন

'ধ্বনি থেকে কবিতা' বাংলাভাষার গবেষণার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি নতুন পদক্ষেপ। ধ্বনিশাস্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক অথচ মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের জন্য গ্রন্থটি সমাদৃত হবে আশা করা যায়। পূর্বাচার্যগণের বিশেষ করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আবদুল হাই, ফার্গুসন মুনীর চৌধুরী প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অন্যান্য বিদগ্ধজনের মতামত উল্লেখশেষে অধ্যাপক সন্‌জীদা খাতুন নিজস্ব চিন্তিত বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন

সুব্রত চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন

সম্পাদক

বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ

উল্লেখযোগ্য সংশোধন

পৃ. ৪৫ ॥ ‘অ ও-র মাঝামাঝি স্বরধ্বনি’ শিরোনামে ৮ম পঙ্‌ক্তিতে ‘ই ধ্বনিব স্থান’ স্থলে ‘এই ধ্বনির স্থান’ পড়তে হবে।

পৃ. ৭৬ ॥ তৃতীয় অনুচ্ছেদে ৭ম পঙ্‌ক্তির পাদটীকার সংখ্যা ২৭২-এব জায়গায় ২৭১ হবে।

সূচি

ভাষাধ্বনির স্বকীয় গুণ প্রসঙ্গ

আমরা জানি, কবিতায় ব্যবহৃত ধ্বনিময় শব্দাবলী কবিতার অভিধাগত অর্থবহনের অতিরিক্ত আরো কোনো ভাব পাঠক-শ্রোতার মনে সঞ্চালিত করে দেয়। এই ভাবব্যঞ্জনায় ভাষার ধ্বনির অর্থাৎ স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির স্বকীয় কোনো গুণ কাজ করে কি? তাহলে শুধু কবিতা নয়, সাহিত্যমাত্র নয়, বক্তব্য প্রকাশের সকল ভাষাতেই ধ্বনির ভাবময়তা ব্যঞ্জনা ঝংকৃত করে চলত। খানিকটা এমন ঘটেও হয়তো। তা ঠিক কোন্ গুণে, তার সন্ধান দরকার। তার সীমানাটাও আমাদের বুঝে নিতে হবে।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "ধ্বন্যাত্মক শব্দ" প্রবন্ধ পড়ে উদ্দীপ্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ধ্বনিমালা নিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবনা করেছিলেন। লিখেছিলেন— 'প্রত্যেক ধ্বনির একটা নৈসর্গিক তৎপরতা আছে এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত। কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ট-বর্গের ধ্বনি জন্মে; কোমল দ্রব্যের আঘাতের সহিত ত-বর্গের ধ্বনির সম্পর্ক; ফাঁপা জিনিসের ভিতর হইতে বায়ু-নিঃসরণে প-বর্গের ধ্বনি জন্মে; ইত্যাদি। প্রত্যেক ধ্বনি স্বভাবত কাঠিন্য তারল্য কোমলতা শূন্যগর্ভতা প্রভৃতি এক-একটা বস্তুধর্মের সম্পর্ক রাখে ও সহকারিতা রাখে; এবং প্রত্যেক ধ্বনি শ্রুতিগত হইবামাত্র ঐ ঐ ধর্ম স্মরণ করায় বা ব্যঞ্জনা করে।··· প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনির মধ্যে আবার অল্পপ্রাণতা বা মহাপ্রাণতা, ঘোষকতা বা ঘোষহীনতার ভেদে সেই তাৎপর্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। প-বর্গের বর্ণমধ্যে প ও ফ উভয়েই বায়ু-পূর্ণতা বা শূন্যগর্ভতা স্মরণ করায়; কিন্তু প'র চেয়ে ফ'র জোর যেন অধিক; ব'র চেয়ে ভ'র স্থূলতা যেন অধিক। এই স্থূলতার আধিক্যে যাবতীয় ভ-কারাদি শব্দ স্থূলতা মনে আনে, এবং স্থূলতার সহকারী আলস্য ঔদাস্য প্রভৃতি মানসিক ধর্মও মনে আনে। মূলে যাহা ধ্বন্যাত্মক বা নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতিজাত, তাহার অর্থ ও তাৎপর্য ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া ব্যঞ্জনার দৌড় ক্রমে বাড়িয়া যায়।'[১] উদ্‌ধৃতি দীর্ঘ হলেও 'রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র' প্রথম খণ্ডের ৪৪-পৃষ্ঠাব্যাপী "ধ্বনি-বিচার" প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ ধরা রয়েছে এ-টুকুতে। রামেন্দ্রসুন্দর, পদার্থবিজ্ঞানসম্মত ভাবে, উৎপন্ন হবার কালে ধ্বনি যে-সব স্বাভাবিক ধর্ম অর্জন করে তার সঙ্গে

সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ ভাবের যোগ নির্দেশ করেছেন। উচ্চারণস্থান এক হলেও স্বরতন্ত্রীর কম্পন কিংবা কণ্ঠনালীয় হ্-ধ্বনির যোগে প্রত্যেক ব্যঞ্জনধ্বনি আবার কিরকম স্বাতন্ত্র্য আয়ত্ত করে আপন ভাবগত পার্থক্য খাড়া করছে তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রমও ঘটে, কারণ, শব্দে বিন্যস্ত ধ্বনি আবার পার্শ্বস্থ ধ্বনিপ্রভাবে ভিন্নগুণ আয়ত্ত করে উচ্চারণ প্রক্রিয়াজাত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকে সরে যেতে পারে। যাই হোক, ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণগত চরিত্র— কাঠিন্য তারল্য ইত্যাদি 'ধর্ম স্মরণ করায়' বা নানা 'মানসিক ধর্ম মনে আনে' উল্লেখ করে, রামেন্দ্রসুন্দর বাস্তবিক বাংলাভাষার ধ্বনিবিষয়ে বাঙালির জাতিগত সংস্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

প্রত্যেক জাতিই দীর্ঘ অভ্যাস বশে স্বভাবগত কিছু ঐক্যের উত্তরাধিকার পায়। তার ফলে এক ঐতিহ্যে লালিত মানবগোষ্ঠীর মনে একজাতীয় সংস্কার গড়ে ওঠে বলেই 'নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতি জাত' ধ্বনির ভাবগ্রহণে, বা 'তার অর্থ ও তাৎপর্য'-সূত্রে ব্যঞ্জনা ক্রমে বেড়ে গেলেও, সেই ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ভাষাবোধে বা ব্যবহারে এক জাতির মানুষের কোনো বাধা হয় না। এভাবে জাতিগত সংস্কার ভাষার ধ্বনিতেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত করতে পারে। কালে সংস্কারের হেরফের ঘটা সম্ভব। সেইমতো জাতি আবার ভাবনা চিন্তাকে ঢেলে সাজিয়ে নেয়।

"ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, বাংলা শব্দে ট-য়ের ব্যবহার কম বলে জোড়া শব্দে তাৎপর্য বাড়াবার কাজে ট বেগার খাটে। কখনো কখনো এই সরকারী ট-য়ের বদলে ফ আসে 'একটিনি' করতে। কিন্তু ফ-য়ের ব্যবহারে প্রকাশ পায় অবজ্ঞার ভাব। 'যদি বলি লুচিটুচি তবে লুচির সঙ্গে কচুরি নিমকি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই, কিন্তু লুচিফুচি বলিলে লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্কমাত্র থাকে না।'[২] মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, কিংবা সকল কিছুকেই তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে পরোক্ষে আপন শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার নাগরিক-সুলভ ঝোঁকে বেগার খাটবার কাজে ইদানীং ওই ফ-কে ব্যবহার করা হচ্ছে বেশি। 'লুচিফুচি আমার ভালো লাগে না' বললে অবজ্ঞা স্ফূর্ত হবে ঠিকই, আবার সমাদর বোঝাবার জন্যেও একই যুগ্ম শব্দ ব্যবহার হতে পারে— 'ওঃ সে কী আপ্যায়ন! লুচিফুচি কত কী এনে হাজির করল!' এই জাতীয় ফ-এর ব্যবহার আজকাল বেশ বেড়ে গেছে। ৯ অক্টোবর ১৯৮২-র সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার একটি গল্পে যেমন পাচ্ছি—'চার-ফার যা সব লাগবে, তোর রেসপনসিবিলিটি। ওনাকে নিয়ে

যাবি পুকুরে। ঘাট-ফাট নতুন করে হয়তো করতে হবে।'[৩] 'কাব্যালোক' পুস্তকে সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 'নানাবিধ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন' থেকে 'কালক্রমে' ধ্বনির পরিবর্তন দেখা দেবার কথা আলোচনা করেছেন।[৪]

১৩১১ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এ রবীন্দ্রনাথ "ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধ পাঠ করলে সভাতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের 'পরিবর্তনশীলতা'র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সে-প্রসঙ্গের জবাবে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন— 'বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহাদিগকে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মনে করেন। যদিই তাহা হয় তবে একটা-দুইটা হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের দল সমস্তই নহে।'[৫] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আরো বড়ো কথা তুলেছিলেন— 'বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহাদিগকে ভঙ্গুর বলিতেছেন কেন। কতগুলি শব্দ কেন, সমস্ত ভাষাই তো ভঙ্গুর।...যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন ভাষা-তত্ত্বেও খাটে।'[৫] শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'বড়ো কথাগুলির অর্থ, ভাব ও ব্যবহারই পরিবর্তিত' হয়, যেমন অনেক সংস্কৃত শব্দ বাংলাতে এসে বদলে গেছে। কিন্তু তাঁর মতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ সহজে পরিবর্তিত হবার নয়। বক্তব্য শেষ করেছেন দৃষ্টান্ত দেবার ছলে বাঙালির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি কৌতুক কটাক্ষ করে— '...পরিবর্তিত হইবে কেন। বাঙালি কি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিবে না, প্যান্ প্যান্ করিয়া কাঁদিবে না, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া চাহিবে না?'[৫] বাদানুবাদের বিবরণ থেকে সার-কথা পাওয়া যায়, পরিবর্তনশীলতা ভাষার ধর্ম এ কথা স্বীকার্য। তবে ধ্বন্যাত্মক শব্দে জাতিচরিত্র এমন স্পষ্ট, যে ভাষার অন্যান্য শব্দের তুলনায় তার পরিবর্তন আশু নয়।

জাতীয় স্বভাবে সাময়িক বিকার দেখা দিলেই হয়তো ট-কে হটিয়ে ফ জায়গা দখল করে। এ-ও বলতে গেলে ফ-র 'একটিনি' করাই, মৌরুসি পাট্টা নেওয়া নয়। বাজার চলতি কায়দার চলাচল বিশেষ সময় এবং স্বভাবের সীমায়। তার এপারে ওপারে জাতিস্বভাবের বহমান ধারা আপন খাতেই চলবে। প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্বের প্রভাব কখনো সে-স্বভাবকে বিচলিত করে আপন স্বাতন্ত্র্য মুদ্রিত করে দিতে পারে হয়তো। তবু ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরিবর্তন তত সহজ নয়।

ভাষার সব শব্দেই যে ধ্বনির স্বকীয় গুণ অনুযায়ী অর্থময় ভাবময় স্বরব্যঞ্জনের বিন্যাস ঘটে, এমন নয়। সকল শব্দসৃষ্টির মূলে তাৎপর্যময়তা পাওয়া যাবে না। কেবল অনুকারবাচক বা ধ্বন্যাত্মক শব্দগঠনের মূল হিসেবেই অনোম্যাটোপিক বা **bow-wow theory** কল্পনা করা চলে এ-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি— 'এই ভেউ-ভেউ-বাদের দৌড় খুব অধিক নহে'।[৬] রবীন্দ্রনাথ অনুকারবাচক শব্দগুলির

ভাব-অভিব্যক্তির শক্তি বিষয়ে লিখেছেন— 'বাংলাভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ···সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে।'[৭] রামেন্দ্রসুন্দরও বলেন— এই-সব ধ্বনিনির্ভর শব্দ বাংলায় 'অন্য ভাষার চেয়ে অধিক।'[৮] বিশেষ, কাব্যে এ-সব শব্দের স্বীকৃতি বেশি। ভারতচন্দ্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংস্কৃতে ভবভূতির মতো কবিদের কাব্যদেহেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ সমাদর পেয়েছে। *The Making of English* গ্রন্থ থেকে দৃষ্টান্ত টেনেছেন রামেন্দ্র-সুন্দর— '···a word with a long vowel, which we naturally utter slowly, suggests the idea of slow movement. A repetition of the same consonant suggests a repetition of movement. Sequences of consonants which are, harsh to ear, or involve difficult muscular effort in utterance, are felt to be appropriate in words descriptive of harsh or violent movement.'[৯]

পদার্থবিদ Sir Richard Paget 'gesture-origin theory' নামে একটি মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে Howard Peacy তাঁর *The Meaning of Alphabet* গ্রন্থে Paget-এর সকল বক্তব্য গ্রহণ না করলেও তাঁকে সমর্থন করে বলছেন যে, অক্ষর বা বর্ণধ্বনির যুক্তিগ্রাহ্য তাৎপর্য আছে, ধ্বনির মূলে নিহিত উচ্চারণপদ্ধতি বা বর্ণ-উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ধারা থেকে সে-তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে।[১০] রামেন্দ্রসুন্দরের মতের সঙ্গে এর সাযুজ্য লক্ষ করি। Roman Jakobsonও তাঁর *Selected Writing I* গ্রন্থে 'Tonality Features' প্রসঙ্গে ধ্বনির গাম্ভীর্য অথবা তীব্রতা, প্রান্তিক মসৃণতা বা অমসৃণতা. সংহতিসৌষ্ঠব বা অসংহতির পিছনে উচ্চারণস্থলের পেশী-ব্যবহারমূলকতার বিজ্ঞান-সম্মত বিবরণ দিয়েছেন।[১১]

১৯৫৮ সালে Indiana University-তে অনুষ্ঠিত কন্‌ফারেন্সে Dell H. Hymes তাঁর 'Phonological Aspects of Style : Some English Sonnets' প্রবন্ধে Paget-এর gesture-origin theory সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, Brown ও পরবর্তী অন্যান্য গবেষকদের পরীক্ষামূলক বিচার-বিশ্লেষণ থেকে বোঝা গেছে যে, বিশ্বজনীন বহুবিস্তৃত ধরনের ধ্বনিপ্রতীকের অস্তিত্ব-সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হঠকারিতা। তাঁর মতে মূলের বা উৎসের (origin)

দৃষ্টিকোণ থেকে এ চিন্তা ভ্রান্ত হলেও, ভাষার রীতিনীতি বা চালচলনের দিক থেকে দেখলে ঐ মতকে অস্বীকাব করা ধ্বনির উৎপত্তি তথা জন্মসত্যকেই অস্বীকার করবার মতো ভুল হবে।[১২]

উপরের আলোচনায় ধ্বনি উচ্চাবণের শারীরিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাব বা অর্থের যোগ প্রসঙ্গে, উচ্চারিত ধ্বনির বিশ্বজনীন বা **universal** ঐক্যের মতবাদ উপস্থিত হচ্ছে। বস্তুত স্বর বা ব্যঞ্জনের উচ্চারণ গঠনের সঙ্গে অর্থময় ভাবের যোগাযোগ থাকলে, তা জাতিগত ব্যাপারের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বগত ব্যাপার হয়ে ওঠে। বিষয়টির প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর সকল ভাষার বিস্তারিত ও সার্বিক পরিচয় সংকলন ও অধ্যয়ন প্রয়োজন বলে এর মীমাংসা এখনো সম্ভব হয় নি। প্রাগ বা প্রাহা স্কুল প্রচারিত এই মতের বিরুদ্ধতাও প্রবল। **J. R. Firth** তাঁর ***Papers on Linguistics*** বইয়ে বলিষ্ঠ ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেছেন যে সাধারণ মানব পরিভাষায় শব্দ, ধ্বনি কিংবা সিলেবলের কেনো সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। সর্ব মানবের ভাষায় সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য বিভিন্ন ধ্বনিমূলের **(Phoneme)** কল্পনাও সম্ভব নয়। **Firth**-এর মতে—সাধারণ মানব পরিভাষায় ধ্বনিপ্রতীক-বা প্রতিমা- **(Sound symbolism)** তত্ত্ব কোথাও গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়নি, এবং প্রাগ বা প্রাহা স্কুল আর তার অনুসারীদের শ্রম সত্বেও **Phonology** বা ধ্বনিপ্রক্রিয়াও শুধু নির্দিষ্ট ভাষাসমূহের সুসম্বদ্ধ পঠনপাঠনের উদাহরণস্বরূপ হয়ে রয়েছে।[১৩]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় সার্বজনীন ধ্বনিপ্রতীক ও ধ্বনিসংস্কার-বিরোধী **Firth** পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট এবং সীমিত সংখ্যক ভাষার ভিতরে সেরকম ধ্বনিমালাব স্বকীয় তাৎপর্যময়তার তত্ত্বকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। তবে, আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ভাষার সকল ধ্বনি তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য করা কঠিন, প্রধানত ধ্বন্যাত্মক শব্দের সীমাতেই ধ্বনির অর্থবহতার কথা ভাবা চলে। রবীন্দ্রনাথ 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের "ধ্বন্যাত্মক শব্দ" "ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধে এবং রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর "ধ্বনিবিচার" প্রবন্ধে— 'বাঙ্গালা ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা' করেই বাংলাভাষার অনেক শব্দে অর্থময় ধ্বনি ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে 'বাংলাভাষায় সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বোধই অধিকাংশ স্থলে শ্রুতি-গম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে।'[১৪] এবং 'তাহাদিগকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত।...ইহাবা না থাকিলে বাংলাভাষায় বর্ণনার পাঠ একেবার উঠাইয়া দিতে হয়।'[১৪]

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ধ্বনি ও তার অর্থ প্রসঙ্গে তাঁর 'কাব্যালোক' বইতে বলেছেন যে বিশিষ্ট ধ্বনির সঙ্গে অর্থের 'অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক' থাকতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এক ধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকে। এক ভাষাতেই, একই ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে। একই অর্থ প্রকাশে বিভিন্ন ধ্বনির ব্যবহারও দেখা যায়। তাছাড়া— 'একই ধ্বনি একই ভাষায় একই অর্থে নির্দিষ্ট থাকলেও কালক্রমে নানাবিধ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে, অথবা বিচিত্র অনুষঙ্গ ধর্মে অর্থের প্রসার, অর্থের সংকোচ এবং নূতন অর্থের সংযোগ হেতু নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়া থাকে ; — এখানে ধ্বনি স্থির থাকিলেও অর্থের চলে বহুমুখী গতিপ্রবাহ। আবার অর্থ স্থির থাকিলেও ধ্বনির নানা পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, হয়তো পরিবর্তিত শব্দটিকে পরে আর চেনাই যায় না।'[১৫]

কালক্রমিক পরিবর্তনসহতা সত্ত্বেও এক জাতি ও তার সংস্কৃতির স্বভাবে ধ্বনি ও অর্থের 'আপেক্ষিক নিত্য সম্বন্ধ' -চেতনা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যেতে পারে. শব্দ[১৬] ও তার অর্থ বিষয়ে সুধীরকুমারের নিম্নলিখিত উদ্‌ধৃতিকে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে এ কথা বলা চলে। তিনি লিখেছেন—'শৈশব হইতে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এত গভীর ও দৃঢ় হয় যে, মনে হয়, চিত্তে উহাদের একটি আর-একটির অ-বিনা ভাবেই থাকে।'[১৭] উল্লিখিত শৈশব কেবল ব্যক্তির নয়, জাতির—এ কথা উপলব্ধি করলে জাতিগত সংস্কারে ধ্বনির তাৎপর্যের বোধ সঞ্চিত থাকা সম্ভব বলে গ্রহণ করা যায়। সুধীরকুমার সাধারণভাবে ধ্বনির অর্থতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করলেও বাংলাভাষায় বিশেষ স্বরধ্বনির ব্যবহারে বিশেষ ভাবের দ্যোতনার সপক্ষে লিখেছিলেন— 'আমাদের ভাষায় ই-কার ক্ষুদ্রত্ব এবং আ-কার বিশালতা বা বড়ত্ব-সূচক, যেমন,— একটি-একটা, কুশী-কোশা, পুটলি-পোটলা, ছুরি-ছোরা ইত্যাদি। অনাবৃত আ ধ্বনির মধ্যেই এই বিপুলতা বা বিশালতা রহিয়াছে। এইজন্য মহাকবি কালিদাস সংস্কৃতেও আ-ধ্বনির কুশল সজ্জা করিয়া সমুদ্রের ও তীরবর্তী বনরাজির বিপুলতা বা বিশালতা বুঝাইয়াছেন, যথা,-দূরাদ অয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী / তমাল-তালী-বনরাজি-নীলা। / আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে / ধারা-নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥ রঘুবংশ, ১৩।১৫— এখানে বনরাজির বর্ণনায় দ্বিতীয় চরণে চারটি আ-ধ্বনি— এবং সমুদ্র বর্ণনায় তৃতীয় চরণে পাঁচটি আ-ধ্বনির প্রয়োগ দ্রষ্টব্য, আরম্ভ ও সমাপ্তিও লক্ষণীয়।'[১৮] অর্থাৎ, বাংলা ভাষার কথা দিয়ে শুরু করে সুধীরকুমার শেষে ভাষাবিশেষের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলে গেলেন সংস্কৃতের

দৃষ্টান্তে। ইংরেজি ভাষাতেও এই স্বরধ্বনির তাৎপর্যময়তার প্রসঙ্গ সমালোচকদের বিশ্লেষণে বারবার এসেছে।

P. M. Witherill তাঁর *The Literary Text : An Examination of Critical Methods* গ্রন্থে সাহিত্য সমালোচনায় ধ্বনির অর্থময়তার তত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের মত আলোচনা করে বলেছেন— বিশেষ বিশেষ ধ্বনির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ আবেগময় অভিজ্ঞতা বা অবস্থার সহচারিতা থাকার ধারণা ঠিক বলে মনে হয়। M. Chastaing-এর ই-স্বরধ্বনির প্রতীক মূল্য পরীক্ষা এবং তার ব্যবহারিক ব্যাখ্যা Witherill-এর মনে বিশ্বাস এনেছে যে ই-স্বরধ্বনির সঙ্গে চিৎকার, আকস্মিক গতি, তীক্ষ্ণতা এবং ক্ষুদ্রতার যোগ থাকা সম্ভব। Witherill লিখছেন— Albert Wellek দেখিয়েছেন যে, সম্মুখ (ই এ অ্যা) স্বরধ্বনির সঙ্গে দ্রুত পরিষ্কার অথবা উজ্জ্বল বস্তুর যোগ আছে, আর, পশ্চাৎ (অ ও উ) স্বরধ্বনির সঙ্গে রয়েছে বিপরীত ধরনের বস্তুর সংস্রব। Witheril আরো বলছেন— Grammont ...takes this a great deal further associating sharp vowels with pain, anger, irony, worry, linking bright vowels with joy and dark vowels with anger, heaviness, grave or sombre ideas and languor... ।[১৯] Grammont-এর উক্তিতে আবার স্বরধ্বনির উজ্জ্বলতা অনুজ্জ্বলতা অর্থাৎ বর্ণের প্রসঙ্গ এল। ধ্বনির রঙের কথায় আমরা পরে আসছি।

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত Clarence Sloat, Sharon Henderson ও James E. Hoard-এর যৌথ রচনা *Introduction to Phonology* গ্রন্থে ধ্বনি ও অর্থের যুগলবন্ধনকে খামখেয়ালি (arbitrary) ব্যাপার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষা থেকে সমার্থবাচক অথচ ধ্বনিগতসাদৃশ্যবিহীন, বা সমোচ্চারিত অথচ ভিন্নার্থ শব্দের দৃষ্টান্ত সহযোগে এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রশ্ন, তবে ইংলিশ ঘণ্টা কেন ding-dong বলে আর জার্মান বলে bim-bam, অথবা ইংরেজ কুকুর যদি বলে bow-wow, woof-woof, বা yap— ফরাসী কুকুর কেন বলে gnaf-gnaf ?

আন্তঃভাষা ধ্বন্যাত্মক শব্দসাদৃশ্যের প্রসঙ্গে না গিয়ে সাধারণভাবে ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দের অর্থবহতার পক্ষে আমরা *Making of English* প্রণেতা Henry Bradley-র ব্যাখ্যাতে প্রশ্নটির উপযুক্ত উত্তর পাব। Bradley বলেছেন —অব্যক্ত (inarticulate) ধ্বনিতে অনুকার শব্দেতে যে মিল, তার সঙ্গে

শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির চেয়ে আমাদের মানসিক ধারণাকল্পনার উপক্ষেপের (suggestion) সাম্য বেশি। বন্দুকের গর্জনে বা দরজা বন্ধ করবার দমকে সত্যি 'bang' আওয়াজ ওঠে না। কিন্তু বিশেষ প্রকার ব্যঞ্জনধ্বনির বিন্যাসক্রমের দরুন 'bang' শব্দের উচ্চারণে প্রাবল্য প্রতিধ্বনিত হয়। তাতে আচমকা শব্দের ভাবটি ধরা পড়ে। শব্দান্তের নাসিক্য ব্যঞ্জনটি আবার প্রতিধ্বনিত অনুনাদকে আপনার ভিতরে ঝংকৃত করে তোলে। এই অনুকার ধ্বনিগুলো প্রতিধ্বনি মাত্র না হয়ে, হয় প্রতীকস্বরূপ। Bradley-র মতে—শব্দের গঠনের উপাদানসমষ্টি একটি মানসিক প্রভাব সৃষ্টি করবার জন্য একত্র হয়, আর সেই জোটকেই আমরা বস্তুধ্বনির সদৃশ বলে অনুভব করি। অনেক সময়েই মনে হয় যে একটি শব্দ যেন বিশেষ তাৎপর্যবিকাশের স্বভাবসংগত যোগ্যতা ধরে, যদিও সবক্ষেত্রে ঐ ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যুক্তিধারা খুঁজে বার করলেও দেখা যায় এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম ব্যাখ্যা দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ বাঁধা ছকে ফেলে সমস্ত অনুকার শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না।[২০] Bradley-র এই বিশ্লেষণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যাচ্ছে যে, মানসিক ধারণাকল্পনা ভাষার গঠনে, বিশেষত ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্ষেত্রে, মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে।

Jack Rosenthal-এর একটি রচনায়, একজাতীয় ধ্বনিব বিবরণের জন্যে বিভিন্নরকম ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রচলন বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ বিচার ও মীমাংসা রয়েছে। লেখাটির নাম **'Your splat ! is my potsch !' Rosenthal** বলতে চেয়েছেন — ভাষা খামখেয়ালি এবং তাতে কোনো বস্তুগত বিশ্বজনীন সত্যের চেয়ে আপন সংস্কৃতির প্রতিচ্ছায়াই পড়ে বেশি। তাঁর ভাষায়— **'In short, people around the world form sound words depending on how they see, hear or experience the word. Their sound symbols can be every bit as different as theirs different perceptions of their different cultures !'**[২১]

ধ্বনির অর্থময়তা-তত্ত্বের বিরোধিতা করে Sloat প্রমুখ বলেছেন প্রচল ধারণা মতে i বা ডবল e, অর্থাৎ হ্রস্ব ই আর দীর্ঘ ঈ -যুক্ত শব্দ প্রায়শ ক্ষুদ্রতার ভাব ধরে, আবার অ বা আ স্বরধ্বনিযুক্ত শব্দ বহন করে বৃহত্ত্বের ভাব। বাংলা আর সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে সুধীরকুমার দাশগুপ্তের অনুরূপ উক্তি আমরা আলোচনা করেছি। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকেরা সচেতন যে এ মতের পক্ষে অনেক দৃষ্টান্ত

সংকলন করা যাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্তও যে পাওয়া যাবে না তা নয়। 'Little. pigmy, bit, teeny, wee' শব্দে ই বা ঈ ধ্বনির ক্ষুদ্রতার ভাব থাকলেও 'big' শব্দ বিপরীত উদাহরণ তুলে ধরছে। তেমনি 'tall, large' -এর অ / আ ধ্বনির বৃহত্ত্বের ধারণা খণ্ডিত হচ্ছে 'small' শব্দের দৃষ্টান্তে।

ভাষার সব শব্দকেই ধ্বনির স্বকীয়তার ধারণা দিয়ে বুঝে নেওয়া যাবে না— রামেন্দ্রসুন্দরের এই কথা আমরা এখানে আবার স্মরণ করব। তাছাড়া, নিয়মের ব্যতিক্রমের বিধানও তো ব্যাকরণেরই অন্তর্গত। ভাষাতাত্ত্বিক Sapir বলেছেন 'all grammars leak'।[২১] আর, ভাষার ধ্বনির স্বকীয় গুণ আছে কি-না— এ প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসার অপেক্ষা না করেও বলা যায়— জাতিগত ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে এক ভাষাভাষী মানুষের মনে ধ্বনিসংক্রান্ত একজাতীয় সংস্কার জন্ম নেয় বলেই সে-ভাষার কবিতা এক সংস্কৃতিসম্পন্ন পাঠকের মনে অভীষ্ট তাৎপর্য উদ্‌ভাসিত করতে পারে। এই কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা বর্ণমালার পুঙ্খানুপুঙ্খ ধ্বনি বিচারে উদ্যত হয়ে স্পর্ধাভরে বলতে পেরেছেন— 'শাব্দিক পণ্ডিতেরা ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি আলোচনায় অবজ্ঞা করিতে পারেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইবেন না। অন্নদামঙ্গলের— 'দ ল ম্ম ল দ ল ম্ম ল গলে মুণ্ডমালা' এবং 'ফ না ফ ন ফ না ফ ন ফণীফন্ন গাজে' প্রভৃতি পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে লুপ্ত হইবে না।'[২৩]

বিশেষ ভাবপ্রকাশ উদ্দেশ্যে বিশেষ রকম ধ্বনি ব্যবহার সর্বৈবভাবে কবির সচেতন প্রয়াস নাও হতে পারে। ভাষার শব্দগঠন বৈশিষ্ট্যে যে-সব মনোভাব বিধৃত আছে, তা বক্তব্যপ্রকাশসূত্রে চয়িত শব্দ আর তার বিন্যাসের গুণেও অনেকাংশে স্ফূর্ত হবে। অর্থাৎ চয়ন আর বিন্যাসের শিল্পে মূর্ত হবে কবির আপন গুণ এবং তা প্রকাশের সামর্থ্য। আবার, কবিতার সকল ধ্বনি এক তাৎপর্য-অভিমুখী না হওয়া সম্ভব। অর্থময় শব্দবিন্যাসের কালে কোনো ধ্বনি বিশেষ প্রাধান্য পাবে কোনো ধ্বনি হবে প্রচ্ছন্ন। তবু প্রচ্ছন্ন ধ্বনিও পরোক্ষে মূল স্বরের পরিস্ফুটনে সহায়ক হবে। প্রধান ও প্রচ্ছন্ন ধ্বনির সংগ্রহণে সাধারণ বক্তব্য প্রকাশের অবসরে ধ্বনিমূর্ছনা ক্ষণে ক্ষণে বা বিশেষ মুহূর্তে পাঠকের অন্তরকে কবিতার লাবণ্যবিভায় উদ্‌ভাসিত করবে।

কবিতার অবয়ব বিচারের দিক থেকে দেখতে গেলে শব্দনির্বাচন আর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য কবিতার ঝংকৃত ধ্বনি এবং ব্যঞ্জিত ধ্বনির উৎসস্বরূপ। যাঁরা ভাষা-ধ্বনির

অর্থতত্ত্বে আস্থা রাখেন না, তাঁরা আবার যুক্তির অতীত সম্পর্ক স্থাপনে ছন্দধ্বনির ক্ষমতার কথা স্বীকার করেন 'Sounds may be seen to set up not semantic relationships but supralogical ones'[২৪] এই গ্রন্থে কবিতা বিশ্লেষণ করবার সময় আমরা বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখব।

ধ্বনি বিষয়ে আরো কিছু কথা আছে। মানুষের বিচিত্র জটিল মন কত-কি কল্পনা করতে পারে, তার একটি নিদর্শন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করছি— 'শব্দের কি কোনো আকার আছে? প্রশ্নটা মাথায় আসে, কিন্তু জবাবটা ভেবে পান না হেমকান্ত। শব্দ সম্ভবত নিরাকার। তবু হেমকান্তর মন বলে, ওই পায়রার বুকুম বুকুম শব্দ ওর আকার গোল। তুলোর বলের মতো। স্টিমারের বাঁশির শব্দকে কি কখনো তাঁর সরু ও দীর্ঘ আকারবিশিষ্ট বলে মনে হয় নি? সেতারের ঝনৎকার যেন ফুলঝুরির বহুবর্ণ কেন্দ্রাতিগ অগ্নিবিন্দু। মাঝে মাঝে এই দুপুর বেলা তাঁর এসরাজ নিয়ে বসতে ইচ্ছা করে।··· এসরাজের ছড় টানলেই তাঁর চোখে ভেসে ওঠে তন্তুজালের মতো একটা আকৃতি। অদৃশ্য এক মাকড়সা অদ্ভুত দ্রুততায় বুনে চলেছে। জ্যোৎস্নারাত্রে বিরহী হরিপদ মাঝে মাঝে পুকুরের ঘাটলায় বসে আড়বাঁশি বাজায়। তখন চিত্রময় এক সাপের আকার খেলা করে হেমকান্তর চোখের সামনে। এই সবই ভ্রম হয়তো। শব্দের বাস্তবিক কোনো আকার নেই। কিন্তু হেমকান্তর ভিতরে তারা আকার পায়।'[২৫]

'শব্দ' বলতে ধ্বনির কথা এখানে। ভাষার ধ্বনি নয়, পাখির কণ্ঠে এবং যন্ত্রে উৎপন্ন ধ্বনি নিয়ে এই ভাবনাতে দেখা যায়, ধ্বনির স্বকীয় গুণপ্রসঙ্গ কেবল অর্থময়তার সীমানাতে আবদ্ধ নয়। ধ্বনির আকার কল্পনাও সম্ভব। হেমকান্তর মতো আমরাও মনে সে-আকার গড়ে তুলতে পারি বলে উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে আমাদের অনুভব এক হয়ে মেশে। এ-বিষয়ে বিশ্বের মানুষের সঙ্গে মিল থাক-না-থাক— এক সংস্কৃতির অধিকারী বাংলা ভাষাভাষী আমরা তো মনের মিল খুঁজে পাই! বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ধ্বনির আকারসংক্রান্ত পরীক্ষায় বিষয়টির প্রতিষ্ঠা হলে ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনির এই মাত্রাটিও নিশ্চয়ই কাব্য-সাহিত্য আলোচনার আওতায় চলে আসবে। প্রসঙ্গত, J. R. Firth-এর একটি ধ্বনি ও আকার সম্পর্কিত গবেষণার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি— 'I have myself made experiments with speakers of many languages belonging to all the principal races and have found, with Koehler, evidence of some correlation of

sounds with shape (sense of feeling them or of drawing them). The experiment consisted in drawing two shapes in line, one of a round bellying shape, 'clumpy' and the other a sharp anglur zigzag of point prickling in all directions. Two words were then offered in sound in roughly phonetic spelling as their names, *viz.* kikeriki and oombooloo. The only case when kikeriki was chosen as a suitable name for the clumpy figure occurred when someone wished to enliven the proceedings and provide amusement, which he invariably did.'[২৬]

গবেষণাগারের পরীক্ষায় ধ্বনির সঙ্গে বর্ণেরও যোগাযোগ ধরা পড়েছে। নিউইয়র্কের Haskins Laboratories-এ ঐ বিষয়ে গবেষণায় ধ্বনিমূলের (phoneme) চরিত্রবৈশিষ্ট্য আর বর্ণের গুণ বা ধর্মের ভিতরে সমন্বয়ী অনুষঙ্গ (synthetic associations) লক্ষ করা গেছে। Roman Jakobson সেই পরীক্ষার বিবরণ দিতে লিখেছেন— 'There seems to be a phenomenal affinity betweeen optimal chromaticity (pure red) and vocal compactness, attenuated chromaticity (yellow-blue) and vocalic diffuseness, optimal achromaticity (black-white) and consonantal diffuseness, attenuated achromaticity (grayed) and consonantal compactness; and, finally, between the value axis of colors (dark-light) and the tonality axis in language।'[২৭] উল্লিখিত গবেষণালব্ধ ফল এখনো সম্ভাব্যতার স্তরে ('seems to be') রয়ে গেছে বলে সাহিত্য আলোচনাক্ষেত্রে এর ব্যবহারযোগ্যতা অবিসংবাদী হয়ে ওঠেনি। Grammont-এর উক্তিতেও আমরা স্বরধ্বনির ঔজ্জ্বল্য বা ম্লানিমার প্রসঙ্গ লক্ষ করেছি। কিন্তু এ-সব বিষয় এখনো পূর্ণ প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় রয়েছে।

শঙ্খ ঘোষ 'নিঃশব্দের তর্জনী' গ্রন্থে "শব্দের পবিত্র শিখা" প্রসঙ্গে বলেছেন, কবিতার ধ্বনিগুণের সঙ্গে দৃশ্যগুণ কল্পিত হতে পারে। আলোচনাসূত্রে অন্য সাহিত্যিকদের সাক্ষ্যও তিনি তুলে ধরেছেন। 'শ্রুতিতে-দৃশ্যে একটা সংযোগ চাই শব্দগুলির মধ্যে, যেন শব্দের ও বর্ণের হাসিমুখ কান্নামুখ আছে, যেন বর্ণও কেউ ছুটে চলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, সিটওয়েল দেখেন এক-এক শব্দে এক-একরকম রঙ

বা স্পর্শের আভাস, র‍্যাঁবো তাঁর স্বরমালায় লিখে রাখেন 'আ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ সবুজ, ও নীল।'[২৮] ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার ফলের সঙ্গে র‍্যাঁবোর ধারণার মিল-অমিলের বিষয়ে কোনো বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হব না, কারণ কোনো মতকে অভ্রান্ত বলে ধরে নেবার অবস্থা গড়ে ওঠে নি এখনো। কেবল লক্ষ করব, এই উদ্‌ধৃতিতে বর্ণ তথা ধ্বনির ভাব ও ভঙ্গির কথা, রঙের কথা, এমনকি, স্পর্শের কথাও উল্লিখিত হল। এমনভাবে সকল দিক থেকে বিবেচনা করে দেখতে পেলে কাব্য-সাহিত্যের বহুমাত্রিক ও নিবিড়—সর্বাঙ্গীণ পরিচয় গ্রহণ সম্ভব হতে পারত। কিন্তু সাধারণ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলে ভাষার ধ্বনির এত ব্যাপক আলোচনার সম্ভাবনা এখনো দূরশায়ী।

কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিকা

কবিতায় উচ্চারিত ধ্বনির আবেদনই প্রথম। কারণ, মুদ্রিত কবিতার নীরব পাঠেও প্রতীক বর্ণমালায় বিন্যস্ত সুপ্ত ধ্বনিস্রোত পাঠ্য বিষয়কে করে তোলে শ্রাব্য। আধুনিক যুগে লিপিচিত্রের গুরুত্ব বেড়ে গেলেও, কবিতা মূলত আবৃত্তি ও শ্রবণেরই শিল্প। রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা যায়— 'মনে মনে ধ্বনি উচ্চারণ করে কবিতাকে সম্ভোগ করতে আমরা আজকাল শিখেছি। কিন্তু কবিতা নিঃশব্দে পড়বার বস্তু নয়, কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়েই তার রূপ ভালো করে প্রকাশ পায়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'[২৯]

বাংলা বর্ণমালা চিত্রলিপি নয়, ধ্বনিরই প্রতীক। ভাষার মুদ্রিত রূপ প্রত্যক্ষ হতে-না-হতে ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।[৩০] স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ রূপে পৃথক্ পৃথক্ না থেকে ধ্বনিপরম্পরাক্রম পাঠকের মনকে অধিকার করে প্রথমে। দর্শনের সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণ চলে বলে নীরব পাঠও কার্যত হয় ধ্বনিময়। আবার তখনই সেই ধ্বনিক্রম তাৎপর্য নির্দেশ করে, ব্যঞ্জনা ঝংকৃত করে, পাঠকের বোধে আভাসিত করে কবির উপলব্ধির জগৎ।

ধ্বনিক্রমের সঙ্গে অর্থপূর্ণ শব্দাবলীর সম্পর্কের কথাও স্মরণ রাখা দরকার। মানবভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি আর অর্থের ভিতরে দিনে দিনে বহুমাত্রিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। T. S. Eliot এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, শ্রুতিগত কল্পনা (auditory imagination) ব্যাপারটি হচ্ছে বোধের সাহায্যে সিলেব্‌ল আর ছন্দের সন্ধান। চিন্তা আর বোধের চেতন স্তর ভেদ করে ঢের গভীরে চলে গিয়ে এই সন্ধান প্রতিটি শব্দকে সঞ্জীবিত করে। এ যেন ভুলে-যাওয়া আদিমে ডুব দিয়ে আদি উৎসের কাছ থেকে কিছু ফিরিয়ে আনা, তথা আদি-অন্তের সন্ধান। অর্থের ভিতর দিয়েই অবশ্য এর কাজ চলে, অন্তত সাধারণভাবে বলতে গেলে অর্থবিযুক্ত ব্যাপার এ নয়। আর, একদিকে পুরাতন— বিলুপ্ত হয়ে-যাওয়া— গতানুগতিক এবং অন্যদিকে নতুন বিস্ময়কর এই সন্ধানে মিলে মিশে এক হয়। একেবারে প্রাচীন আর সবচেয়ে সংস্কৃত মানসিকতার ভিতরে ঘটে সংশ্লেষণ।[৩১]

তাই, একটি কবিতাকে উপযুক্ত রকমে অনুধাবন করতে গেলে তার শ্রুতিগত কল্পনার বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হয়। উপস্থিত রচনার শিরোনাম-নির্দিষ্ট ভাব-

ব্যঞ্জনার প্রসঙ্গ কেবল ধ্বনিপরিসীমাতে নিবদ্ধ থাকতে পারে না। কবিতার বক্তব্য এবং ব্যঞ্জনার যুগপৎ উপলব্ধির জন্যেই বহিরঙ্গের বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে আমাদের অগ্রযাত্রা। কবিতার অন্তঃসত্তায় প্রবেশের জন্যেই ধ্বনিসচেতনতা জরুরি। এভাবে দেখতে গিয়ে 'ধ্বনি' পদটির পরিধি বাক্‌ধ্বনির চেয়ে বিস্তৃততর হয়ে পড়ে।

নজির নিয়ে আলোচনা করে দেখা যাক। 'ক্ষণিকা'র "বিরহ" কবিতায় বিরহের যে বিবরণ রয়েছে, তাতে দ্বিপ্রহরের প্রকৃতি আর পরিপার্শ্বের পটভূমিতে নিজেকে ফিরে ফিরে স্থাপন করে বিরহিণী তার অন্তরের ছবি তুলে ধরেছে। দ্বিপ্রহরের সূর্য স্বভাবতই 'মাঝগগনে' থাকে, তবু সেই খবর উল্লেখ করে এ-কবিতার ক্লিষ্টা নারী বারবার সন্তাপের কথা ঘোষণা করেছে — 'শুষ্ক পথে দগ্ধ মাঠে / রৌদ্র খরতর।' বিরহ-তাপের পরিচয় দেবার জন্যেই প্রহরটির এবং গ্রীষ্মের প্রাক্‌কালীন মধু ঋতুটির ব্যবহার এই কবিতায়। 'চৈত্র মাসের নানা খেতের / নানা গন্ধ নিয়ে, আসতেছিল তপ্ত হাওয়া / মুক্ত দুয়ার দিয়ে। দু'টি ঘুঘু সারাটা দিন / ডাকতে-ছিল শ্রান্তিবিহীন, / একটি ভ্রমর ফিরতেছিল / কেবল গুন্‌গুনিয়ে। / চৈত্রমাসের নানা খেতের / নানা বার্তা নিয়ে।' স্তবকটিতে গন্ধ, স্পর্শ, দৃশ্য, গানে যেমন বিরহের বোধ ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি উষ্মধ্বনি এবং স্বরান্ত মহাপ্রাণধ্বনির উষ্মতা ব্যবহারে একটি দীর্ঘশ্বাসপূর্ণ হুতাশের অনুভব সঞ্চার করে দিয়েছে। তার সঙ্গে নাসিক্যব্যঞ্জনের বিশেষ বিন্যাসে বেজে উঠেছে বেদনার মৃদু গুঞ্জন। শ্রোত্রগ্রাহ্য এই-সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ দিলে কবিকল্পনায় বিরহবোধের সম্পূর্ণ আয়োজনটি ভালোমতো বুঝে নেওয়া যায়।[১২] কবি সচেতনভাবে আয়োজন করেন কি-না, সে-বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায়, অন্তর্গত কবিতার স্পন্দ তাঁকে অনুকূল প্রকাশ-মাধ্যমের অন্বেষণে তাড়িত তো করেই। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির নিরন্তর পাঠ-পরিবর্তন এইজন্যেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যতক্ষণ যথার্থ ঝংকারটি শোনা না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থির লেখনীচালনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তরের পর্যালোচনা কবিতার ধ্বনিব্যবহার প্রসঙ্গের উপরে আলোকপাত করবে বলে মনে হয়। 'ধ্বনি' কথাটির সম্পূর্ণ পরিচয় এবং পরিধি নির্ণয় হওয়া দরকার।

'ধ্বনি'র পরিধি

কবিতায় চলমান স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিমালা অবশ্যই উপস্থিত আলোচনার বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জন যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয়, ধ্বনির ক্রমবিন্যাস ও তার বিপর্যয়ে সৃষ্ট অবস্থা। বিশেষ বিশেষ ধ্বনির সদ্‌ভাব বা অভাব, এবং একের উপরে অন্যের প্রভাব পরোক্ষভাবেও কেমন করে বিশেষ দ্যোতনার সহায় হয়, তা আমাদের আলোচ্য। প্রসঙ্গটি একটু বিস্তারিত করবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "চম্পা" কবিতাটি নিচ্ছি। কাব্যছন্দ অপরিবর্তিত রেখে মূল কবিতাতে ব্যবহৃত পদের পরিবর্তে সমার্থক অন্য পদ ব্যবহার করে মূলের ধ্বনিবিপর্যয় ঘটালে বোঝা যাবে, শব্দার্থ বজায় থাকলেও, পরিবর্তনে কবিতার মূল স্বর বিঘ্নিত হচ্ছে। মূল কবিতার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আর তার বিন্যাসক্রম ভঙ্গ হলে ব্যঞ্জনা ব্যাহত হবেই। সত্যেন্দ্রনাথের চম্পার স্বচ্ছন্দ উচ্ছ্বাস ভাষান্তরে কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে, মূল রচনা আর পরিবর্তিত পাঠ পাশাপাশি রেখে সেটুকু লক্ষ করা যাক।

আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হল— সাহসিকা অপ্সরার মতো।

বনানী শোষণ ক্লিষ্ট মর্মরি উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ-কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল— শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,— বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান—
চম্পা আমি— খরতাপে আমি কভু ঝরিব না মরি;
উগ্র মদ্য সম রৌদ্র— যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান—
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি ;
মূর্ছে দেহ, মোহে মন,— মুহুর্মুহু করি অনুভব ।
সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি ;
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা ! সূর্যেরি সৌরভ ।[৩৩]

"চম্পা"র রূপান্তর

বিকশিনু দৈবযোগে মধুঋতু-বিদায়ের শ্বাসে,
দুঃখমগ্ন এ জগৎ যবে খরতাপ-বশীভূত ;
চণ্ড তপমগ্ন কুঞ্জে ভয়-মেশা আনন্দ উচ্ছ্বাসে,
একক এ আগমন— ভয়শূন্য অপ্সরা যেমত ।

অবণ্য কাতরশুষ্ক, মর্‌মর্‌ উচ্চারে বাবেক,
কোকিলের শ্রান্তরব অবসন্ন বনেতে মিলায় ;
জীবনের পট মেলি' উন্মীলিয়া তরুণ এ চোখ
হেরিলাম ধরা ধূ ধূ— আত্মহারা, জর জর কায় ।

আস্থাবৃন্তে থরোথরো— তথাপি বিকচ ফুলতনু ;
চাঁপা নাম— রৌদ্রদাহে কভু স্রস্ত হবে না জীবন ;
তীব্র সুরা হেন রশ্মি— যার তাপে জগৎ কাতর—
ঈশ্বরের শুভাশিসে অনায়াসে করি তা সেবন ।

মৃদুমন্দ বিকশিনু, প্রভাতের উষ্ণ হস্ত ধরি' ;
মোহে কায়, মূর্ছে চিত্ত,— বারংবার বোধ হয় সবই ।
তথাচ রবির জ্যোতি দেহ তোলে কান্তিঋদ্ধ করি ;
প্রণাম হে বিভাবসু ! চাঁপা আমি ! তোমারি সুরভি ।

প্রবন্ধান্তরে আমরা 'চম্পা' কবিতার রূপান্তর বিষয়ে বিস্তৃতিতর আলোচনা করব ।

ভাবের ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে স্বর ও ব্যঞ্জনবিন্যাসের ছাঁদ বা প্যাটার্ন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। একই স্বর অথবা ব্যঞ্জন বা স্বরব্যঞ্জনগুচ্ছের পুনরাবর্তন, বা নির্দিষ্ট ব্যবধানে পৌনঃপুনিক সংস্থাপনে, সাম্য বা সংঘাত রচনাসূত্রে বাক্‌ধ্বনির বিচিত্র বিন্যাস থেকে এই ছাঁদ তৈরি হয়। বস্তুত শব্দালংকারের আওতাভুক্ত এ-বিষয় ।

যেমন—'রবীন্দ্রনাথের "বিরহ" কবিতার 'শুষ্ক পথে দগ্ধ মাঠে / রৌদ্র খরতর' অংশে 'শুষ্ক' 'দগ্ধ' আব 'রৌদ্র' পদে বিশেষ ব্যবধানে সংস্থিত 'ও' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি এবং তিনটি পর্বের প্রথম সিলেব্‌লে বদ্ধতা বা সংঘাতজনিত সাম্য।

কবিতার শ্রাব্যধ্বনিসমাবেশে শ্রুত আর অশ্রুত ধ্বনির পরস্পর লীলা বড়ো ভূমিকা পালন করে। ধ্বনিস্রোত ক্ষণে ক্ষণে আপন বেগ সংবরণ করে আপনার চতুর্দিকে নিঃশব্দের ঘের রচনা করেই ফুটিয়ে তোলে আপন বৈশিষ্ট্য। কবিতার মূলস্বর ধ্বনিত করবার কাজে এই অবকাশের যথোচিত মূল্য বুঝে নিতে হবে। কবিতা মাত্রই শব্দ-নিঃশব্দের জালবোনা।[৩৪] এই অশ্রুতধ্বনিও কবি আর পাঠকের হৃদয়গহনে বাজে, মনে রাখা চাই।

কাব্যছন্দও কবিতার সামগ্রিক ধ্বনিসুষমার এক অঙ্গ। সুনিরূপিত কাব্যছন্দ আর অন্ত্যমিল কাব্যআত্মার চাহিদা অনুসারে কবিতাকে মণ্ডিত করে এসেছে দীর্ঘকাল। একালেব অনেক কৃতী কবি এখনো কাব্যছন্দ আর অন্ত্যানুপ্রাসে প্রয়োজনমতো কাব্য অঙ্গের প্রসাধন করে চলেছেন। আবার পদান্তিক মিল পরিহার করে কাব্যছন্দের অন্যতর ঠাট বজায় রেখেও কবিতাকে ছন্দোময় করে তুলছেন অনেকে। এই সমস্ত ছন্দবন্ধ অবশ্যই ধ্বনি এলাকার আওতাধীন।

অনেক সময় কবিতার অন্ত্যমিল আর আঙুলে-গোনা সুনিবদ্ধ ছন্দপদ্ধতিকে এড়িয়ে গিয়েও কবিরা নানা প্রচ্ছন্ন উপায়ে আপন কবিতায় ভিন্নতর লাবণ্য বিস্তার করে থাকেন। গদ্যকবিতায় যেমন, সুনিরূপিত ছন্দপদ্ধতিকে ছেড়েও গূঢ়তর ছন্দসঞ্চারে কবিতাকে আন্দোলিত করেন কবিরা। যেমন দেখি রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশিওয়ালা' কবিতায়।—

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর,
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,
পাঁজরের উপর আছাড়-খাওয়া
মরণ-সাগরের ডাক,
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি,
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।[৩৫]

কথকের উদ্‌বেল অনুভূতির পিছু পিছু একের-পর-এক বর্ণনা আসছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গে আবেগের উচ্ছ্বাস বেগ সঞ্চয় করছে 'ডাক' শব্দের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসে। কিছু পরে পরে একটি শব্দের ক্রমিক উচ্চস্বরে উচ্চারিত আবর্তিত অগ্রগতি ধ্বনিগত গুণে চিত্তকে বিষয়ের মর্মের অভিমুখে চালিত করে। এই আবর্তন অন্ত্যাবৃত্তির সাহায্যে climax তৈরি করে।[৩৬] 'মরণ-সাগরের ডাক'-এ স্বরের চরম উন্নতির পর নাটকীয় পরিবর্তন আসে 'ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক' উচ্চারণে। তারপরেই, 'ডাক' শব্দের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত মিল হয়ে আসে দোসর শব্দ 'হাঁক'— 'যেন হাঁক দিয়ে আসে' ইত্যাদি। পদান্তের মিল আর পর্বে পর্বে মাত্রা বিন্যাসের সমতাই শুধু মিল নয়, কবিতার বিন্যাসে উপরে আলোচিত আকস্মিক মিল বক্তব্য-বিষয়ের ভিতরের ঐক্যকে যেমন নির্দেশ করে, তেমনি সৃষ্টি করে শ্রুতিমাধুর্যের ছন্দ। এ কবিতায় তার পরেও 'অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে / পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি' চরণ দুটিতে রয়েছে অনুপ্রাসের তাল। পঙ্‌ক্তির ভিতরে নিবিষ্ট মিল আরো আছে— 'ছিনিয়ে নেবে' আর 'ভাসিয়ে দেবে' -তে। এই-সব নানা কিছু নিয়েই অন্যতর ছন্দে গদ্যকবিতার প্রাণস্ফূর্তি ঘটে। কবিতাতে কাব্যছন্দ ছাড়াও মিলের এই-সব সুষমাতেই ধরা দিতে পারে অন্য দীপ্তি। এই-সব মিল কাব্যছন্দের চেয়ে সূক্ষ্মতর উপায়ে কবিতাকে কান্ত করে। শ্রাব্যধ্বনির এই সুষমাও বৃহত্তর অর্থে ছন্দ।

কবিতায় স্বর-ব্যঞ্জন বা শব্দ বিন্যাসের বিশেষ ছন্দে যেমন সৌন্দর্য উদ্‌ভাসিত হয়, তেমনি হতে পারে রূপ বা ছবির ছন্দে, কখনো-বা বক্তব্য সাজানোর ভঙ্গিমায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে আল মাহমুদের 'প্রত্যাবর্তনের লজ্জা' থেকে খানিকটা সংকলন করে দেখা যায়।

> কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরবো।
> শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে। চোখের পাতায়
> শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ
> লাল সূর্য উঠে আসবে। পরিচিত নদী। ছড়ানো ছিটানো
> ঘরবাড়ী, গ্রাম। জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। তারপর
> দারুন ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা।
> কলার ছোটো বাগান।
> দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কাঁপছে।[৩৭]

সুনিবদ্ধ ছন্দের শাসন নেই এ কবিতাতে। অন্তরে ছন্দ ধরে রেখেছে নিসর্গের ছবি অর্থাৎ রূপের বিশেষ সজ্জা। ছন্দ এসেছে কবির লজ্জার অনুভূতির বিপরীতে সূর্যের রক্তিম উদ্‌ভাসে নির্লজ্জতা দেখতে পাওয়ায়, পরিস্থিতি বৈগুণ্যে নিজেদের চেনা আটচালাকে দারুণ-ভয়ের-উৎস কল্পনা করায়। আর, কলাগাছের দীর্ঘ পাতার 'না না' দুলুনিতে লজ্জার কম্পন কবিতাকে করেছে ছন্দিত। তাৎপর্যবহ ছবিগুলি রূপের ছন্দ রচনা করে এ-কবিতায় লজ্জার বিবিধ ব্যঞ্জনা এনেছে। এই রূপের ছন্দও ধ্বনির পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

কি অনিরূপিত ছন্দের, কি ছন্দোবদ্ধ কবিতার বিভিন্ন অঙ্গের আন্তরসম্পর্কযুক্ত গঠনভঙ্গি; এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস, সাহিত্যঐতিহ্য, একই কবির অন্য কবিতার সঙ্গে বা উপস্থিত কবিতারই অন্য অঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যে পাঠকের অন্তরে রূপের ছন্দ সৃষ্টি করে।

কখনো কখনো বৈপরীত্য উদ্‌ভাসনেও কথার ভঙ্গিমা নতুন ছন্দে সজীব হয়ে ওঠে। বাস্তব জীবনে ভিন্নধরনের সত্যের মুখোমুখি হবার ক্ষোভে রাবীন্দ্রিক বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমূর্তির সমান্তরে নাগরিক সভ্যতার রূপ তুলে ধরে সেরকমের কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে-র মতো আধুনিক কবিরা। এই ধাঁচে পূর্বসূরির নান্দনিক অনুভূতিকে আঘাত করে বক্তব্য বিন্যাসের ছাঁদ নতুন ব্যঞ্জনা এনেছে সমর সেনের 'স্বর্গ হতে বিদায়' কবিতায়। কবিতার নাম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মর্তে কল্পিত এই স্বর্গলোক থেকেও বিদায় নিয়েছে আজকের শহরবাসী।

ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—
হে শহর হে ধূসর শহর!
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর ধূসর শহর।
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী
তখন শাড়ীর আর তাড়ির উল্লাসে,
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা

নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে জলন্ত চাঁদ ওঠে
হে শহর হে ধূসর শহর ।[২৮]

দেশীয় সাহিত্যঐতিহ্য আমাদের স্মৃতিতে যে সৌন্দর্যনিবিড় মাধুর্য সঞ্চিত রেখেছিল— মুহূর্তে তাকে বিস্রস্ত করে এ-কবিতা জীবনের লাঞ্ছনার অপ্রমেয় বেদনা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিল। দুই ছবি - দুই ভাবনার ভিতরের গূঢ় ঐক্য কবির অন্তরে স্পন্দিত হয়েছে বলেই এ-কবিতা পাঠক চিত্তকে তরঙ্গিত করে। এই স্পন্দের জন্ম চিত্তের যে গহনে— তা কাব্যছন্দে মাত্র আপনাকে বিকশিত করে না— সামগ্রিক বিন্যাসে সর্বৈব রূপে প্রস্ফুটিত হয়।

কাব্যছন্দের শাস্ত্রবর্ণিত আঙ্কিক হিসাবের কাঠামোটিও কবিতার প্রথম প্রাণ-স্পন্দন থেকেই নির্দিষ্ট গঠন পায়। কাব্যআত্মাই তার ছন্দগতি থেকে শুরু করে সর্ববিধ সুষমার নিয়ন্তা। মারিতাঁ লিখেছেন -- কবিতার জন্মের উপক্রমে কবির অন্তরে প্রথমেই একটি নিঃশব্দ সংগীতময় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ক্রমে সেই কাব্যিক স্বজ্ঞা আপন প্রাণপরিবেশের ভিতরে প্রবুদ্ধ হয়ে স্পন্দিত হয়ে স্পষ্ট রূপ নিতে থাকে। সুনির্দিষ্ট প্রতিমা জেগে উঠবার কালে, প্রাণময় মৌল আবেগটির অভ্যন্তরে বিশেষ আবেগের প্রতিধ্বনি কবির আত্মায় বিশেষ ছন্দসংগীতের বিধূনন জাগায়। 'This enlarged musical stir is the spontaneous start of operative exercise ; with it the process of expression begins, in a first transient and tendential stage.'[৩৯] তবু তখনো সে সংগীত শ্রুতিগ্রাহ্য নয়, তখনো তা 'the music of the intuitive pulsions, within the soul'।[৩৯] মনের কানে সেই সংগীত একাগ্রচিত্তে শুনতে শুনতে সংগতিপূর্ণ প্রকাশের আয়োজন চলে তারপর। শেষে শব্দসংগীত আর ছন্দ কবিতার আত্মাকে আপন দেহে ধারণ করে বেপমান হয়। তখন যোগ্য বিবাহের জন্যে শিল্পীকে হতে হয় সচেতন এবং ধীমান্ স্রষ্টা।

এই গূঢ় ছন্দসংগীতের বিষয়টি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'ছন্দের বারান্দা' গ্রন্থে এভাবে লিখেছেন—'এক একটা মুহূর্ত আসে যখন আমাদের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা আমাদের বোধি আর প্রেরণা সমবেতভাবে সংহত হয় চেতনার এক কম্পমান বিন্দুতে, তৈরি হয় যেন শিখার মতো দীপ্যমান রেখা, এই রেখাটিকে বিন্যস্ত করতে পারার মধ্যেই কবিতার করণকৌশল লুকোনো। তখন তার যে অবয়ব তৈরি হয়— তার ছন্দ

এবং ভাষা— তার মধ্যে প্রায় স্পষ্টই যেন দেখতে পাওয়া যায় এই কম্পন, এই vibration যার অভাবে কোনো কবিতাই আর কবিতা নামের যোগ্য নয়।'[৪০] এই কম্পন থেকেই কবিতা আপন ছন্দগতির দিশা পায়। সার্থক কবিতার স্পন্দে স্ফূর্ত উদ্‌বুদ্ধ কবি-আত্মার সেই কম্পনেই ছন্দের এককত্ব, তার নিহিত সৌন্দর্য। ছকে বেঁধে এ-ছন্দের সমগ্রতাকে পাওয়া সম্ভব নয়।

এখানে বলে নেওয়া ভালো কবিতার জন্মের সঙ্গে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার সরাসরি যোগের কথা আমরা বিস্মৃত হই নি। সেই অভিজ্ঞতাই কবিতা সৃষ্টির প্রাথমিক নিঃশব্দ আলোড়নের জনক হতে পারে।[৪১]

সার্থক কবিতাকে একই রীতির ছন্দে ভাষান্তরিত করে বিন্যাস করতে গেলেও তার প্রাণপ্রদীপটি নিভে যায়, সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতাপ্রসঙ্গে আমরা তা দেখেছি। কাব্যছন্দের পরিবর্তন তো ঝাড়েমূলে সব ধ্বংস করে দেবে। মাইকেল মধুসূদনের—

একাকিনী শোকাকুলা, অশোককাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধাব কুটিরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে![৪২]

যদি স্বরবৃত্ত ছন্দে এমন করে সাজানো যায়—

অশোকবনে কাঁদছে দুখে রাঘব-বধূ সীতা,
একলা বসে আঁধারে সে আকুল শোকান্বিতা।
প্রহরিণী রাক্ষসীরা ফেলে তাঁকে সবে—
হল্লাহাসির ধুম তুলেছে মত্ত মহোৎসবে।
বন্দিনীকে রেখে গেছে নেইকো কোনোই ভয়
অর্ধমৃত হরিণ ছেড়ে ব্যাঘ্র যেমন রয়!

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই রচনাকে কাব্যগুণে উত্তরণের অভিজ্ঞানপত্র দিলেও তা গ্রাহ্য হয় না, যেমন হয় নি মেঘনাদবধের প্রারম্ভিক অংশের রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ছন্দান্তরণ—'যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হল···।' প্রবহমান পয়ারের কাব্য ছড়ার ঝোঁকপ্রধান গতি

অঙ্গীকার করলে, সেই চাপল্যের সঙ্গে মূল কবিতার প্রাণপুরুষের সহাবস্থান কঠিন হয়।

শ্রাব্যধ্বনি নয় কেবল, কবিতার জন্মমুহূর্তের প্রথম স্পন্দনবেগ থেকে উদ্‌ভূত যাবতীয় ধ্বনিমায়া সাধ্যমতো শনাক্ত করে ব্যঞ্জিত ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের লক্ষ্য। একাজে সার্থক কবিতার দ্যোতিত বিষয়ের অনুধাবন এবং কবিতার গঠনে সে-বিষয়ের অনুকূল ধ্বনিসজ্জার সুষমা যুগপৎ সন্ধান করতে হবে। তা থেকে অনুমান করা যাবে, দ্যোতনা বিষয়কে ছাপিয়ে কতদূর পর্যন্ত আপনাকে বিস্তৃত করতে পারে।

উচ্চারণ ও আবৃত্তি

কবিতা যেহেতু পাঠের শিল্প, সেহেতু উপস্থিতপ্রসঙ্গে উচ্চারণের দিকটিও স্বভাবত বিবেচনাধীন হয়ে যায়। ছোটোখাটো মতভেদ ঘটলেও, প্রত্যেক ভাষারই কিছু সর্বজনগ্রাহ্য উচ্চারণরীতি থাকে। বাংলাভাষাতেও উচ্চারণের কিছু নিয়ম নানা ব্যাকরণে অভিধানে ছড়িয়ে আছে। সেই-সব নিয়ম. ও প্রচলিত শিষ্ট উচ্চারণ থেকে নীতি নির্ধারণ করে চললে, উপস্থিত আলোচনায় উচ্চারণসংক্রান্ত তেমন সংকট দেখা দেবে না আশা করি। কালভেদে উচ্চারণের ভেদ এবং ঝোঁকবদল ঘটে যায় বলেই বর্তমান আদর্শের দিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে।

উচ্চারণতত্ত্বসূত্রে কেবল ধ্বনিবিজ্ঞান কেন, আবৃত্তি শিল্পও গণনার আওতায় আসে। একই কবিতাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে পড়তে পারেন। সূক্ষ্ম-ভাবে দেখতে গেলে একই ব্যক্তি কোনো মহৎ কবিতাকে দুবার একভাবে পড়বেন না। পাঠকালীন মানসিক অবস্থা আবেগের তারতম্যে আবৃত্তির প্রকারে ভেদ ঘটাবে। এছাড়া, পাঠের সময় বিরাম বা যতিভাগ স্থাপনের ভেদ অর্থের পার্থক্য ঘটাতে পারে। যতিস্থাপনের নতুনত্বেই মধুসূদনের কবিতা তাঁর সমকালের অনেক পাঠকের কানে দুঃসহ ঠেকেছিল, মনে হয়েছিল অপাঠ্য। যতিসন্নিবেশের 'বৈশিষ্ট্য পুরাতন সংস্কারে দৃঢ়চিত্ত সমকালীন পাঠকের রসগ্রহণের অন্তরায় হয়েছিল।'

আবৃত্তিকালে ধ্বনির স্বনতীক্ষ্ণতা (pitch) উপস্বন (timbre), কণ্ঠস্বরের বিশেষ রঙ (colour), প্রবলতা (loudness) দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধগত ত্রৈমাত্রিক আয়তন (volume) প্রভৃতিও ব্যঞ্জনার রকমফের ঘটাতে পারে— মনে করিয়ে দিয়েছেন I.A. Richards।[৪৩]

মুদ্রিত কবিতা থেকে কবির অভিলষিত ছন্দ পাঠ হয় কি-না সে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'ছন্দের বারান্দা' গ্রন্থে কবিকণ্ঠের আবৃত্তিতে ছন্দবিষয়ে কবির অভিপ্রায় শুনে নেবার কথা তুলেছেন।[৪৪] 'নিঃশব্দের তর্জনী' গ্রন্থের "ছন্দ : নিরূপিত ও ব্যক্তিগত" প্রবন্ধেও, কবিতা পাঠ করে কবির 'ছন্দ-অভিপ্রায়' সব-সময় ঠিকঠাক বোঝা যায় না বলে শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন— ছককাটা ছন্দ ছাপার জন্যে, পড়বার জন্যে নয় সর্বদা। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

একদা তুমি / অঙ্গ ধরি / ফিরিতে নব / ভুবনে
মরি মরি অ/নঙ্গ দেব/তা—

যতিপাতের এই নিয়ম মেনে কবিতা পড়া অসম্ভব। এমন ব্যবচ্ছেদ ভাষার পক্ষে

অসহনীয়। অসিলোগ্রাফ যন্ত্রে কবিদের কবিতাপাঠের 'লেখরচনা' সম্ভব হলে কবির অভীষ্ট ছন্দ ধরবার সুযোগ হত, কারণ, বড়ো বড়ো কবিরা মাত্রাদ্বারা কতদূর বদ্ধ থাকবেন সে-বিষয়ে ভেবে দেখবার সময় এসেছে।[৪৫] নিরূপিত ছন্দ পাঠ নিয়েই সমস্যা, মাত্রার বন্ধন ছাড়িয়ে চলা কবিতার প্রসঙ্গে সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। আর, কবিতার সঙ্গে সঙ্গে রেখাচিত্র মুদ্রিত করে কি তবে কবিতার ছন্দ বোঝাতে হবে কবিকে? আর উৎসুক পাঠককে হতে হবে সেই রেখাচিত্রবিদ্? চিহ্ন বা রেখাচিত্রের সাহায্যেও সব সুরাহা হয় না— সেও আমরা দেখতে পাব। শঙ্খ ঘোষ গদ্যকবিতা প্রসঙ্গে ব্যক্ত বিষ্ণু দে-র একটি বক্তব্য তুলে ধরেছেন— 'আবেগই শুধ্ এ ছন্দেব বেগ নির্দিষ্ট করে এবং দুই ব্যক্তির আবেগের মাত্রা এক চালে নাও চলতে পারে।'[৪৬] ছন্দকবিতা সম্পর্কেও এ উক্তিকে মান্য করে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন আবেগের মাত্রাভেদ থেকে পাঠের ছন্দের হেরফের ঘটা সম্ভব। যা হোক, এই-সব নানা উল্লেখ থেকে আবৃত্তির প্রকারভেদে কবিতার আলোচনায় যে কিছু মত-পার্থক্য ঘটতে পারে, সে-কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পাঠের উচ্চারণ কেবল ছন্দের বেলা কেন, কবিতার তাৎপর্য নির্ধারণেও মতবৈষম্য ঘটাতে পারে। বাংলা অ-স্বরধ্বনির ও বা হসন্ত উচ্চারণ এবং এ-স্বর-ধ্বনির অ্যা-রূপান্তরে বাক্যের অর্থে পার্থক্য দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের গান থেকে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। 'অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি— বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।' এই বাক্যে 'চুরি কোরে' না 'চুরি করে'—কোন্ উচ্চারণ সংগত? 'ক'-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হলে পদটি অগ্রবর্তী 'ছুঁয়ে' পদের মতো অসমাপিকা ক্রিয়া প্রতিপন্ন হয়। ক্রিয়ার এই অসমাপিকা রূপের জন্য দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী ড্যাস-চিহ্ন পূর্ববর্তী অসমাপ্ত বক্তব্যের সঙ্গে বাক্যের অপরাংশের যোগ নির্দেশ করে বক্তব্য সমাপ্ত করেছে। সব মিলে অর্থ দাঁড়ায়— বাঁশি অধরের হাসি চুরি করে, বঁধুর হাসি আর মধুর গানে একাকার হয়ে প্রাণের পানে ভেসে চলে।

আর 'ক'-এর অ-কারান্ত উচ্চারণে 'করে' পদটি সমাপিকা ক্রিয়া হয়ে ওঠে। তখন, সেইখানে বক্তব্য সমাপ্ত হয়ে পূর্ণ যতিপাতের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ড্যাস-চিহ্নের ব্যবহার সংযোজক অব্যয় 'এবং'-এর ভূমিকা পালনের জন্য উপস্থিত বলে মনে হয়। অর্থ তাতে সরল হয়ে ওঠে। বাঁশি অধরের হাসি চুরি করে, এবং বঁধুর সেই হাসি মধুর গানের সঙ্গে ভেসে চলে প্রাণের অভিমুখে। উভয়

উচ্চারণেই অর্থসংগতি পাওয়া যাবে। আর, উচ্চারণ ভেদে এই অর্থের দ্বিধা দেখা দেবে। কবির অভিপ্রেত উচ্চারণ-নির্দেশ থাকলে এই দ্বিধার নিরসন হতো কি?

'কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই' গানটির 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু. পরকে করিলে ভাই' এবং 'দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই' এই দুই পাঠ নিয়ে বিসংবাদ আছে। 'বন্ধু' পদের আগে কমা-চিহ্ন না থাকলে 'ট' উচ্চারণ ও-কারান্ত হতে পারে, কমা-চিহ্ন যোগে 'নিকট্'-ই হবে। এখানে ও-কারান্ত না হসন্ত— অ-এর কোন্ বিকৃতি গ্রাহ্য হবে, সেই বিতর্ক উঠেছে। যতিচিহ্নের বিশেষ ভূমিকারও দৃষ্টান্ত এই বাক্যটি। 'নিকট বন্ধু' বন্ধুর অবস্থান-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে। 'বন্ধু'র উভয় পার্শ্বে কমা-দিয়ে সাজানো পাঠে বাক্যের মাঝামাঝি এসে সনিঃশ্বাস 'বন্ধু' সম্বোধনে আবেগের প্রকাশ আছে।

দুই পাঠের অর্থের ভেদ স্পষ্ট। অথচ, দুই অর্থই সংগত। এ-বিষয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন: 'ব্রহ্মসংগীতে 'নিকট'-এর পর কমা নেই। অর্থাৎ 'নিকট-বন্ধু' রূপে পড়া যেতে পারে। আমরাও ছেলেবেলায় ঐ অর্থে পড়েছি— 'বন্ধু'কে ভকেটিভ কেসে নিই নি।' পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জন্ম-শতবার্ষিক রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণে (২য় খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা) পাচ্ছি 'নিকট বন্ধু' — মাঝখানে কমা নেই। অর্থাৎ ব্রহ্মসংগীতেও আমরা ছেলেবেলায় যেটি শুনেছি সেই পাঠ। কবিতাটির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে নেই। ওদিকে ঐ ভবনেব জনৈক দায়িত্বশীল কর্মী আমাকে বলেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের আপন হাতে অটোগ্রাফ বইয়ে লেখা এই কবিতাটিতে 'নিকট' ও 'বন্ধুর' মাঝখানে কমা পেয়েছেন।[৪৭] ১৯১২ সালে রদেনস্টাইনকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের **'Song-Offerings'** পাণ্ডুলিপির ফটোস্ট্যাট কপি এখন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।[৪৮] তাতে একধারে বাংলা ও অন্যধারে ইংরেজি অনুবাদে 'কত অজানারে' গানটি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে 'দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, / পরকে করিলে ভাই' এবং ইংরেজি অনুবাদে **'Thou hast brought the distant near and made brother of the stranger'** পাঠ রয়েছে। ইংরেজি অনুবাদ অর্থের দিক দিয়ে স্পষ্টতর ভাবে 'নিকট্' উচ্চারণ বুঝিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু গানে, সুরের টানে উচ্চারণ হচ্ছে, অ-কারান্ত।

'বিশ্বভারতী' প্রকাশিত 'গীতবিতান'-এ অ-কারের বিকৃতি নির্দেশের চিহ্ন হিসেবে সর্বত্র এক নিয়মে ও-কার বা হস্-চিহ্ন দেওয়া না থাকলেও এ-কার আর

অ্যা-কারের উচ্চারণভেদ নির্ধারণ করা আছে। পদের প্রথমে অবস্থিত এ-কার চিহ্নের আরম্ভে মাত্রা থাকলে সেই এ-কারের উচ্চারণ অ্যা-কার হবে। তা সত্ত্বেও উচ্চারণসংক্রান্ত বাদানুবাদ থেকেই গেছে। আধুনিক গীতবিতানে (বিশ্বভারতী সংস্করণ) 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী' গানটির উদ্ধৃত বাক্যটিতে হ-য়ে এ-কারান্ত 'হেরে' উচ্চারণ নির্দেশ করা আছে। শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষ্য— আগেকার দিনে এ গানে 'হ্যারে' উচ্চারণই শোনা গেছে এবং তাই সংগত বলে মনে হয়েছে।[৪৯] সম্পূর্ণ গানটিতে মাধুরীর সন্ধানের কথা আছে। কবি দেখতে পাচ্ছেন— 'রূপের কোলে ওই-যে দোলে অরূপ মাধুরী' সেই মাধুরীকে যদি মন মনে মনে চেয়ে 'দ্যাখে'— তবে এ-প্রসঙ্গে উচ্চারণ 'হ্যারে' হওয়া অসংগত নয়। আবার, মাধুরীর দেখা পেয়ে অর্থাৎ মাধুরী হেরে— মন সেদিক পানে চেয়েই থাকে, এমন অর্থও সংগত। তাতে আলোচ্য 'গীতবিতান'-এ নির্দিষ্ট উচ্চারণ রক্ষিত হয়। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথের মতে— 'হেরে' পাঠে অর্থ গভীরতা হারায়।[৪৯] আর, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে মুদ্রিত 'গীত-বিতান'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে দেখা যাচ্ছে— এ গানে 'হ্যারে' উচ্চারণই নির্দিষ্ট ছিল। এতে সংগতভাবেই প্রশ্ন জাগে, কবির অভিলষিত উচ্চারণই আজকের পাঠকের কাছে পৌঁছুচ্ছে— না গ্রন্থের পরবর্তী সম্পাদক / প্রকাশকদের অভিলাষই 'বিশ্ব-ভারতী' আমাদের কাছে পৌঁছুচ্ছেন ?

এমন অবস্থায়, উচ্চারণ তথা আবৃত্তিসূত্রে একই কবিতার অনুধাবনে কিছু ভিন্নতা দেখা দেওয়া সম্ভব, মানসগঠনের ভেদে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একই বিষয়ের তাৎপর্য গ্রহণের পার্থক্য ঘটাও যেমন সম্ভব। তবু আজও সাহিত্যের রসগ্রহণে ছেদ পড়ে নি। ভাব-ব্যঞ্জনার আলোচনাক্ষেত্রে কিছু মতভেদ সত্ত্বেও গভীর অনৈক্য দেখা দেবে না বলেই ভরসা করি।[৫০]

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তথা বস্তুগত বিচার

কবিতার এবংবিধ আলোচনায়— নির্দিষ্ট নীতিমতে ধ্বনিসম্পৃক্ত বিষয়ের যথাসম্ভব বস্তুগত এবং নৈর্ব্যক্তিক বিচারের প্রতি মন নিবদ্ধ করলে বিপদের সম্ভাবনা কমে আসে। কিন্তু ধ্বনির যে বিচিত্র প্রকাশের কথা আলোচনা করা হল— তার সবই ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের পরিধিভুক্ত কি-না, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কবিতার অন্তর্নিহিত ধ্বনি বা ভাবব্যঞ্জনা অনুভবে ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরে আস্থা না রেখে উপায় নেই। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, আপন যোগ্যতার সীমা অতিক্রম করাও যে-কোনো আলোচকের পক্ষে অসম্ভব।

পাশ্চাত্যের মনীষীরা বস্তুনির্ভর আলোচনার উপর বারবার জোর দিয়েও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ব্যক্তির সংবেদনশীলতা আর বিশেষ যোগ্যতাই শেষ পর্যন্ত কবিতার যোগ্য বিশ্লেষণের সহায়। তবে **'Criticism of a text must be...personal. But it must be personal response to elements which are objectively there.'**[৫১] শেষ কথাও এই যে,**'...sound in poetry ...may be analysed not by the methodical critic who relates his statement as far as possible to objective phenomena, but by the gifted one whose sensibility is matched by as penetrating ability to express himself.'**[৫২]

কবিতার সাংগঠনিক বিশ্লেষণে ভাষাবিজ্ঞানের ব্যবহার বস্তুগত বিচারের ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনা মতে কেবল ভাষা বিজ্ঞান দিয়েই কবিতার সম্যক বিচার হতে পারে না। ব্যক্তিক উপলব্ধিই যেমন কবিতা রচনার মূল, কবিতার সার্থক অনুধাবনেও সেই ব্যক্তিক উপলব্ধির গুণই আশ্রয়স্থল।

১৯৫৮ সালে **Bloomington**-এর **Indiana University**-তে এক কনফারেন্সে সাহিত্যের স্টাইল বিষয়ে নানা বিদ্যার পণ্ডিতদের ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ মত-বিনিময় হয়েছিল। **Thomas A. Sebeok** সম্পাদিত ***Style in Language*** গ্রন্থে সম্মেলনের প্রবন্ধাবলী এবং মৌখিক আলাপের অনুলিখন মুদ্রিত হয়েছে। **'From the viewpoint of Literary Criticism'** শাখার সমাপনী বিবৃতিতে **René Wellek** সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা স্বীকার করেও ঘোষণা করেছেন **'I agree with the linguists about the important**

role of sound in literature, but I would always argue there is a point at which literature (and poetry) goes beyond the scope of linguistics.'[৫৩] ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্যবিচারের মতের প্রধান প্রবক্তা Roman Jakobson একান্ত আলোচনায়, এবং পরে সর্বসমক্ষে René Wellek -এর সঙ্গে উক্ত বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন বলে বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। Wellek-এর অভিমত— সুসংগঠিত ('highly structured') কবিতার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভাষার গণ্ডি উত্তীর্ণ হয়ে আরো কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ঢিলেঢালা গঠনের কবিতা বিচারে সে সাফল্য অর্জন না হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ বস্তুনির্ভর পদ্ধতি হিসেবে, নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে পণ্ডিতেরা একমত।

René Wellek-এর ১৯৫৮ সালের ঐ মতের পর, এবার আমরা ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Attack on Literature and other Essays* গ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরব। এ-গ্রন্থের 'Russian Formalism' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গড়ে-ওঠা Russian Formalist Movement সাহিত্যের অঙ্গ বিশ্লেষণের সাহায্যে যেভাবে সাহিত্যশিল্পের সমগ্রতার দিকে অগ্রসর হয়েছিল, সাহিত্য সমালোচনার উপায় হিসেবে তার উপযোগিতা বিস্ময়কর। সাহিত্যশিল্পের উপাদানকে প্রাক্‌নান্দনিক বিন্যাসমাত্র রূপে দেখলেও, শিল্পকর্মের মূলগত ঐক্যের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করবার দিকে এ মতের প্রবক্তাদের নজর ছিল। এই ফর্ম্যালিস্টরা কেবল ধ্বনিসজ্জা, ছন্দ, গঠনশৈলী, এবং শৈলীগত ধারা প্রভৃতিই পর্যালোচনা করেন নি, বর্ণনীয় বিষয় ও উপাদান এবং কাহিনী-পরিকল্পনার নান্দনিক ক্রিয়াও পরীক্ষা করেছেন। অর্থাৎ অঙ্গবিশ্লেষণ আর নন্দনতত্ত্বচর্চা যুগপৎ এঁদের উপজীব্য হয়েছে। এই ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা আর নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে একীভূত। ঈস্‌থেটিক্‌স্ চলে এসেছে ভাষাবিজ্ঞানের গণ্ডির ভিতরে।[৫৪]

৩১ মে ১৯৫৮ সংখ্যা 'দেশ'-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের একটি মন্তব্যে René Wellek-এর উপস্থিত মতের প্রতিধ্বনি পাচ্ছি— 'নন্দনতত্ত্ব কিন্তু ভাষাতত্ত্বেরই ধারা।'[৫৫]

বর্তমান প্রসঙ্গ ধ্বনিগত সামগ্রিক বিশ্লেষণসূত্রে কবিতার ভাবব্যঞ্জনার অভিসারী

বলে আমরা বিশেষ কবিতা বা তার অংশের পর্যালোচনা করে লক্ষ্যে পৌঁছুবার চেষ্টা করব। তাব ফলে বিষযটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধ্বনিসুষমা-পবীক্ষা সূত্রে সংস্কৃত আলংকারিকদের বর্ণিত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাব অভিমুখে যাত্রা। ধ্বনিব পরিধি নির্ধারণ করতে গিয়ে এই যাত্রার লক্ষ্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া গেল।

বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র

উচ্চারণরীতির সূত্রে বাংলাভাষার ধ্বনিগুলি স্বতন্ত্র অবস্থায়, কিংবা বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন প্রকারে, বাঙালির সংস্কারে নির্দিষ্ট ধরনের বোধ জাগ্রত করে কি-না,— আমরা তা পর্যালোচনা করে দেখব। **J. R. Firth** ব্যক্তি ও সমাজভিত্তিক ধ্বনিসৌন্দর্যতত্ত্বমূলক (**Phonaesthetic**) বিবরণকে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান গণ্য করেছিলেন।[৫৬] কেননা, ভাষা-ধ্বনিসংক্রান্ত নানা ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ এবং সমাজগত ধারণা দিনের পর দিন ব্যবহারের ভিতর দিয়ে এক ভাষাভাষীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে পরিণত হয়ে থাকে। বিচিত্র ব্যবহারিক এবং সাহিত্যিক সূত্রে ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর বিনিময় চলতে চলতে ধারণাগুলি জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। ভাষা ও সাহিত্যের বিবিধ আলো-চনায় ধ্বনিসংক্রান্ত সংস্কারের দৃষ্টান্ত সন্ধান করে এই বিষয়টির সত্যতা বিচারের চেষ্টা করা যায়।

এখন, আমরা বাংলার মান উচ্চারণ অনুসারে— স্বরধ্বনি ও বাঙালির সংস্কারে স্বরধ্বনির চরিত্র, অর্ধস্বর / অর্ধব্যঞ্জন ধ্বনি ও বাঙালির সংস্কাবে এই-সব ধ্বনির চরিত্র, এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ও বাঙালির সংস্কারে ব্যঞ্জনধ্বনির চরিত্র বিষয়ে ক্রমিক আলোচনায় অগ্রসর হব। কবিতাপাঠ তথা আবৃত্তিতে উচ্চারণের যে স্পষ্টতা ও শুদ্ধতা বাঞ্ছনীয়, সে কথা স্মরণ রেখেই বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্রের আলোচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দ্রুত বা অসাবধান অথবা অপরিশীলিত উচ্চারণের বিবেচনা অপ্রাসঙ্গিক।

ক. বাংলা মান উচ্চারণের স্বরধ্বনি

শীলিত উচ্চারণে, বাংলায় প্রধানত সাতটি স্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থে মূল স্বরধ্বনির তালিকায় 'ও' ' বা 'অভিশ্রুত ও' ' নামে আরো একটি বাংলা স্বরধ্বনির কথা বলে-ছেন।[৫৭] 'অভিশ্রুত ও' ' ধ্বনিটিকে স্বীকৃতি দেবার কারণ হিসেবে তিনি স্বাভাবিক ও-যুক্ত শব্দের সঙ্গে 'অভিশ্রুত ও' '-যুক্ত প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের অর্থপার্থক্য ঘটবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। যেমন— 'ক্রোড়ে' অর্থে 'কোরে' এবং 'করিয়া' অর্থে 'ক'রে'তে, কিংবা 'কোনা' অর্থবিশিষ্ট 'কোণে' এবং 'কন্যা' অর্থের 'কনে'তে

অর্থভেদ ঘটছে। ধ্বনিবিজ্ঞান শাস্ত্রের আধুনিক 'পাঠ-প্রতিকল্পন' (**substitution within a text**) প্রথা অবলম্বনে ভাষার মূল স্বরধ্বনি নির্ণয়ের নিয়মমাফিক, কতকগুলি শব্দের আদিতে অবস্থিত এক স্বরধ্বনির বদলে অন্য স্বরধ্বনি যোজন করে, উচ্চারণভেদে অর্থান্তরসৃষ্টি সাপেক্ষে আবদুল হাই 'অভিশ্রুত ও' ধ্বনিটিকে মূল স্বরধ্বনিরূপে স্বীকার করেছেন। ধ্বনিবিজ্ঞান মূলধ্বনি নির্ণয়ে উচ্চারণ মাত্রকে গ্রাহ্য করে না, ভাষার ব্যাকরণগত অঙ্গসংস্থানকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে।[১১] সেইজন্যেই হাই সাহেব 'কোরে' 'ক'রে' আর 'কোণে' উদাহরণে বিভক্তিযুক্ত পদের আলোচনা করেছেন। আমরা আর একটু অগ্রসর হয়ে 'কোরে' আর 'কোণে' পদদুটিকে বাক্যে বিন্যস্ত কবিতার চরণের অন্তর্ভুক্ত করে, অর্থাৎ যথাযথ '**within a text**' পাঠ করলে, দেখতে পাব সেরকম বিন্যাসে এ দুটি পদের উচ্চারণ 'ক'রে', 'ক'নে'-র মতো হয়ে পড়তে পারে। যেমন— 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' বা, 'বঁধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙায়ব সই' আর 'নীল আকাশের কোণে কোণে' বা 'ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।'

এবার, বাংলায় স্বতন্ত্র শব্দের বা পদের অন্তর্ভুক্ত সকল স্বরধ্বনিরই যে অর্থভেদ-যুক্ত প্রায় সমোচ্চারিত যুগল শব্দ পাওয়া যাবে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যুগল শব্দের একটির স্বরধ্বনি স্বাভাবিক, অপরটির তথাকথিত 'অভিশ্রুত' শোনাবে। বস্তুত, শ্রুতিগত বিচারে 'কোরে' বা 'কোণে'তে উচ্চারিত 'ও' দীর্ঘ, এবং 'ক'রে' বা 'ক'নে'তে 'ও' হ্রস্ব। যেমন— 'মন' উচ্চারণের 'ও' স্বরধ্বনি দীর্ঘ, 'মণি'র 'ও' ধ্বনি হ্রস্ব। এখন আমরা অর্থভেদবিশিষ্ট প্রায় সমোচ্চারিত যুগল শব্দের নমুনাগুলি তুলে ধরছি।

দীর্ঘ	হ্রস্ব বা তথাকথিত অভিশ্রুত
চরিত্র অর্থে	হিমশিলা বা বাটনার পাটা অর্থে
শীল	শিল
পোশাক অর্থে	অনুমোদন জ্ঞাপনার্থে
বেশ	বেশ
ডাইনী অর্থে	দক্ষিণদিক নির্দেশার্থে
ডান	ডান্
কাপড় বা ছবি অর্থে	খুব তাড়াতাড়ি অর্থে
পট	পট

কোনা অর্থে	কি, কে, বা কোন্‌টি প্রশ্নার্থে
কোণ	কোন্
আধার অর্থে	মেরুদণ্ড থেকে বগল পর্যন্ত অংশের দৈর্ঘ্য নির্দেশে
পুট	পুট

সাতটি প্রধান স্বরধ্বনির মধ্যে কেবল 'অ্যা' ধ্বনিটির অনুরূপ অর্থভেদযুক্ত যুগ্মশব্দের দৃষ্টান্ত দেখানো গেল না। তবে উচ্চারণের দিক থেকে, এক সিলেব্‌লবিশিষ্ট হসন্ত শব্দের প্রথমে বসলে এ-ধ্বনির দীর্ঘরূপ, এবং দুই সিলেব্‌লযুক্ত শব্দের প্রথমে বসলে হ্রস্বরূপ শোনা যাবে। যেমন— 'এক' আর 'একা', 'ব্যাস' আর 'ব্যাসকূট'।

আবদুল হাই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন— 'ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে স্বরের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা বাংলাভাষায় আভিধানিক পর্যায়ে কোনো শব্দের অর্থের তারতম্য ঘটায় না, যেমন ঘটায় ইংরেজি কিংবা উর্দু ভাষাতে।'[৫৯] ইংরেজি **sit** বা **seat, full** বা **fool** উচ্চারণের হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য আলোচনার পর বাংলা ভাষার ভিন্ন স্বভাবের এই বিবরণ এসেছে। অথচ আবার উচ্চারণ দৈর্ঘ্যে অর্থপার্থক্য ঘটছে বলেই বাংলায় একটি অতিরিক্ত মূল স্বরধ্বনিকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন হাই সাহেব।

সুনীতিকুমারও বলেছিলেন— 'বাঙ্গালা ভাষায় স্বর-বর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণের উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে না।'[৬০] উপরের উদাহরণে আমরা হ্রস্বদীর্ঘভেদে অর্থভেদের নমুনা পেলাম। অবশ্য একই শব্দের বিশেষ স্বরের উচ্চারণ বিন্যাসভেদে কখনো হ্রস্ব কখনো দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হতে পারে— সেও আমরা দেখেছি। তবে কি ঐ অর্থভেদের সূত্রে আমরা বাংলাতে সাতটি মূল স্বরধ্বনির সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত অনুসারে আরো অন্তত ছয়টি 'অভিশ্রুত' স্বর গণনা করে বাংলায় মোট তেরোটি মূল স্বরধ্বনি আছে বলে মানবো ?

এখানে মূল স্বরধ্বনির সংখ্যা নির্ণয়ের চেয়ে, শিষ্ট বাংলায় কি কি স্বরের উচ্চারণ আছে সেই বিষয়টি আমাদের কাছে জরুরী। সেইজন্যে আমরা বরং উচ্চারণ-ভিত্তিক বিবেচনায় 'অ্যা' ধ্বনিটিরও হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই রূপ স্বীকার করে, সংস্থান ভেদে বাংলার সাতটি স্বরধ্বনিরই হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই রূপ রয়েছে বলে মানবো।

'মধ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা' গ্রন্থে সুনীতিকুমার ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল পাঁচটি স্বরধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘরূপের উদাহরণ দিয়েছেন।[৬১] ই আ অ ও উ। কেবল এ আর অ্যা ধ্বনির আলোচনায় 'এসো, একটি'-তে এ-র হ্রস্ব এবং 'এক'-এ দীর্ঘ উচ্চারণ নির্দেশ করেছেন। উচ্চারণভিত্তিক আলোচনায় 'এ' আর 'অ্যা'কে স্বতন্ত্র

ধ্বনি গণ্য করা উচিত বলে, 'প্রেম' উচ্চারণে দীর্ঘ এ-কার 'প্রেমিক' উচ্চারণে হ্রস্ব এ-কার ; 'এক'-এ দীর্ঘ অ্যা-কার, 'একশো'তে হ্রস্ব অ্যা-কার নির্দেশ করাই সংগত ছিল বলব। অ্যা' ধ্বনিটির উচ্চারণে চোয়াল যথেষ্ট বিবৃত হচ্ছে বলে, অ্যা স্বভাবত প্রসারিত বা wide। সেইজন্যেই হয়তো 'অ্যা'কে 'এ'-র প্রসারিত তথা দীর্ঘরূপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক এ-কারেব হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ যেমন আমরা শুনতে পাচ্ছি, তেমনি অ্যা-কারেরও উক্ত দুইপ্রকাব উচ্চারণ শুনতে পাচ্ছি। সেই হিসেবে বাংলার সাতটি স্বরধ্বনিরই সংস্থানভেদে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই-রকম উচ্চারণ পাওয়া যাচ্ছে।

'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' রচয়িতা লিখেছেন 'সংস্কৃত ব্যাকরণের শিক্ষা অনুসারে, আমরা « অ » -কে « আ » -এর হ্রস্ব বলিতে অভ্যস্ত হইলেও, বাঙ্গালায় « অ » -কার ও « আ » -কারের উচ্চাবণ-গত এই মৌলিক পার্থক্য টুকু আমরা অনুভব করিয়া থাকি।'[৬২] অনুরূপভাবে, সংস্কৃতের শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে 'অ্যা'-কে 'এ'-র বিকৃত বা দীর্ঘরূপমাত্র না বলে এ দুয়ের উচ্চারণগত মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করতে হয়। এ-ব্যাপারে বাংলা বইয়েতে স্নীতিকুমারের সংস্কৃতানু-গত্য দেখা গেলেও ১৯২৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত *Bengali Self-Taught* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন— **'The simple vowel sounds of Standard Colloquial Bengali (the chalit-Bhasha of educated people of Calcutta) are··· seven in number : [ŏ a, i, e, u, æ, o (ō), which occur both long and short.** [৬৩] অথচ পরবর্তীকালে রচিত বাংলা ব্যাকরণে তাঁর সংস্কৃত অভিমুখিতা কেন !

বাংলায় সংস্থাননির্ভর স্বরধ্বনি উচ্চারণের কথা আমাদের পূর্বসূরিরা বলে গেছেন। যেমন সুনীতিকুমার লিখেছেন— 'বাঙ্গালায় স্বর-বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র নহে, শব্দের দৈর্ঘ্য এবং বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ের উপবে বাঙ্গালার স্বর-ধ্বনির দৈর্ঘ্য নির্ভর করে।'[৬৪] একটি নিয়মও তিনি উল্লেখ করেছেন— **'Monosyllabic** অর্থাৎ একাক্ষর পদ, সাধারণতঃ বাঙ্গালায় দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয়'।[৬৫] খানিক আগে আমরা অবশ্য ছয়টি স্বরধ্বনির এক সিলেব্‌লবিশিষ্ট দৃষ্টান্ত আলোচনা কবে দেখেছি কেবল দীর্ঘ নয়, স্বরধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণও ঐ 'একাক্ষর' শব্দগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া, বিন্যাসভেদে একই একাক্ষর শব্দের স্বরধ্বনি কখনো দীর্ঘ কখনো হ্রস্ব রূপে উচ্চারিত হতে পারে, সে-ও

আমরা খানিক পরে দেখব। সুনীতিকুমারের বিবৃতিতে 'সাধারণতঃ' পদ, তাঁর মত প্রকাশে সতর্কতার পরিচয় দিচ্ছে।

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ তাঁর 'ভাষা-বোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে মুদ্রিত সপ্তম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' দাবী করেছিলেন— 'বাঙ্‌লায় স্বরের সহজ, বিকৃত, প্রসারিত ও সংকুচিত উচ্চারণ এই ব্যাকরণেই প্রথম দেখান হয়।'[৬৬] কোন্ সংস্থানে স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ বা গুরু, হ্রস্ব বা লঘু অথবা প্লুত বা দীর্ঘতর হবে, সুনীতিকুমারের পূর্ববর্তী এই বৈয়াকরণ তার নিয়ম নির্দেশ করেছেন— 'সংযুক্তবর্ণ এবং অনুস্বার ও বিসর্গ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী স্বরের উচ্চারণ গুরু হয়'[৬৭], যেমন— ওষ্ঠ, সত্য, কিংবা, বারংবার, অধঃ, মাতঃ ইত্যাদি। আবার, 'দূরাহ্বান, গান, উপহাস ও রোদনে স্বর দীর্ঘ হইলে তাহাকে প্লুত স্বর বলে।'[৬৮] শুধু হ্রস্ব ও দীর্ঘ কেন, নকুলেশ্বরের মতে ''অ' 'আ' 'ই' 'উ' 'এ' এবং 'ও' এই কয়েকটি স্বরের উচ্চারণ সহজ, প্রসারিত এবং সংকুচিত— এই তিন প্রকার'।[৬৮] দৃষ্টান্ত দিয়েছেন— 'ঘরের চাল, চালাঘর এখানে আকারের উচ্চারণ সহজ। একমণ চাল আন ; চাল বড়ো বেড়ে গেছে ; খেলার চা'ল বলে দাও— এইসকল স্থলে চকারে সংযুক্ত আকার প্রসারিত।'[৬৯] আর, ''আয় জোরে চলে'-এখানে আকারের উচ্চারণ সংকুচিত'।[৬৯] ও-ধ্বনির বেলায় যেমন— 'বোনা, শোনা'— সহজ ; 'সোম, ব্যোম'— প্রসারিত ; 'শোন্ আমার কথা'— সংকুচিত। 'অ্যা'— স্বরধ্বনিকে নকুলেশ্বর 'এ'-স্বরধ্বনির প্রসারিত রূপ বলেছেন[৭০], 'এ'-র বাস্তবিক দীর্ঘরূপের কথা ওঠেনি তাই। কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ধ্বনিবিচারে শুধু হ্রস্ব ও দীর্ঘ নয়, প্লুত এবং সংকুচিত স্বরব্যবহারও বিশেষ তাৎপর্যবহ হতে পারে।

সুনীতিকুমার তাঁর *Bengali Phonetics* বইতে 'Sound Attributes' প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'It has been found out from kymographic mouth-tracings that in disyllabic and polysyllabic words and sense groups like ´ekṭi একটি .. ´pata পাতা .., ´paka পাকা··· ´bagda বাগদা···, ´manot মানত··· di´bbendro দিব্যেন্দ্র···, ´kɔtokṭa কতকটা··· ´tɔktaṭa তক্তাটা···´kæmon-ac͡shen কেমন আছেন ´ami-debo আমি দেবো ··· ´Se-elo সে এল··· etc., the final vowels, although not stressed, are invariably longer than those preceding'[৭১]। মুহম্মদ আবদুল হাইও 'ধ্বনিমাপক যন্ত্র-লিপি' বা 'Kymograph tracing'— এর সাহায্যে পরীক্ষা

করে বলেছেন— 'যত অক্ষরেরই শব্দ হোক না কেন প্রত্যেক শব্দের ultimate বা শেষ syilable-এর স্বরধ্বনি তার পূর্বের syllable গুলোর তুলনায় দীর্ঘ। এ কারণেই 'কাজ' শব্দের 'আ' দীর্ঘ অথচ 'কাজ-কাম' একসঙ্গে উচ্চারণ করলে দেখা যাবে এখানকার 'কাজ' এর 'আ' পূর্ববর্তী 'কাজ'-এর 'আ'-এবং পার্শ্ববর্তী 'কাজ' শব্দের 'আ'-এর চেয়েও হ্রস্ব। এ ছাড়া একই স্বরধ্বনি একাক্ষরিক শব্দেও অঘোষ-ধ্বনির পূর্বে হ্রস্ব কিন্তু ঘোষধ্বনির পূর্বে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; যেমন 'আট' ও 'আজ' শব্দের 'আ' প্রথমটিতে হ্রস্ব কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।'[১২] পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলাভাষা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন— 'দেশ, কেশ, বেশ— হ্রস্ব এ, কিন্তু তেল, বেল, খেল-এতে দীর্ঘ এ।'[১৩] এখানেও সংকলিত উদাহরণ থেকে দেখা যায়, অঘোষ এবং ঘোষ ধ্বনির পূর্বে সংস্থিত হবার ফলেই যথাক্রমে স্বরের হ্রস্বতা এবং দৈর্ঘ্য ঘটেছে। এ সব ক্ষেত্রে অর্থভেদ দেখা না-দিলেও উচ্চারণবৈষম্যের ফলে ধ্বনিউচ্চারণগত (Phonetic) পার্থক্য সূচিত হচ্ছে। উচ্চারণে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, সংকুচিত ইত্যাদি কাল পরিমাণগত ভেদ নির্বিশেষে বাংলায় প্রধান সাতটি স্বরধ্বনি আছে বলে আমরা স্বীকার করে নিতে পারি।

বাংলার শিক্ষিত সাধারণের দ্বিধা-সঞ্জাত আরো একটি স্বরধ্বনির প্রতি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'In standard Bengali ɔ and o are often interchangable, and frequently, especially in learned words, there is a hesitance as to which sound to employ. This leads to an unconscious compromise, *viz.* a very low variety of o, which may be symbolized in transcription by ȯ.[১৪]

প্রসঙ্গটি ফার্গুসন-মুনীর আরও বিশদ করেছেন। তাঁদের মতে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিষ্কার অ ধ্বনি উচ্চারণ কৃত্রিম, বা খানিকটা পণ্ডিতসুলভ, আবার সম্পূর্ণ ও-কারযোগে উচ্চারণে প্রাকৃতজনোচিত শোনাবার ভয় জাগে বলেই উভয়ের মাঝামাঝি স্বর উচ্চারণের প্রবণতা ঘটে।[১৫] যেমন— ভয়ানক, সুন্দর, মঙ্গল, অন্তর, জীবন, অমর শব্দের শেষ সিলেব্‌লে। বাংলা মূলধ্বনির তালিকায় এই ত্রিশঙ্কু ধ্বনিটিকে ফার্গুসন-মুনীর স্বতন্ত্র মর্যাদা না-দিলেও 'marginal'[১৬] ধ্বনি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কারণ, বাংলা শিষ্ট উচ্চারণে এই ধ্বনিটির অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কবিতার আলোচনায় এইরকম ক্ষেত্রে ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণ নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার, কারণ ব্যক্তিগত রুচির উপরেই এই উচ্চারণ নির্ভরশীল। এমন-কি, একই

ব্যক্তি এই শব্দগুলিকে দুবার একইভাবে উচ্চারণ না করতে পারেন, দ্বিধা এতটাই সত্য।

বাংলা বর্ণমালায় চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন ব্যঞ্জনশ্রেণীতে স্থান পেলেও, ব্যঞ্জনধ্বনি হিসেবে এর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বরঞ্চ, স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার চিহ্ন হিসেবেই বাংলা ভাষার ধ্বনিলিপিতে এই বর্ণটির অস্তিত্বের সার্থকতা। কিছু ধ্বনিবিজ্ঞানী চন্দ্রবিন্দু যুক্ত সাতটি মূল স্বরধ্বনির অনুনাসিক সাতটি রূপকেও স্বতন্ত্র বাংলা ধ্বনির মর্যাদা দিয়েছেন। মূলস্বরের সংখ্যা নিয়ে ঐ বিতর্কে না গিয়ে, বাংলা স্বরধ্বনির অনুনাসিক রূপ সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকব। কবিতার ধ্বনিতে নাসিকার ব্যবহার আমাদের লক্ষ করবার বিষয় হবে।

বিদেশী শব্দ আত্মীকরণের সূত্রে, মূলতঃ বাংলা নয় এমন অনেক ধ্বনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কবিতাতেও বিদেশী পৌরাণিক, ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক ইত্যাদি বহুতর নাম বা বিষয় বা বাক্যাংশের উল্লেখসূত্রে অনেক বিদেশী ধ্বনি বাংলাতে চালু হয়েছে। সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ধারায় গৃহীত হয়ে গেলে, এসব ধ্বনি বিদেশী থাকে না আর। এইসব ধ্বনির উচ্চারণপদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে বাঙালি সংস্কারে তার প্রভাবের কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

সুনীতিকুমার *A Bengali Phonetic Reader* বইয়েতে একটি বিদেশী স্বরধ্বনির কথা তুলেছেন। 'ব্যস' উচ্চারণে একটি ছোটো অ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। 'শবনম' নামটির যথাযথ উচ্চারণ 'শ্যব্‌ন্যম্‌' বলতেও এই ছোটো অ-এর ব্যবহার হচ্ছে। নজরুলের কবিতায় ব্যবহৃত অনেক বিদেশী শব্দ আর বাক্যাংশে এই ছোটো বা তির্যক অ-এর উচ্চারণ লক্ষণীয়। 'মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ' অংশে যেমন 'হর্দম' শব্দের দুই সিলেব্‌লেই, আর 'দাঁড়ী মুখে সারি-গান— লা শরীক আল্লাহ'র 'শ'-তে। এই বিদেশী স্বরধ্বনিটি কবিতার সূত্রে বাঙালির ভাষাগত সংস্কারের অঙ্গীভূত হয়েছে। এই ধ্বনিটির ক্ষেত্রে, আরবী ফারসী উচ্চারণেব ধারণাযুক্ত মানুষের সঙ্গে অন্য বাঙালির উচ্চারণভেদ-ও দেখা যাবে।

আলোচনা শেষে, আমরা বাংলাতে ই, এ, অ্যা, আ, ছোটো আ, অ, ও, ও`, উ—এই কটি স্বরধ্বনি এবং বিন্যাসসাপেক্ষ ভাবে এসব ধ্বনির প্লুত এবং সংকুচিত উচ্চারণের বিষয়ে অবহিত হলাম। স্বরধ্বনিগুলির অনুনাসিক রূপের কথাও আমাদের জানা রইল।

বা ঙা লি র সং স্কা রে স্ব র ধ্ব নি চ রি ত্র

এবারে, বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণপদ্ধতি বা উচ্চারণস্থান ধ্বনির বিশেষ চরিত্র গঠন করে বাঙালির অন্তরে নির্দিষ্ট ধরনের বোধ সৃষ্টি করে কি না— সে-আলোচনা শুরু করা যায়। স্মরণ রাখতে হবে, স্বতন্ত্র ধ্বনিগুলিই শুধু নয়, পাশাপাশি ও বিভিন্ন প্রকার যুক্তবিন্যাসের উচ্চারণেও ধ্বনিগুলি নানা ধর্ম অর্জন করতে পারে। এখানে অবশ্য আমরা কেবল স্বতন্ত্র স্বরগুলির বিষয়ে বাঙালির সংস্কার আলোচনা করব।

সংস্কৃত বর্ণমালার নিয়মে অ ই উ এই তিন ধ্বনিকে মূল স্বরধ্বনি হিসেবে গণ্য করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর আলোচনায় এই তিনটি স্বরের উচ্চারণে মুখ-গহ্বরের বিবৃতি বা সংবৃতির কারণে, ধ্বনিগুলিতে সেই অনুপাতে ভাবাত্মক হেরফের নির্দেশ করেছিলেন।[১৬] এই বক্তব্যে তাঁর পদার্থবিদ্যার জ্ঞান তাঁকে যুক্তি সরবরাহ করেছে। সংস্কৃতপন্থী বিচারে ইনি আ-কে অ-এর দীর্ঘরূপ ব'লে গ্রহণ করেছেন। ''আ' উচ্চারণে আমরা বদন ব্যাদান করি ; মুখ কোটরের পরিসর ও বিস্তার যথা-শক্তি বাড়াইয়া লই। 'ই' উচ্চারণে মুখকোটরের বিস্তার ছোট হইয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারণে আরও ছোট হয়। আমি বলিতে চাহি যে, ঠিক এই জন্যই **law of association** অনুসারে 'অ' 'ই' 'উ' তিন স্বরের মধ্যে অ বড় বুঝায় ; ই তার চেয়ে ছোট ; উ আরও ছোট বোঝায়।'[১৭] যথাক্রমিক ক্ষুদ্রতার বিবরণপ্রকাশে বাংলাভাষার এই বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেছেন—'পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন না কি কোন রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি রাজা-টি নও, রাজা-টা ; আমিও পণ্ডিত-টি নই, পণ্ডিত-টা।'[১৭]

চকচকে, চিকচিকে ও চুকচুকের ভিতরে রামেন্দ্রসুন্দর ঔজ্জ্বল্যের ক্রমিক হ্রাস লক্ষ করেছেন। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে অ (এবং সংস্কৃতমতে, তার দীর্ঘরূপ আ), ই, উ, তিন স্বর যুক্ত হয়ে উচ্চারণ-প্রযত্নে পরিমাণ-ভেদে 'অর্থভেদ'[১৮] ঘটায়— সে-কথা মনে রাখবার অনুবোধ জানিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যঞ্জনবর্ণগুলির আলোচনায় রত হয়েছেন। বলেছেন— 'ঐ তিন স্বরের মধ্যে যেটির উচ্চারণ যত প্রযত্নসাপেক্ষ, যেটি উচ্চারণে মুখকোটরের পরিসর যত বড় করিতে হয়, সেই স্বর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে যুক্ত হইয়া তত আধিক্য জ্ঞাপন করে।'[১৯] অন্য দিক থেকে দেখলে—মুখবিবর যত চাপা থাকে স্বরধ্বনির উচ্চারণ তত চাপা হয়ে সংবৃত অল্পতা বোঝায়।

স্বর-ব্যঞ্জনের বিশেষ বিন্যাসক্রম বিভিন্ন শব্দে বাঙালির মনে যে-ধরনের ভাবনা-কল্পনার উদ্রেক করে, অর্থের সঙ্গে তার সাযুজ্য সন্ধানের এই যত্নে কিছু অতিকৃতি

সত্ত্বেও রামেন্দ্রসুন্দর যে-সব চিন্তা প্রকাশ করেছেন, তাঁর উত্তরস্থরি সাহিত্যিক সমালোচকদের ভিতরেও সেই চিন্তার পরিচয় লক্ষ করি। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য রচনা বা সমালোচনা কিংবা ভাষাঅঙ্গ বা সাহিত্য আঙ্গিকের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা কোনো কোনো ধ্বনির বিশেষ বিন্যাসে বিশেষ ভাবের উদ্ভাস দেখতে পেয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এই সুবিন্যস্ত আলোচনা এবং তাঁর পূর্বসুরি রবীন্দ্রনাথের খণ্ডছিন্ন আলোচনা ও মতের সঙ্গে বাংলার সাহিত্যিক বা আলোচকদের মতসাম্যকে আমরা বাঙালির মান ধারণা বলে গ্রহণ করতে পারি। সাহিত্য ক্ষেত্রে অনতিকথিত অথচ প্রচলিত এই ধারা উপস্থিত বিষয়ে বাঙালির সাধারণ সম্মতির পরিচয়বাহী। বিভিন্ন ধ্বনি বা ধ্বনিবিন্যাসক্রম বিষয়ে প্রকাশিত এই রকম কিছু মতের সাহায্যে বাঙালি সংস্কারে গৃহীত ধ্বনির ভাবময়তার নিদর্শন এখানে উদ্‌ধৃত করছি। এই সংকলন কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিকা আলোচনার সাধারণ পটভূমি তৈরি করবে।

ই স্ব র ধ্ব নি

রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থ থেকে দুটি উদ্‌ধৃতি পূর্বেই এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ই স্বরধ্বনি বিষয়ে অন্য কয়েকটি উক্তি এখানে সন্নিবেশ করছি—

৩. 'চট ছোট হইলে চটি হয়। চটি বই আর চটি জুতা উভয়ই পাতলা চ্যাটলা জিনিস।'[৮০]

৪. 'রেশমের চিক চিকণ দ্রব্য।'[৮১]

৫. 'বেতের ছড় ছোট হইয়া ছড়ি হয়।'[৮২]

৬. 'ছাল ছোট হইলে হয় ছিলকে।'[৮৩]

৭. 'বড় জিনিসের বেলায় টা, ছোট জিনিসের বেলায় টি— যথা মহিষ-টা আর বাছুর-টি।'[৮৪]

৮. 'টি...ক্ষুদ্রত্বের জ্ঞাপক— তাহা হইতে উৎপন্ন...টিকলি।'[৮৫]

৯. 'কেশমধ্যে লম্বমান টিকি এবং তামাক-সেবীর টিকা মুখ্য অর্থে উহার ক্ষুদ্রত্বের পরিচায়ক কি না বিবেচ্য।'[৮৬]

১০. 'বৃষ্টির ক্ষীণধারা টিপ টিপ করিয়া বা টিপির টিপির করিয়া বহুক্ষণ পড়িতে থাকে অর্থাৎ টিপোয়।'[৮৭]

১১. 'প্রদীপের ছোট শিখা দিপ দিপ করে।'[৮৮]

১২. 'ফিক্ করিয়া হাসিলে মুখের কিঞ্চিৎ বাতাস বাহিরে আসে। সে হাসি হো হো হাসি নয়, হালকা হাসি।'[৮৯]

১৩. 'বৃষ্টি অত্যন্ত মিহি ধারায় পড়িলে বলা যায় ফিন্ ফিন্ বৃষ্টি··· পড়িতেছে।'[৯০]

১৪. 'আগুনের হালকা কণিকার নাম ফিনকুটি।'[৯১]

১৫. 'কর্কশ বাক্য, যাহা কানে বাজে, তাহা বড় বড় বা বড়র বড়ব ; উহা আরও নিম্নস্বরে অস্পষ্ট ভাবে হইলে বিড় বিড় বা বিড়ির বিড়ির হইয়া পড়ে।'[৯২]

১৬. 'বিড়ালের ছানার মিউ মিউ শব্দ বড় মৃদু।'[৯৩]

এ-পর্যন্ত উদ্ধৃত সব অংশই রামেন্দ্রসুন্দর-বচনা থেকে সংগৃহীত। এবার ই-ধ্বনি সম্পর্কে 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতার আলোচনায় 'কে তুমি / মেলে নি উত্তর' চরণটির প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য সংকলন করছি।

১৭. 'মেলেনি' কথার 'ি' ধ্বনির চাপা টান যেন নিচু করে আমাদের ধরে রেখেছিল ঐহিক ধারণার দিকে, আশা ছিল যে এখনো না মিললেও একদিন জীবনরঙ্গসীমা থেকেই মিলবে-বা কোনো উত্তর।'[৯৪]

উচ্চারণ ভঙ্গিতে চোয়াল চাপা থাকে বলে সাধারণভাবে ই-ধ্বনি চাপা। ভাষাবিজ্ঞানীদের বিবরণ মতে— সংবৃত। প্রযত্নের অল্পত্ব এই ধ্বনিটি থেকে যে তাৎপর্য নির্দেশ করে তা নানা শব্দে আর বাক্যাংশে প্রকাশিত হয়েছে উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে। যেমন ছোটো, আধিক্যের অভাব, মোটা-নয়-এমন, পাতলা, নিম্নস্বরে অস্পষ্ট, চাপা টান, নিচু করে ধরে রাখা। সব কটি অভিব্যক্তি একই ধরনের অভিপ্রায় সূচিত করে। ই ধ্বনির এই চরিত্র স্মরণ রাখলে, পরে অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই স্বর কি তাৎপর্য বহন করতে পারে তা আমরা বিবেচনা করতে পারব।

এ স্ব র ধ্ব নি

'পদার্থবিজ্ঞান শাস্ত্র'[৯৫] মতে এ-স্বরধ্বনিকে 'সন্ধ্যক্ষর'[৯৫] বলা চলে না জেনেও রামেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃতমতে মত দিয়ে এ-কে অ এবং ই-র সন্ধিতে জাত স্বর বলেছেন।[৯৫] বাংলা, এমন-কি, সংস্কৃত শব্দেও ই-কার সহজেই এ-কারে পরিণত হয় বলে তাঁর কাছে এ-কারের সঙ্গে ই-কারের সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলে মনে

হয়েছে। দৃষ্টান্ত— মিটান > মেটান, মিশান > মেশান। সাধারণ ভাবে অ ই উ প্রসঙ্গে ব্যক্ত মতসূত্রে যে-টুকু ধরতে পারা যায়, তার বাইরে 'এ' স্বরের ধ্বনিগুণ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সোজাসুজি কিছু বলেননি। একটি উদ্‌ধৃতি থেকে 'খেঁচুনি' শব্দে এ-ধ্বনি উচ্চারণে বল বা চাপ প্রয়োগের আভাস পাই।

১. 'ওষ্ঠাধরের আচ্ছাদন জোরে টানিয়া লইয়া বা খেঁচিয়া দন্ত বিকাশ। ধনুষ্টঙ্কারে হাত পায়ের সবল আন্দোলন খেঁচুনি।'[১৬]

খ-ধ্বনির প্রসঙ্গেই জোর বা বলের কথা এলেও তাতে 'এ'-ধ্বনির সহযোগিতা গণ্য করা যায়, যেমন চন্দ্রবিন্দুর প্রভাব থাকাও সম্ভব বলে অনুভব করি। উচ্চারণ প্রক্রিয়ার দরুন এই অর্ধসংবৃত এ-ধ্বনিটিতে 'ই'-স্বরের চেয়ে পরিমাণে কম হলেও, কিছুটা চাপ থাকা স্বাভাবিক। স্বরধ্বনির ধ্বনিতাত্ত্বিক অবস্থান-চিত্রে 'এ'-র স্থান সংবৃত 'ই' এবং অর্ধবিবৃত 'অ্যা'-র মধ্যস্থলে। অর্থাৎ বিবৃত আ-ধ্বনির চেয়ে সংবৃত ই-র সঙ্গে এই ধ্বনির নৈকট্য রয়েছে। এই জন্য এ-কে অর্ধসংবৃত ধ্বনি বলা হয়।

প্লুত বা অতিদীর্ঘ এ-ধ্বনি প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে একটি উদ্‌ধৃতি সংকলন করা যায়—

২. ''হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া'...পংক্তিটির দীর্ঘ স্বরধ্বনি জীবনানন্দের ঈপ্সিত ক্লান্তিকে ধারণ করে রয়েছে। আত্মহত্যার বাসনা অস্তিত্বের নিরর্থকতা থেকে উদ্ভূত। সে অস্তিত্ব সকল সংগ্রামে বীতরাগ। তার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ। তার ক্লান্তিও দীর্ঘ।'[১৭]

জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই উদ্‌ধৃতিটিতে সম্বোধন পদের 'হে'-তে প্লুত উচ্চারণের দৈর্ঘ্য ক্লান্তি এবং অভিজ্ঞতার দীর্ঘতাকে ধারণ করে রয়েছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দীর্ঘ স্বরধ্বনি'র কথা বলতে গিয়েই ঐ মত দিয়েছেন— প্লুত উচ্চারণের কথা বলেননি। কিন্তু আমরা জানি, সম্বোধনে স্বরধ্বনির উচ্চারণ অতিদীর্ঘ বা প্লুত হয়। কবিতার উদ্‌ধৃতিতে প্লুত নয়, দীর্ঘ 'এ'-স্বর আরো একটি আছে। 'নিশীথের' পদে। এখানে রুদ্ধদলের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়েছে।

'এ' স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যে বিবরণ পাওয়া গেল তা এই— সজোর আকর্ষণ, সবল আন্দোলন, এবং দীর্ঘ ক্লান্তি।

অ্যা স্ব র ধ্ব নি

অ্যা-স্বরধ্বনিটিকে রামেন্দ্রসুন্দর 'এ' স্বরের 'ট্যারচা' উচ্চারণ বলে ধরেছেন।[৯৮] সুনীতিকুমার 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ এই ধ্বনিকে 'এ'-র দ্বিতীয় এবং 'বাঁকা বা বিকৃত উচ্চারণ' লিখেছেন।[৯৯] সেই সঙ্গে তাঁর উক্তি— 'বাঁকা এ-কার দীর্ঘ।'[১০০] 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ সুনীতিকুমার এই ধ্বনিকে বলেছেন 'খোলা'।[১০১]

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী' গানটি সম্পর্কে লিখেছিলেন 'এখানে 'হেরে' শব্দটির উচ্চারণটি Wide অর্থাৎ 'হ্যারে''।[১০২] এই 'ট্যারচা' বা 'খোলা' বা '**wide**' উচ্চারণে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে 'বদন ব্যাদান করি; মুখকোটরের পরিসর ও বিস্তার যথাশক্তি বাড়াইয়া লই'।[১০৩] অ্যা-ধ্বনি উচ্চারণ আ-ধ্বনির চেয়েও প্রযত্নসাপেক্ষ। তাহলে, **'law of association'** অনুযায়ী কষ্টকর বা কঠিন বিষয়ের বর্ণনায় অ্যা-ধ্বনি ব্যবহার হবার কথা। বিভিন্ন ব্যঞ্জন-ধ্বনির আলোচনাপ্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর অ্যা-স্বরযুক্ত কয়েকটি শব্দের এরকম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

১. 'কাঁচকো মাটি শক্ত মাটি, উহা ক্যাঁচ করিয়া পায়ে বিঁধে।'[১০৪]

২. 'ক্যাচলাম বিরক্তিকর।'[১০৫]

৩. 'খ্যাঁক্‌খেঁকে মানুষ সর্বদাই বিরক্ত থাকিয়া যেন খেঁক খেঁক করে।'[১০৬]

৪. 'জোরে টানার শব্দ খ্যাঁচ।'[১০৭]

৫. 'চ্যাটাং চ্যাটাং কথা যেন গাঢ় ভাবে শ্রোতার অন্তঃকরণে সংলগ্ন হয়।'[১০৮]

৬. 'চপেট আঘাত দ্বারা চাপ দিয়া···চ্যাপটা করা যায়।'[১০৯]

৭. 'জোরে ঘৃণা প্রকাশে মুখ হইতে শব্দ বাহির হয়— ছ্যাঃ।'[১১০]

৮. 'ঠেঙা কঠিন অস্ত্র; ঠেঙান কঠিন কর্ম।'[১১১]

৯. 'ঠেঁটা মানুষের প্রকৃতি এত কঠিন যে, উহাতে দাগ বসান শক্ত।'[১১২]

১০. 'ড্যাকরার ও ডাকাবুকোর চরিত্রগত অনেকটা মিল আছে।'[১১৩]

১১. 'ঢ্যামনা সাপ মোটাসোটা।'[১১৪]

১২. 'যার ইন্দ্রিয়গুলোও মোটা, তাহার কাজই ধ্যাবড়া, সে সর্বদা ধ্যাড়ায়।'[১১৫]

১৩. 'নোঙরা জিনিষ দেখিলে নেকার (সংস্কৃতে ন্যক্কার) আসে।'[১১৬]

১৪. 'মিউ মিউ শব্দ মৃদু; বড় বিড়ালের গম্ভীর গলায় উহা ম্যাও ম্যাও হইয়া পড়ে।'[১১৭]

১৫. 'আকস্মিক হেচঁকা টানে কোন জিনিসকে হেচঁড়িয়া লইয়া যাওয়া হোঁতকা স্বভাবের কাজ।'[১১৮]

উদ্ধৃত উদাহরণ থেকে— শক্ত, বিরক্তিকর, বলপ্রকাশক, বিশেষভাবে অন্তরে লাগিবার মতো গাঢ়, আঘাত বা চাপের ফলে জাত, প্রবল মনোভাব প্রকাশক, কঠিন, ডাকাবুকো, মোটাসোটা, মোটা বা স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতিবিশিষ্ট, ন্যক্কার বা অতি ঘৃণার ভাবসূচক, গম্ভীর, আকস্মিক টানের প্রবলভাব ইত্যাদি নানা অভিব্যক্তিতে প্রচণ্ডতার প্রকাশ দেখি।

আ স্ব র ধ্ব নি

পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, আ-স্বরধ্বনির ব্যঞ্জনা সম্পর্কে শুধু বাংলা নয়— সংস্কৃত ইংরেজি প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও একরকমের মত চালু রয়েছে। এখানে অবশ্য আমরা বাংলা ভাষার পরিধির ভিতরেই বিচরণ করব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

১. 'আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ' [১১৯] এবং

২. 'আকার স্বরটাই বাংলায় বড়োত্বের সুর লাগাইবার জন্য আছে।'[১২০]
এই স্বরধ্বনির প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য বাংলাভাষার ধ্বনিগুণ আলোচনার শুরুতে এবং ই-ধ্বনি প্রসঙ্গে তুলনাসূত্রে কয়েকবার এসেছে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জনধ্বনির সহযোগে আ-স্বর প্রয়োগে উপচিত ভাব বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের আর কয়েকটি উক্তি এখানে সংকলন করছি।

৩. 'মিষ্টান্নের ঠোলা ·· ঠুলির চেয়ে আকারে বড়। ঠোলার রূপভেদ ঠোঙা।'[১২১]

৪. 'আগুন যখন লেলিহান শিখা আন্দোলন করিয়া দাহ্য পদার্থের স্তূপ গ্রাস করিতে থাকে, তখন উহা···দাউ দাউ করিয়া জ্বলে।'[১২২]

৫. 'ধাপা দিলে মনে গুরুতর ধাক্কা লাগে, সন্দেহ নাই।'[১২৩]

৬. 'জোরে নিশ্বাস পড়িলে হাঁসফাঁস শব্দ হয় এবং বেগে দৌড়ের পর হাঁইফাঁই করিতে হয়।'[১২৪]

আ-স্বরধ্বনি সম্পর্কে অন্যান্যদের মত এরপরে বিন্যাস করছি। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার 'যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,/ মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার' অংশ প্রসঙ্গে সুধীরকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন —

৭. 'পুনঃপুনঃ আ-ধ্বনি, বিশেষতঃ ইচ্ছাপূর্বক ব্যাকরণ লঙ্ঘন করিয়া গঠিত 'দুর্দাম' শব্দে ও পরবর্তী 'দুর্বার' শব্দে আ-ধ্বনি দ্বারা মহানদ ব্রহ্মপুত্রের বন্যার এবং বাল্মীকির নবছন্দের বিপুলতা বা বিশালতা সঙ্গীতধর্মে পরিস্ফুট হইয়াছে।'[১২৫] সুধীরকুমারের আর একটি উদ্‌ধৃতি আগেও ব্যবহার হয়েছে—

৮. 'আমাদের ভাষায় ই-কার ক্ষুদ্রত্ব এবং আ-কার বিশালতা বা বড়ত্বসূচক, যেমন,— একটি—একটা, কুশী—কোশা, পুটলি—পোটলা, ছুরি—ছোরা ইত্যাদি। অনাবৃত আ ধ্বনির মধ্যেই এই বিপুলতা বা বিশালতা রহিয়াছে।'[১২৬]

রবীন্দ্রনাথের গানে 'দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ' পঙ্‌ক্তিটির বিষয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি—

৯. 'দীর্ঘস্বর ধ্বনিগুলি যেন উদাত্ত আহ্বানের সূচক।'[১২৭] মনে করিয়ে দেওয়া যাক, সুনীতিকুমারের নির্দিষ্ট নিয়মমতে এই উদ্‌ধৃতির সকল আ-কারই দীর্ঘস্বরের দ্যোতক নয়, রুদ্ধদলের প্রারম্ভে অবস্থিত আ-স্বর তিনটিই শুধু দীর্ঘ। রুদ্ধদলের প্রারম্ভের স্বরের দীর্ঘতার কথা স্মরণ রেখে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি বক্তব্য উপস্থিত করছি—

১০. 'স্থানগত এবং কালগত সুদূরতাকে ব্যঞ্জিত করার জন্যই দীর্ঘস্বরধ্বনির প্রতি জীবনানন্দের পক্ষপাত। দীর্ঘ স্বরধ্বনি, বিশেষ 'আ'-স্বর জীবনানন্দের উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের বিশেষ সহায়ক।'[১২৮] সংকলিত প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত—

ক. 'আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে,— পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে'। খ. 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'। গ. 'কাল তার অতিদূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায়'। ঘ. 'মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর' ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত সঞ্চয়নের পর লেখকের মন্তব্য— 'নাবিক-ক্লান্তির এবং পথিকক্লান্তির যে পটভূমিকা দরকার, 'আ' ধ্বনি কাল দৈর্ঘ্যকে ফুটিয়ে তুলে সেই ক্লান্তিকে মূর্ত করেছে'।[১২৮]

রবীন্দ্রনাথের "প্রথম দিনের সূর্য" কবিতার শেষচরণ 'পেল না উত্তর' সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের উক্তি—

১১. 'হতাশ নিষ্ফলতার বোধ…'না' শব্দের প্রসারিত 'আ'-কারে লেগে মুহূর্ত মধ্যে জ্যা-মুক্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হলো এক নিরন্ত শূন্যতার অন্তঃসারে।'[১২৯]

সংকলিত মতগুলি থেকে আ-স্বরধ্বনির ব্যঞ্জনা প্রসঙ্গে এই সব শব্দ বা বাক্যাংশ

পাওয়া গেল— পরিস্ফুট প্রকাশ, বড়োত্ব, বড়, আন্দোলন (সহযোগে বিস্তার), গুরুতর ধাক্কা, জোর, বেগ, বিপুলতা বা বিশালতা, উদাত্ত আহ্বান, স্থানগত এবং কালগত সুদূরতা, হতাশ নিষ্ফলতা, নিরন্ত শূন্যতা।

ছো টো আ স্ব র ধ্ব নি

'ব্যস্' উচ্চারণের ছোটো আ বাংলাতে বহিরাগত উচ্চারণ। এ-বিষয়ে বিশেষ সংস্কারের পরিচয় কোনো আলোচনাতে ধরা পড়েছে বলে জানা নেই। এই ধ্বনির উচ্চারণপ্রযত্ন এ অ্যা আ অ ও স্বরধ্বনির চেয়ে কম, এতটুকু বলা চলে। প্রযত্নের অল্পতা এই ধ্বনির চরিত্রে মৃদুতা বা ক্ষুদ্রত্ব ধর্ম সঞ্চার করবে। 'ব্যস' (অভিধানে 'বস্')[১৩০] শব্দের সংবৃত উচ্চারণের সঙ্গে শব্দটির 'নিবৃত্তি' বা 'ক্ষান্তি' অর্থের সম্পর্ক কল্পনা অবান্তর মনে হয় না।

অ স্ব র ধ্ব নি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংস্কৃত রীতিমতে বাংলা আ-কে অ-এর দীর্ঘরূপ হিসেবে গণ্য ক'রে অ এবং আ উচ্চারণের প্রভাব আলোচনায় এই দুই স্বরধ্বনিকে এক ধ'রেই তাঁর মত লিখেছিলেন। আমরা অ-এর চেয়ে আ-এর উচ্চারণে মুখ ব্যাদানের আধিক্য লক্ষ্য করি। আর, ই বা উ-এর চেয়ে অ উচ্চারণের জন্য 'মুখকোটরের পরিসর ও বিস্তারে' অধিকশক্তি ব্যয় হয়, রামেন্দ্রসুন্দরের এই কথা আমরা স্বীকার করি।[১৩১] রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—

১ '…থুসথুসে। উহা আকারে ছোট ; আকারে বড় হইলে হয় থসথসে।'[১৩২]

২ 'রাঙা টকটকে ; জ্যোতি একটু মৃদু হইলে হয় রাঙা টুকটুকে।'[১৩৩]

৩ 'তাড়াতাড়ি অভদ্রভাবে খাওয়া গবগব, গবাগব করিয়া গেলা। ছোটো ছোট গ্রাস গুবাগুব গেলা যায়।'[১৩৪]

৪ 'উ-কার যোগে গটগটের জাঁক কমিয়া গুটগুট হয়।'[১৩৫]

৫ 'মধুকরের গুনগুন (গুঞ্জন) শব্দে ততটা গাম্ভীর্য নাই ; সে উ-কারের গুণে। কিন্তু মানুষ যখন রাগে গনগন করে, অথবা আগুন যখন গমগম করে, তখন উহার গাম্ভীর্যে সন্দেহ থাকে না।'[১৩৬]

৬ 'চটেরই অল্পার্থে চিট, যথা চিট কাগজ বা কাগজের চিঠি।'[১৩৭]

৭ 'টকটক ছোট হইয়া হয় টুকটুক এবং টুকটাক।'[১৩৮]

৮ 'মহাদেবের 'ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে'। নির্বাণপ্রায় বহ্নিও ধিকি-ধিকি জ্বলে।'[১৩৯]

৯ 'স্পন্দনগতির…ধকধকানি মৃদু হইয়া ধুকধুকনিতে পরিণত হয়।'[১৪০]

১০ 'বাঁশের লাঠি মচ্ করিয়া ভাঙে, মচ শব্দে ধাঁকানব নাম মচকান ; মচ শব্দ খাট হইয়া মুচ হয় ; ছোট কঞ্চি মুচ করিয়া ভাঙে।'[১৪১]

১১ 'আঙুল মট্‌কাইলে মট্‌মট্ শব্দ হয় ; শব্দ তার চেয়ে মৃদু হইলে মুটমুট হয়।'[১৪২]

১২ 'মড়মড়ের চেয়ে ছোট মৃদু শব্দ মুড়মুড়।'[১৪৩]

সংকলিত দৃষ্টান্তগুলির বেশ কয়েকটিতে বিপরীত তুলনার সাহায্যে অ-ধ্বনি সংক্রান্ত বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। বিবরণগুলি এইরকম— আকারে বড়, মৃদু-র বিপরীত (প্রখর), ছোটো-র বিপরীত (বড়), জাঁক, গাম্ভীর্য, অল্পার্থ-র বিপবীত (অধিক), নির্বাণপ্রায়-এর বিপরীত (উজ্জ্বল), মৃদুগতি স্পন্দনের বিপরীত (দ্রুত), 'খাট হইয়া'-র বিপরীত (বৃদ্ধি পাইয়া)।

অ ও -র মা ঝা মা ঝি স্ব র ধ্ব নি

'আরম্ভ', 'ভুবন', 'ভীষণ', 'বন্ধন', ইত্যাদি শব্দের দ্বিতীয় সিলেব্‌লগুলির স্বরধ্বনি পরিষ্কার ভাবে অ না ও এই নিয়ে বাঙালীর মনে দ্বন্দ্ব আছে, আমবা আগে আলোচনা করেছি। এ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত ফার্গুসন ও মুনীরের আলোচনাতেও এই ধ্বনির স্বীকৃতি বিষয়ে দ্বিধা দেখি। তাঁরা লিখেছেন **'the possible existence of a 'compromise vowel' ò must be noted**।'[১৪৪] তাঁরা স্বরধ্বনির বিবরণমূলক সারণিতে 'অ' আর 'ও' ধ্বনির মধ্যবর্তী স্থলে এই ধ্বনির স্থান নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ অর্ধবিবৃত অ এবং অর্ধসংবৃত ও-র মাঝামাঝি জায়গায় ই ধ্বনির স্থান। ঐ সংস্থান. আর উচ্চারণে শক্তি ব্যয়ের আনুপাতিক হিসেব ছাড়া অন্য কোনোভাবে এই ধ্বনির প্রভাবেব কথা আমাদের আলোচনার আওতায় আনা দুষ্কর। ই বা উ-এর চেয়ে এই ধ্বনির উচ্চারণ নিঃসন্দেহে অধিক প্রয়াসসাপেক্ষ। মুক্ত রুদ্ধ দলে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনের ভাববহনের সহায় হয়ে এই ধ্বনিও যথাক্রমে হ্রস্ব এবং দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে। তবে অ বা ও-র প্রভাব থেকে দ্বিধাগ্রস্ত ও-র প্রভাব খুব একটা ভিন্ন হবে বলে মনে হয় না। দ্বিধাযুক্ত অস্তিত্বের কারণে বাঙালি সংস্কারে এই ধ্বনির প্রভাব নির্ণয়

করা কঠিন। উচ্চারণসাপেক্ষে কখনো অর্ধবিবৃত অ-ঘেঁষা, কখনো অর্ধসংবৃত ও-ঘেঁষা ভাব এই ধ্বনিতে দেখা দেবে— এইটুকু বলা যায়।

ও স্ব র ধ্ব নি

সংস্কৃত মতে 'ও' স্বরধ্বনির জন্ম অ এবং উ-র সন্ধির ফলে। অর্থাৎ 'এ'-র মতো 'ও'-ও 'সন্ধ্যক্ষর'। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ মতের সমর্থন করেন 'শুনা' থেকে 'শোনা' আর 'বুঝা' থেকে 'বোঝা' রূপান্তরে উ-কারের ও-কারে পরিবর্তিত হবার ধারা লক্ষ ক'রে। 'বাঙালীর মুখে…উকার অতি অল্পেই…ওকারে পরিণত হয়'।[১৪৫] উ-কারকে রামেন্দ্রসুন্দর ক্ষুদ্রত্ব নির্দেশক বললেও, ও-কারকে উ-কারের চেয়ে বৃহত্ব-নির্দেশক ভেবেছেন—

১ 'চামড়ার উপর ফোস্‌কা পড়িলে উহা বায়ুপূর্ণ বুদ্বুদের মত দেখায়; ছোট ছোট ফোস্‌কার নাম ফুস্‌কুরি।'[১৪৬]

২ 'মিষ্টান্নের ঠোলা ঠুলির চেয়ে আকারে বড়।'[১৪৭]

৩ 'খুঁটো মোটা হইয়া মুদ্গরে পরিণত হইলে হয় খোঁটা।'[১৪৮]

৪ 'মোটা গুটি হয় গোটা।'[১৪৯]

উ-র সঙ্গে তুলনাত্মক ভাবে অর্ধসংবৃত ও-ধ্বনির তিনটি সাধারণ গুণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে— 'ছোট'-র বিপরীত, 'আকারে বড়', আর 'মোটা'।

উ স্ব র ধ্ব নি

উ-স্বরধ্বনিতে সর্বাধিক ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশের কথা রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থ থেকে উৎকলিত নানা উদ্ধৃতিতে আগে ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আর রামেন্দ্রসুন্দরের আরো কিছু উক্তি এখানে সংকলন করছি।

১. 'যখন বলি, টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন এই বুঝায় যে, ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে, ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো আর-একটা বড়ো। উকারে অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ।'[১৫০]

২. 'কুচকুচ করিয়া কাটিয়া যে ছোট টুকরা পাওয়া যায়, তাহাকে কুচি বা কুচো বলে, যেমন কাঠের কুচো। কুচিকুচি করে কাটা অর্থ ছোট ছোট

টুকরা করিয়া কাটা। কুচকুচ করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করার নাম কুচোন।'[১৫১]

৩. 'কুচো, কুচি প্রভৃতি বিশেষণে খণ্ড জিনিসের ছোট টুকরা বুঝায় ; খুচরা শব্দেও ঐ খণ্ডতার ভাব আনে।'[১৫২]

৪. 'ঘষঘষ ছোট হইয়া ঘুষ ঘুষ হয় ; ঘুষঘুষে জ্বর অল্পমাত্রায় জ্বর।'[১৫৩]

৫. 'টি মাত্রা কমিয়া টু'তে বা টুকু'তে পরিণত হয় ; যথা একটু, জলটুকু, তেল-টুকু।...টুকু ক্ষুদ্রত্বের জ্ঞাপক— তাহা হইতে উৎপন্ন টুকরা।'[১৫৪]

৬. 'টুটিয়া যাওয়ার অর্থ ক্ষুদ্রত্ব-প্রাপ্তি।'[১৫৫]

৭. 'ছোট ফাটের নাম ফুটা ; এখানে ফাটের আ-কার ফুটার উ-কারে পরিণত হইয়া ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দেয়।'[১৫৬]

৮. 'ছোট ছোট ভঙ্গপ্রবণ জিনিস মুড় মুড় করিয়া ভাঙ্গে বলিয়া মুড়মুড়ে হয়। মুড়মুড় শব্দে যাহা চিবান যায়, তাহা মুড়ি ; উহার প্রকারভেদ মুড়কি।'[১৫৭]

৯. 'ববের মাথার উপরের আচ্ছাদন টোপর, মস্তকের ছোটখাট আচ্ছাদন মাত্রের নাম টুপি।'[১৫৮]

উদ্‌ধৃত অংশগুলি থেকে উচ্চারণে সংবৃত উ-ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যেসব শব্দ বা বাক্যাংশ পাচ্ছি তা হল— 'অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ', ছোটো / ক্ষুদ্র, ছোটো টুকরা, খণ্ডতা, অল্পমাত্রা, 'মাত্রা কমিয়া...ক্ষুদ্রত্ব,' 'ছোট ছোট', 'ছোটখাট'।

অ নু না সি ক স্ব র ধ্ব নি

বাংলা স্বরধ্বনিগুলির অনুনাসিক উচ্চারণে, নাসিকা ব্যবহারের ফলে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। সুনীতিকুমার তাঁর *Bengali Phonetics* গ্রন্থে স্বর-ধ্বনির ছক এঁকে দেখিয়েছেন যে, কোনো স্বরধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণের চেয়ে তার অনুনাসিক উচ্চারণে জিহ্বা অপেক্ষাকৃত উচ্চে অবস্থান নেয়। অর্থাৎ মুখ আর নাক দিয়ে যুগপৎ বাতাস বার করবার জন্য জিহ্বাকে একটু সংকুচিত হয়ে জায়গা করতে হয়।[১৫৯] উচ্চারণকালীন এই সংকোচনের প্রয়াস অনুনাসিক স্বরে স্বভাবতই খানিক চাপ সৃষ্টি করে। হাই সাহেব লিখেছেন—'সানুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখ ও নাকের মিলিত দ্যোতনা শোনা যায় ; যা মৌখিক স্বরধ্বনিতে শোনা তো দূরের কথা, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতেও শোনা যায় না'।[১৬০] মুখ আর

নাসিকাগহ্বর উভয়ই **resonator** বা ধ্বনিবিবর্ধক যন্ত্রের মতো কাজ করে অনু-নাসিক স্বরধ্বনিকে রণন-ঋদ্ধ করে।

স্বরধ্বনিগুলির আপন আপন বৈশিষ্ট্য থাকলেও, সংশ্লিষ্ট অন্তস্বর বা ব্যঞ্জনের প্রভাবে, কিংবা গোটা শব্দ বা পদের অন্যান্য স্বর-ব্যঞ্জনের প্রভাবে, ব্যঞ্জনার হেরফের ঘটতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দরের 'ধ্বনি-বিচার' পড়লে একথা ভালো করে উপলব্ধি করা যায়। তিনি স্বরধ্বনির আলোচনা সংক্ষেপে সেরে, ব্যঞ্জনধ্বনিভিত্তিক আলোচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যঞ্জনধ্বনি বিচারের আগে তুলনামূলক ভাবে অ / আ ই উ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে, পরবর্তী আলোচনায় কোথাও কোথাও এই ধ্বনিগুলির প্রয়োগে তাৎপর্যের আপেক্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্বরধ্বনি-চরিত্র প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি সংকলন করতে গিয়ে আমরা বারবার সে-রকম তুলনা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথও স্বরধ্বনির ব্যবহার প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'ঠকাঠক বলিলে এই বুঝায় যে, একবার ঠক করিয়া তাহার পরে বলসঞ্চারপূর্বক পুনর্বার দ্বিতীয়বার ঠক করা, মাঝখানের সেই উদ্যত অবস্থার যতিটুকু আকার যোগে আপনাকে প্রকাশ করে। এইরূপে বাংলাভাষা যেন অ আ ই উ স্বরবর্ণ কয়টাকে লইয়া সুরের মতো ব্যবহার করিয়াছে। সে-সুর যাহার কানে অভ্যস্ত হইয়াছে সে-ই তাহার সূক্ষ্মতম মর্মটুকু বুঝিতে পারে।'[১৬১] রবীন্দ্রনাথ কানের ক্ষমতা বিষয়েও ইঙ্গিত করেছেন এখানে। এ জাতীয় আলোচনায় শ্রবণশক্তির সূক্ষ্মতার কথা অনিবার্য। আরো একটি ব্যাপার লক্ষ করবার মতো, রামেন্দ্রসুন্দর এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ে অ আ ই উ এই চারটি ধ্বনিকেই সুর লাগাবার কাজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গণ্য করেছেন। বাকি স্বর কটির স্বতন্ত্র উল্লেখ এঁদের লেখায় পাই না।

অনেকসময় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণসূত্রে অর্জিত বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়ে সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে পারে। যেমন দেখা যায়, হ-ধ্বনির 'বলবত্তা, বেগবত্তা, স্থূলতা'[১৬২] আ স্বরধ্বনি সহযোগে যে-তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছে— উ-স্বর-ধ্বনি সহযোগেও সেই তাৎপর্য বজায় থাকছে। 'হটমট, হুটমুট, হুটুর মুটুর করিয়া হাঁটা যেন দম্ভের সহিত কঠিন ভূপৃষ্ঠ দলিয়া চলা।'[১৬২] হ-তে উ-কার যোগে দম্ভের কিছুই কমতি হল না। হ-এর বলবত্তার সঙ্গে ট-এর 'কাঠিন্যে'র[১৬৩] জোড় মিলে ব্যঞ্জনের শক্তি প্রবল হওয়াতে, উ ব্যবহারে ভাবটি দুর্বল হয়ে পড়ল না। এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে, শব্দে বা পদে ধ্বনির নানাবিধ বিন্যাস পরস্পর প্রভাববশে নানাবিধ ব্যঞ্জনার আকর হয়। ফলে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সকল প্রকার বিন্যাস

স্বতন্ত্র উপায়ে বিবেচনার বিষয়। উপস্থিত আলোচনায় ভাষার ধ্বনিচরিত্র পর্য-বেক্ষণের কিছু দিকনির্দেশ মাত্র করা যেতে পারে, অভিধান ধরে পূর্বাপর সকল শব্দ বিশ্লেষণ করলেও এ বিচার সম্পূর্ণ হতে পারে না। বাক্যের ভিতরে পদ হিসেবে বিন্যস্ত হয়ে নানা শব্দ পরস্পর প্রভাববশে কী তাৎপর্য বিভাসিত করবে — তা সেই-সব বিশেষ বিন্যাস বা সংস্থান অবলম্বনেই বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। কবিতাতে. প্রচলিত শব্দের নতুন অর্থে ঝল্‌সে-ওঠা সে-শব্দের বিন্যাসের উপরে অনেকটাই নির্ভর করে। কাজেই বাংলা বাক্‌ধ্বনির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যজাত চরিত্র সম্পর্কে সাধারণ কিছু আলোচনা করে কবিতা বিশ্লেষণকালেই বিন্যাস-নির্ভর বিবেচনায় অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবু. বাংলা বাক্‌ধ্বনির সাধারণ খতিয়ান ও বাঙালি লেখক-সমালোচকদের সংস্কারের পরিচয় চয়ন করে আলোচনার একটি ভিত্তি তৈরি করে নেবার জন্যে স্বরধ্বনির পর আমরা প্রথমে অর্ধস্বর ও পরে ব্যঞ্জনধ্বনির প্রসঙ্গে প্রবেশ করব।

বাংলা স্বরধ্বনি

ই এ অ্যা আ অ ছোটোঅ ও ঔ উ

ইঁ এঁ অ্যাঁ আঁ অঁ ওঁ উঁ

খ. অর্ধস্বর বা অর্ধব্যঞ্জন

পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি উচ্চারণের মধ্যবর্তী স্বল্প অবকাশে জিহ্বার স্থান পরি-বর্তনের সময়ে উৎপন্ন অসম্পূর্ণ স্বরধ্বনি আমাদের ভাষার শ্রুতিধ্বনি বা অর্ধস্বর হিসেবে পূর্ব থেকে পরিচিত। সুনীতিকুমার প্রমুখ বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতারা য়-শ্রুতি আর ব-শ্রুতি নামে যে দুটি ধ্বনির আলোচনা করেছেন, সে দুটিই সাধারণভাবে অর্ধস্বরধ্বনি রূপে স্বীকৃত। যেমন—'শ'-এ শ'-এ লোক জমা হল' বলতে, বাস্তব উচ্চারণে 'শয়ে শয়ে লোক জমা হল' বলা হয়। 'শ'-এর 'অ' উচ্চারণের পর পরিষ্কার 'এ' ধ্বনিত না হয়ে মাঝখানে একটি 'য়'-ধ্বনি জেগে উঠেই পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়। এর অন্য নাম শ্রুতিধ্বনি বা glide। উল্লিখিত উদাহরণে রয়েছে য়-শ্রুতি। 'সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধানে' 'খাওয়া' কথাটির ব্যুৎপত্তি

দেওয়া রয়েছে '[বাং খা (সং খাদ্)+আ]'।[১৬৪] অর্থাৎ 'খা আ'-র মাঝখানে শ্রুতিধ্বনির আগম হয়ে শব্দটি 'খাওয়া' হয়ে উঠেছে। এখানে ব-শ্রুতির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

বাংলার সবকটি স্বরধ্বনির পাশে অবশিষ্ট স্বরধ্বনিগুলোকে একটি একটি করে সাজিয়ে উচ্চারণ করলে, মধ্যবর্তী পর্যায়ের শ্রুতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। একই শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী স্থানে বা বাক্যে বিন্যস্ত অব্যবহিত দুই পদের মিলনস্থলে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে চকিতে এই ধ্বনি জেগে ওঠে।

সুনীতিকুমার দুইস্বরের মধ্যবর্তী এই খণ্ড স্বরাগমকে 'অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনির আগম'[১৬৫] বলে বিবৃত করেছেন। কারণটি ধ্বনিনাম থেকেই বোঝা যায়— 'য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি (অন্তঃস্থ-ব-শ্রুতি)'[১৬৫]— ব্যঞ্জন ধ্বনিমালার অন্তর্গত বর্ণনামই শ্রুতি ধ্বনি দুটির অভিধারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি হরফে এই দুই ধ্বনিকে যথাক্রমে Y আর W দিয়ে বোঝানো চলে। মুহম্মদ আবদুল হাইও ধ্বনিদুটির প্রচলিত নাম গ্রহণ করেছেন, তবে, তিনি ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মতভেদ স্মরণ করে বলে নিয়েছেন— 'যে অর্থে এগুলোকে semi-vowel বলা হয় সে অর্থেই এগুলোর নাম দেওয়া যেতে পারে semi-consonant।'[১৬৬]

'বাংলার অন্তঃস্থ ব' প্রসঙ্গে আবদুল হাই এই শ্রুতিস্বরটির ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত নির্দিষ্ট অভিধা নির্ণয়ের সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'একে কি বলা যাবে ? অর্ধস্বর (Semivowel) না স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ঔষ্ঠ্য শিসধ্বনি Voiced unaspirated bilabial fricative sound) ? এ শ্রুতিধ্বনি (glide)-র গঠন ও প্রকৃতি বিচার করে যদি বোঝা যায় যে, বাতাস দু-ঠোঁটের মাঝে কিছু পরিমাণে পিষে গেছে কিংবা দু-ঠোঁটের মাঝে বাতাসের ভারটুকু স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে তখন এটা হবে শিসধ্বনি। আর এ অনুভূতিটুকু স্পষ্ট না হলে এটা শ্রুতিধ্বনিবাচক অর্ধস্বর বলেই গণ্য হবে। উচ্চারণে ঠোঁট দুটো যত বেশি গোলাকার এবং নিকটতর হবে তত বেশি করে ধরা পড়বে এর শিসজাতীয় বৈশিষ্ট্য। আর বর্তুলাকার দু-ঠোঁটের ব্যবধান থাকবে যত বেশি ধ্বনি হিসেবে অর্ধস্বরের পর্যায়ে পড়ে ততই এর ঐশ্বর্য আর মাধুর্য কমে আসবে।'[১৬৭] অর্থাৎ বলা হল, শ্রুতিধ্বনির উচ্চারণে স্বর অথবা ব্যঞ্জন দুই ধর্মেরই পরিচয় প্রকাশ পেতে পারে। ভাষান্তরে, ব-শ্রুতির উচ্চারণ কোথাও শিস ব্যঞ্জনধ্বনির মতো— কোথাও-বা অর্ধস্বরের মতো হতে পারে। সত্যিই 'দুয়ো'[১৬৮] বা 'দেউল' বলতে শিসভাব যত

স্পষ্ট, 'ধোয়া'[১৬৮] বা 'দেওয়া' বলতে তত নয়। আগে পরে বিন্যস্ত স্বরধ্বনি শ্রুতি-ধ্বনিটিব চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করছে। অর্থাৎ, শ্রুতিধ্বনি কোন্ কোন্ স্বরধ্বনির মাঝখানে রয়েছে— তারই উপরে নির্ভর করে স্বর অথবা ব্যঞ্জনধর্ম অঙ্গীকার করে থাকে।

মুহম্মদ আবদুল হাই 'পিউ', 'শিউলি', 'দিয়া', 'নিয়ে' ইত্যাদি কিছু শব্দে 'ই'-শ্রুতি নামে আরো একটি বাংলা অর্ধস্বরের কথা বলেছেন।[১৬৯] 'অতিরিক্ত আর একটি অর্ধস্বরের অস্তিত্ব বাংলায় স্বীকার করলেও করা যেতে পারে'[১৭০] বলে দ্বিধাগ্রস্তভাবে কথাটি উল্লেখ করেছেন তিনি। ইংরেজি **'opportunity', 'argue', 'issue'** প্রভৃতি 'শব্দের '**u**' ধ্বনির প্রারম্ভে শ্রুত ই-জাতীয় ধ্বনি বাংলা উদাহরণগুলির ই উ (পিউ, শিউলি), ই আ (দিয়া), ই এ (নিয়ে) ইত্যাদি ধ্বনিযুগলের মধ্যস্থলে শোনা যাচ্ছে বলেছেন। আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে '*j*' কে এই ধ্বনির প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে— **'Pi*j*u, *Si*j*uli*, di*j*a, ni*j*e'**। 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা'র বিবরণে[১৭১] হাই সাহেব বাংলার বহিরাগত 'ইয়ার' শব্দ এবং ইংরেজির **'Yes'** শব্দের উচ্চারণকে আন্তর্জাতিক লিপিতে '*j*a : r' এবং '*j*es' বানানে লিখেছেন। এখানে 'ইয়া' আর 'ইয়ে' উচ্চারণের আরম্ভে জিহ্বা, আর তালু তথা প্রশস্ত দন্তমূলের মধ্যবর্তী বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে বাতাস বিলক্ষণ চাপ খাচ্ছে। তুলনামূলকভাবে য়-শ্রুতি বা Y উচ্চারণে জিহ্বা আর তালুব ব্যবধান বেশি থাকে বলে বায়ু অপেক্ষাকৃত সহজে মুক্তি পায়। যেমন 'মায়া' (maya) বা 'খেয়া' (kheya)-তে। খেয়াল করলে বোঝা যাবে— 'ইয়ার' 'ইয়েস'-এর ক্ষেত্রে ই-ধ্বনির পরবর্তী শ্রুতি এবং 'মায়া'র ক্ষেত্রে আ আর এ ধ্বনির পরবর্তী শ্রুতির উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির প্রভাব পড়েছে। সেই হিসেবে '*j*' বা ই এবং Y বা য়-কে একই শ্রুতিধ্বনির দুই রূপভেদ বলা ভুল হয় না। ব-শ্রুতি প্রসঙ্গে আবদুল হাই যেমন বলেছেন সেভাবে বললে, *j* বা ই উচ্চারণে বায়ুঘর্ষণের আধিক্যের জন্য, বা 'বাতাসের ভারটুকু স্পষ্ট অনুভূত' হবার দরুন, এই ধ্বনির 'শিসজাতীয় বৈশিষ্ট্য' প্রকট হচ্ছে। আর তেমনি, **Y** বা য় উচ্চারণে জিহ্বা আর তালুর ব্যবধান বেশি থাকার দরুন 'অর্ধস্বর' স্বভাব প্রকাশ পাচ্ছে বেশি। অর্থাৎ একই শ্রুতিধ্বনি কখনো ব্যঞ্জন কখনো স্বর ধর্ম গ্রহণ করছে।

সুনীতিকুমার 'বাঙ্গালা ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ'[১৭২] প্রসঙ্গে য আর ব এই অন্তঃস্থ ধ্বনিদুটিকে **'Semi-vowels** অর্থাৎ অর্ধ-স্বর' নাম দিয়ে ধ্বনিদুটির উচ্চারণ

দেখিয়েছিলেন, যথাক্রমে 'য (=য়, অর্থাৎ 'ইঅ')'[১৭৩] এবং 'ব (ইহার মূল উচ্চারণ ছিল ইংরেজি w-এর মত, অর্থাৎ 'উঅ')'। আরো বলেছিলেন, 'এই অক্ষরগুলির অন্তর্নিহিত অ-কারকে বাদ দিলে যথাক্রমে স্বরধ্বনি ≪ ই (=য়),··· উ (=ব, ≫W) মিলিবে'[১৭৩]। এই আলোচনা থেকে আমরা, যেমন য়-শ্রুতি বা অর্ধস্বরের 'ই' নাম— তেমনি ব-শ্রুতি বা অর্ধস্বরের 'উ' নামকরণেরও যুক্তি পেয়ে যাই।

উচ্চারণের দিক থেকে বিচার করলে, ব্যঞ্জন ধর্মাক্রান্ত য়-শ্রুতিতে 'ই' এবং ব-শ্রুতিতে 'উ'-য়ের পরিচয় যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি স্বরধ্বনিধর্মী উল্লিখিত শ্রুতিধ্বনিদুটির প্রারম্ভে আমবা 'এ' এবং 'ও' ধ্বনির আভাস শুনতে পাব। য়-শ্রুতির ব্যঞ্জনধর্মী দৃষ্টান্ত আগেই উল্লিখিত হয়েছে— 'শিউলি' বা 'নিয়ে', স্বর-ধর্মী দৃষ্টান্ত— 'মায়া' আর 'খেয়া'। ব-শ্রুতির ব্যঞ্জনধর্মী দৃষ্টান্ত— 'ধুয়া' আর 'মধুউৎসবে' স্বরধর্মী দৃষ্টান্ত 'ধোয়া' আব 'হাঁগোএ কাদের দেশে'। উচ্চাবণের ভিত্তিতে স্ববধর্ম ব্যঞ্জনধর্ম অনুযায়ী য়-শ্রুতি আর ব-শ্রুতিতে ই় উ় এ় ও় মোট চারটি অর্ধস্বরকে স্বীকৃতি দিতে হয়।

বাংলা বানানে শ্রুতিধ্বনির জন্য পৃথক পৃথক এবং নির্দিষ্ট বর্ণ ব্যবহাবের চল নেই। সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন[১৭৪] বাংলায় একই সঙ্গে 'শুওর' আর 'শুয়োর' চলে। সাহিত্যে দুরকম লিখবার চলন থাকার ফলে অভিধানেও দেওয়াল / দেয়াল[১৭৫] দুও / দুয়ো[১৭৬] যাওব / যায়ব[১৭৭] প্রভৃতি দুরকমের বানান ধরা পড়েছে। তেমনি— আই / আয়ি[১৭৮] মউর / ময়ূর[১৭৪]। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'মাসি' গল্পে 'ছায়া'র বানান লিখেছেন 'ছাওয়া'। 'তারি ফাঁক দিয়ে উঠল চাঁদ ; পুকুর-জলে তার ছাওয়া।' 'চাঁদের আলো পাতার ছাওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘবে।'[১৭৮] প্রতিবর্ণীকরণের সময়েও একই শব্দের শ্রুতিধ্বনি নির্ধারণে গোল বাধে। হাই সাহেব 'দিয়া' শব্দ di*j*a লিখেছেন ২৯ পৃষ্ঠায়, ১৪৬ পৃষ্ঠাতে আবার লিখেছেন 'diya'। ৩৪৭ পৃষ্ঠায় 'ইয়ার' লিখতে '*j*a : r', ১৪৬ পৃষ্ঠায় 'iyar' ১৪৬ পৃষ্ঠায় 'প্রিয়া (priya)', ১৪৯-এ 'pri*j*a'। শ্রুতিধ্বনি শনাক্ত করার প্রসঙ্গে হাই সাহেব বলেছেন যে— 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি হিসেবে শ্রুতিধ্বনিবাচক অর্ধস্বর ধ্বনিগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কথা জীবন্ত হয়ে উঠলে শব্দ ও বাক্যের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বিশেষভাবে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে এরা পিচ্ছিলধ্বনিরূপে উত্থিত হয়। এ কারণে শব্দের গোড়াতে যেমন এদের দেখা

যায় না তেমনি শব্দের ভেতরে কিংবা বাকপ্রবাহে (speech stream) দুই শব্দের মাঝখানে উত্থিত ক্ষেত্রগুলিতে এদের স্বরূপ নির্ণয় করাও দুরূহ হয়ে ওঠে।[১৭৯]

উপরে আলোচিত অর্ধস্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণের উপক্রমে ব্যঞ্জনধর্ম লক্ষ করা যায়। ফুসফুস-নিঃসৃত বাতাস শুরুতেই অল্পবিস্তর পিষ্ট হয়ে শেষে পরবর্তী স্বরধ্বনিতে লীন হয়ে মেশে। ফলে, আরম্ভে ব্যঞ্জন আর শেষে স্বরধ্বনির ধর্ম পরিস্ফুট হয়। এর ঠিক বিপরীত ধরনের একরকম অর্ধস্বরও বাংলায় রয়েছে। হসন্ত যৌগিক ধ্বনিগুলিতে এই দ্বিতীয় প্রকার অর্ধস্বরের পরিচয়। ই এ ও উ ধ্বনির অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত উচ্চারণে-সমাপ্ত এক সিলেব্‌লবিশিষ্ট যৌগিকস্বরে (যেমন— যাই, যায়, যাও এবং জাউ-তে) বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ধরনের অর্ধস্বর বিধৃত। এ ধ্বনিগুলির প্রারম্ভিক স্বরধ্বনি মুক্তভাবে উচ্চারিত হয়ে অব্যবহিত পরবর্তী স্বরে মিলিয়ে যায়, কিন্তু শেষাংশ আকস্মিকভাবে খণ্ডিত হয়ে হস্‌যুক্ত হয় বলে ব্যঞ্জনান্ত ভাব জাগে। পূর্বে উল্লিখিত আমেরিকান বিজ্ঞানী চার্লস্ এ. ফার্গুসন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর *The Phonemes of Bengali* নামের যৌথ-রচনার ফলে দ্বিতীয় ধরনের অর্ধব্যঞ্জনগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই অর্ধস্বরগুলির আরম্ভে কোনো-না-কোনো স্বর থাকে বলে বাংলায় এই ধ্বনিগুলি যৌগিক স্বর[১৮০] বা দ্বিস্বর[১৮১] নামেই আলোচিত হয়েছে।

ফার্গুসন ও মুনীরের বাংলা মূলধ্বনির আলোচনায় য়-শ্রুতি ব-শ্রুতির প্রসঙ্গ বর্জিত হয়েছে। তাঁরা এ্ ই্ ও্ উ্ অর্ধস্বর কটিকে মূলধ্বনির মর্যাদা দিয়ে[১৮২] ওই চারটি ধ্বনির পূর্বে বা পরে স্বরধ্বনিযুক্ত রূপে এই ধ্বনিগুলির ব্যবহার দেখিয়েছেন। যেমন— 'ভালোয়্' (bhaloe) আর 'রেলও্য়ে' (reloe)-তে ওএ্ এবং ও্এ। হাই সাহেবের অনুসরণে সুনীতিকুমারের বিবরণ থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করে, প্রথম ধরনের অর্ধস্বরের আলোচনায় আমরা দেখেছি য় এবং ব শ্রুতির ব্যঞ্জনঘেঁষা রূপে ই এবং উ আর স্বরধ্বনিপ্রধান রূপে এ এবং ও উচ্চারণ শুনতে পাওয়া যায়। তাই ই্ এ্ ও্ উ্ ধ্বনি চারটিকে বাংলাতে অর্ধস্বর তথা অর্ধব্যঞ্জন বলে স্বীকার করা যুক্তিসংগত। এই ধ্বনির ব্যঞ্জনধর্মী বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া এই-সব ধ্বনির উচ্চারণ হয় না। হয়তো এই কারণেই পবিত্র সরকার লিখেছেন— 'বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে ব্যঞ্জন ও অর্ধস্বরের আচরণ অনেকাংশে এক'।[১৮৩]

যৌ গি ক স্ব র ধ্ব নি

অর্ধস্বর / অর্ধব্যঞ্জন প্রসঙ্গে যৌগিক ধ্বনির কথা এসে গেছে বলে, এখন এখানে যৌগিক স্বরধ্বনির প্রসঙ্গ আলোচনা করে নেওয়া যাক।

বাংলাতে আঠারোটি হসন্ত দ্বিস্বর ধ্বনির সন্ধান পাই। ১. ই ই্— দিই, নিই। ২. ই উ্— পিউ, মিউ। ৩. এ ই্— সেই, নেই। ৪. এ উ্— ফেউ, ঘেউঘেউ। ৫. এ ও্— সেও, এও। ৬. অ্যা এ্— দেয়, নেয়। ৭. অ্যা ও্— ম্যাও, শেওলা। ৮. আ ই্— যাই, নাই। ৯. আ উ্— হাউমাউ, জাউ। ১০. আ এ্— যায়, ধায়। ১১. আ ও্— খাও, দাও। ১২. অ এ্— হয়, নয়। ১৩. অ ও্— হও, লও। ১৪. ও ই্— হই, সই। ১৫. ও এ্— ধোয়, শোয়। ১৬. ও ও্— ধোও, শোও। ১৭. ও উ্— বউ, মউ। ১৮. উ ই্— রুই, শুই।

বাংলাতে স্বরান্ত দ্বিস্বর যৌগিকধ্বনির সংখ্যা বেড়ে গেছে বিদেশী শব্দ আত্মীকরণের সূত্রে। তাছাড়া, কবিদের ছন্দানুরোধে ব্যবহৃত কিছু অনতিপ্রচলিত যৌগিক ধ্বনিও বাংলায় দেখা দিয়েছে। এগুলি ব্যতিক্রান্ত বা আর্ষপ্রয়োগ হলেও, কবিদের এমন ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকা দরকার। স্বরান্ত যৌগিক ধ্বনির তালিকা সম্পূর্ণ করা কঠিন, কারণ, বিদেশী শব্দের ব্যবহারসূত্রে এমন অনেক ধ্বনি নিয়ত আমাদের ভাষায় প্রবেশ পেয়ে যাচ্ছে। তা হলেও, মোটামুটি একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। ১. ই্ এ— **ইয়ে**মেন, 'গাছে **গ্যে** যেই চড়েছি' (নজরুল)। ২. ই্ অ্যা— 'এ্যা বড় কাস্তে নিয়ে' (নজরুল)। ৩. ই্ আ— **ইয়া**র। ৪. ই্ অ— নিউ**ইঅ**র্ক। ৫. ই্ ও— **য়ো**রোপ। ৬. ই্উ— '**ন্যু**র‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো' (রবীন্দ্রনাথ)। ৭. এ্ আ— 'রঙিন রসে— **প্যালা** ভরে নাই' (রবীন্দ্রনাথ)। ৮. ও্এ— **ওয়ে**টিংরুম। ৯. ও্ আ— পা**ওয়া**। ১০. উ্ই— 'গির্জাভাঙা হা**উই**টজারের গর্জনে হায় ধর্ম গেল তল' (সত্যেন্দ্রনাথ)।

কিছু ত্রিস্বর যৌগিক ধ্বনির ব্যবহারও বাংলায় আছে। 'দা**ওয়াই**', 'হা**ওয়ায়**' 'খা**ওয়াও**' ইত্যাদি শব্দে যৌগিক দ্বিস্বর 'ও্আ'-র পরে আর-একটি স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হচ্ছে। স্বরান্ত অর্ধস্বর 'ও্আ'-র সঙ্গে ই এ ও স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে এই যুগ্মধ্বনি কটি সৃষ্টি হচ্ছে, এমনও বলা যায়। 'সে খা**ইয়াও** গেল না' বা 'খা**ইয়াই** আপিসের জন্য ছুটিল' বাক্যে ই আ ও এবং ই আ আর ই স্বরধ্বনি মিলিত হয়ে যৌগিক ত্রিস্বর গঠন করেছে। এগুলিতে অর্ধস্বর + স্বরধ্বনি +

অর্ধস্বরধ্বনির সমবায় লক্ষ করা যাচ্ছে। আলোচ্য ধ্বনিগুলির শেষাংশ আকস্মিক ভাবে খণ্ডিত হয়ে শেষ স্বরধ্বনি প্রলম্বিত হতে পারে না বলে এই-সব ধ্বনিশেষ ব্যঞ্জনধর্মী হয়ে পড়ে। কবিতায় এই ত্রিস্বর ধ্বনি রুদ্ধদল হিসেবেই গণ্য হবে।

অর্ধস্বর/অর্ধব্যঞ্জন ও অন্য যৌগিক স্বরধ্বনি বিষয়ে বাঙালির সংস্কার

স্বরান্ত ও হসন্ত অর্ধস্বর / অর্ধব্যঞ্জন এবং অন্য যৌগিক ধ্বনির উচ্চারণরীতি এই ধ্বনি বিষয়ে বাঙালিব মনে কী রকমের সংস্কার জাগাতে পারে, এবারে সে আলোচনা করা যাক। উচ্চারণ সূত্রে অর্ধস্বর / অর্ধব্যঞ্জন বা ত্রিস্বর যৌগিকধ্বনিগুলির ভিতরে যখনই শিসধ্বনির উদ্ভব হচ্ছে তখনই মুখগহ্বরে বাতাস পিষ্ট হয়ে উষ্মতার জন্ম দিচ্ছে। এর ফলে বিশেষত স্বরান্ত মোচনে সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনিতে কিছু উষ্মতা বিস্তৃত হচ্ছে। ব্যঞ্জনধ্বনি-চরিত্র আলোচনায় আমরা উষ্মধ্বনির ভাব-প্রসঙ্গ আলোচনা করব। হসন্ত অর্ধব্যঞ্জন আর ত্রিস্বর যৌগিক ধ্বনিতে উষ্মতাপরিণাম আরো স্পষ্ট শ্রুতিগ্রাহ্য। শিসধ্বনি হসন্ত হলেও অনবরুদ্ধ বা continuant স্বভাবযুক্ত। ফলে স্বরান্তের চেয়ে হসন্ত ধ্বনিতেই উষ্মতাধর্ম স্পষ্টতর হয়। স্বরান্ত ধ্বনিতে তবু মোচনের পথ থাকে। সাধাবণভাবে অর্ধস্বব / অর্ধব্যঞ্জন ও ত্রিস্বর যৌগিকধ্বনি চরিত্রগত ভাবে কমবেশি শ্বসিত শ্রেণীতে পড়ে। হাই সাহেবের অনুসরণে আমাদের আলোচনা-মতে ই্ উ্ যুক্ত ধ্বনিতে শিসভাব তুলনামূলক ভাবে বেশি হবে। আর, এ্ ও্ ধ্বনিগুলির উচ্চারণে বর্তুলাকার দু-ঠোঁটের মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হবে, 'ধ্বনি হিসেবে অর্ধস্বরের পর্যায়ে পড়ে ততই এর ঐশ্বর্য কমে আসবে'[১৮৮]।

অর্ধস্বরের ধ্বনিব্যঞ্জনা প্রসঙ্গে আবদুল হাই সাহেব বলেছেন[১৮৯] যে ১. স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার নির্দিষ্ট অবস্থান আছে বলে তার যেমন বিশেষ ব্যঞ্জনা থাকে— অর্ধস্বরধ্বনিতে তা থাকে না। ২. 'উচ্চারণসময়ের দিক থেকে তার স্থিতিকাল অল্প অর্থাৎ মুখের মধ্যে ধ্বনিটি তৈরি হতে-না-হতেই উচ্চাবিত হয়ে যায়'। ৩. 'অর্ধস্বরধ্বনির তুলনায় তার পূর্বের কি পরের স্বরধ্বনি অনেক বেশি অনুরণিত।' ফলে, 'একটি পূর্ণ স্বরধ্বনির তুলনায় তার অর্ধস্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার রূপ উচ্চতর এবং বায়ুপথ সংকীর্ণতর হয়।'

অর্ধস্বর ধ্বনিগুলির ব্যঞ্জনস্বভাবের ফলে সেগুলিতে ঐ ধর্মী ব্যঞ্জনার বিষয়ে হাই সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এখানে সংকলন করছি। ' 'বাক', 'হাত' প্রভৃতি শব্দের

বদ্ধ অক্ষর (closed syllable) উচ্চারণে 'ক', 'ত' প্রভৃতি অক্ষরান্ত ধ্বনি যেমন শ্বাসকে ক্ষণিকের জন্য আটকে দেয়, ঠিক তেমনি 'নয়', 'যায়' প্রভৃতি শব্দে দ্বিস্বরের (diphthong) শেষ ধ্বনিও শ্বাসকে একইভাবে ক্ষণিকের জন্য আটকে রোধ করে ধরে। অর্ধ-স্বরধ্বনির সাহায্যে এ ধরনের ব্যঞ্জনজাতীয় ধ্বনির কাজ হয় দেখে এ জাতীয় ধ্বনিকে এ অবস্থায় consonantalও বলা যেতে পারে। বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘষা-লাগা-লাগা পর্যায়ে এসে পৌঁছে অথচ যথাযথ ঘষা লাগে না দেখে অর্ধ-স্বর বা অর্ধ-ব্যঞ্জনধ্বনি যেমন ঘর্ষণজাত ধ্বনি নয়, তেমন বায়ুপথের সংকীর্ণতম অবস্থায় উচ্চারিত হয় দেখে দ্যোতনার দিক থেকে এ ধ্বনি স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন এবং লঘুভার।'[১৮৬]

তা হলে আলোচ্য ধ্বনিগুলির বিষয়ে আমরা মোটামুটিভাবে জানলাম যে, হসন্ত অবস্থায় ধ্বনিগুলি বিশেষভাবে উষ্মতাশ্বসিত, স্বরান্ত মোচনেও সংশ্লিষ্ট স্বরে উষ্মতার সঞ্চার ঘটে। স্বরধ্বনির তুলনায় অর্ধস্বরের অনুরণন কম। রুদ্ধদলে এই ধ্বনিগুলি consonantal। ব্যঞ্জনধ্বনি এবং স্বরধ্বনি উভয়ের তুলনায় এই-সব ধ্বনি গুরুত্বহীন এবং লঘুভার।

বাংলা অর্ধস্বর / অর্ধব্যঞ্জন

ই̯ এ̯ ও̯ উ̯

গ. ব্যঞ্জনধ্বনি

বাংলাভাষায় প্রচলিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে উচ্চারণরীতির ভিত্তিতে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। মুখাভ্যন্তরের উচ্চারক প্রত্যঙ্গগুলিকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত যে ধ্বনিগুলির উচ্চারণ কোনোমতেই সাধিত হয় না, সেগুলি প্রথম দলে। আর, উচ্চারকগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকলেও যে ধ্বনিগুলি স্বরধ্বনির সহায়তা-নিরপেক্ষ ভাবেও ধ্বনিত হতে পারে, সেই অনর্গল(continuant)-ধর্মী ধ্বনিগুলিকে রাখব দ্বিতীয় দলে।

প্রথম শ্রেণীর ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা স্পৃষ্টধ্বনি নাম দিয়েছেন। সুনীতিকুমার আর সুকুমার সেন বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় এই রকমের ধ্বনিকে 'occlusive' বলে বিশেষিত করেছেন[১৮৭], তর্জমা করে যাকে বলা

যায় 'অবরোধক'। ক খ গ ঘ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ এই ষোলোটি অবরোধক ব্যঞ্জন স্পৃষ্টধ্বনি বা stops। স্পৃষ্টধ্বনিগুলির আর-এক বৈশিষ্ট্য, এই ধ্বনির উচ্চারণকালে ফুসফুস থেকে বহির্মুখী বাতাস উচ্চারকদের এক দমকে বিচ্ছিন্ন করে মুক্ত হয়।[১৮৮] চ ছ জ ঝ ধ্বনি উচ্চারণের পূর্ব পর্যন্ত জিহ্বা ও অন্য উচ্চারক পরস্পর সংস্পৃষ্ট থাকে। কিন্তু উচ্চারণকালে বাতাস এক দমকে মুক্ত না হয়ে মুখগহ্বরে ঘৃষ্ট হয়ে ছাড়া পায়। বায়ুতে এই ঘর্ষণের ফলে চ ছ জ ঝ ধ্বনি হসন্ত অবস্থায় স্পৃষ্ট স্বভাব পেলেও, মোচনের ঐ পদ্ধতির দরুন ঘৃষ্ট নাম পেয়েছে। চ ছ জ ঝ ধ্বনিকটির উচ্চারণরীতিতে দুই ধর্মের ফলে আলোচ্য অবরোধক এবং অনবরোধক বা অনর্গলধর্মী ব্যঞ্জনগুলির মধ্যবর্তী পর্যায়ে এগুলিকে স্থান দেওয়া যায়।

বর্ণমালার ক চ ট ত প বর্গের পঞ্চম ধ্বনিগুলি নাসিক্য ব্যঞ্জন। উচ্চারক-গুলিকে স্বস্থানে বদ্ধ রেখেও, এবং স্বরধ্বনি বাহন ছাড়াই নাসিকা পথে বায়ু নির্গত করে এই ব্যঞ্জনগুলি ধ্বনিত করা যায় বলে, পুরাতন ব্যাকরণ মতে এদের stops বা স্পর্শবর্ণ বা স্পৃষ্টধ্বনির শ্রেণীতে না রেখে, আমরা অনর্গল শ্রেণীতেই সাজাব। ঞ আর ণ-কে ধ্বনিতাত্ত্বিকরা ন-য়ের প্রকারভেদ মাত্র বলেছেন। কারণ, চ-বর্গের সঙ্গে যুক্তরূপে ঞ-র ন-উচ্চাবণ পাওয়া যায়। যেমন– চঞ্চু, উঞ্ছ, গঞ্জনা, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি শব্দে। এ ধরনেব শব্দে ঞ-র উচ্চারণকে তালব্য বা প্রশস্ত দন্ত-মূলীয় ন বলতে চান তাঁরা। ঞ-র ন-ধ্বনির মতো ব্যবহার দেখে এ নামকরণ এক দিক থেকে অসংগত হয় না। কিন্তু, ঞ-র অন্য উচ্চারণও পাওয়া যায়। 'যাচ্ঞা' শব্দের এক উচ্চারণ 'যাচ্না' অপর উচ্চারণ 'যাচ্য়াঁ'। 'জ্ঞান'—'গ্যাঁন' বা 'গ্য়াঁন', 'প্রজ্ঞা' উচ্চারণ 'প্রগ্গাঁ', আবার 'প্রোগ্য়াঁ'ও শোনা যায়। 'ডেঞে' —'ডেয়েঁ'। 'ভুঁইঞা— 'ভুঁইয়াঁ'। কাজেই— ব্যঞ্জনের উচ্চারণ শুধু 'ন' নয় 'ইঅ' বা 'য়ঁ', এমন-কি সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির অনুনাসিকত্ব বা চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণেও দাঁড়ায়। ঞ-র বর্ণরূপের আলোচনা আমাদের জন্যে অপ্রয়োজনীয়, কেবল উচ্চারণের বাস্তব রূপ সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে প্রসঙ্গের বিস্তার।

মূর্ধন্য ণ-য়ের ক্ষেত্রেও বর্ণবিষয়ক আলোচনা পরিহার করে আমরা কেবল হিসেব করব যে, মূর্ধন্য ট ঠ ড ঢ এবং ষ-তে যুক্ত হলে মূর্ধন্য ণ-য়ের উচ্চারণ শোনা যায়। যেমন— কণ্টক, কুণ্ঠা, কণ্ঠাবা, উষ্ণ শব্দে। দন্ত্য ন নামে পরিচিত ধ্বনিটিকে ধ্বনি-বিজ্ঞানীরা এখন প্রকৃত উচ্চারণস্থান অনুসারে দন্তমূলীয় নাম দিয়েছেন। স্বতন্ত্র ন

দন্তমূল থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু এর একটি দন্ত্যরূপও আমরা পাই ত থ দ ধ-এর পূর্বে এবং স-এর পরে যুক্তরূপে। যেমন— কান্ত, পান্থ, দ্বন্দ্ব, বন্ধ, স্নান উচ্চারণে। তাহলে ন-ধ্বনির চার রকমের উচ্চারণ-স্থান রয়েছে বাংলায়— দন্তমূলীয়, প্রশস্ত দন্তমূলীয়, মূর্ধন্য, আর দন্ত্য। কবিতা আবৃত্তির শিল্পে এই-সব ধ্বনির বৈশিষ্ট্য অবশ্য লক্ষযোগ্য। মনে রাখতে হবে, অনবরোধক ন-ধ্বনি যুক্ত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট অপর ব্যঞ্জনের ধর্ম বরণ করে।

ধ্বনিবিজ্ঞানে নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংখ্যা কমিয়ে তিনটিতে নামানো হয়েছে— ঙ ন ম। ফার্গুসন-মুনীরের *The Phonemes of Bengali* প্রবন্ধে বাংলা phoneme-এর তালিকায় ঙ ন ম এই তিন নাসিক্য ব্যঞ্জনেরই মহাপ্রাণ রূপ '(+h)' নির্দেশ করা হয়েছে।[১৮৯] এর ভিতরে ঙ-ধ্বনির মহাপ্রাণতার সন্ধান পাওয়া কঠিন। বাংলা উচ্চারণে অনুস্বার ঙ-র হসন্ত রূপ বলে স্বীকৃত। সংহতি, সিংহাসন, সংহরণ, সংহিতা ইত্যাদি শব্দের সযত্ন উচ্চারণে প্রলম্বিত (continuant) অনুস্বারের শেষে হ-য়ের উচ্চারণ ঙ-ধ্বনির শেষাংশে কিঞ্চিৎ প্রাণ সঞ্চার করছে কি? এই মহাপ্রাণতা বিষয়ে আমাদের কান তত সজাগ না হলেও মান উচ্চারণে আবৃত্তি শিল্পে ঙ-র মহাপ্রাণ রূপ থাকা অসম্ভব নাও হতে পারে।

অন্য দুটি নাসিক্য ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণ হ্ন / হ্ণ আর হ্ম রূপ আমরা জানি। বর্ণনামে হ-য়ে ন-য়ে আর হ-য়ে ম-য়ে যুক্ত বলে অভিহিত হলেও বাংলা উচ্চারণে ন-য়ের এবং ম-য়ের পরে পরেই হ অবিচ্ছেদে বা 'নিশ্বাসের এক প্রচাপনে'[১৯০] নির্গত হচ্ছে। কাজেই ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকায় অপর সব মহাপ্রাণধ্বনির মতো এই মহাপ্রাণধ্বনি কটিকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করছি।

উচ্চারণপদ্ধতি বিচারে ক চ ট ত প -য়ের অল্পপ্রাণ অঘোষতা, খ ছ ঠ থ ফ -য়ের মহাপ্রাণ অঘোষতা, গ জ ড দ ব -য়ের অল্পপ্রাণ ঘোষতা, ঘ ঝ ঢ ধ ভ -য়ের মহাপ্রাণ ঘোষতা, ঙ ন ম -য়ের অল্পপ্রাণ ঘোষতা, এবং ঙহ, হ্ন, হ্ম -র মহাপ্রাণ ঘোষতাব কথা আমরা জানি। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ক-বর্গ জিহ্বামূলীয়[১৯১], চ-বর্গ অগ্রতালব্য বা প্রশস্ত দন্তমূলীয়[১৯২], ট-বর্গ মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয়, ত-বর্গের ত থ দ ধ দন্ত্য আর ন দন্তমূলীয়, আর প-বর্গ ঔষ্ঠ্য নাম পেয়েছে।

বর্গীয় ধ্বনিগুলির পরে আসে অন্তঃস্থ বর্ণের ধ্বনিপ্রসঙ্গ। অন্তঃস্থ ব-য়ের কথা অর্ধস্বর আলোচনাতে একবার হয়েছে, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি হিসেবেও এ ধ্বনি সম্পর্কে কিছু কথা বলবার আছে। বাস্তবিক অন্তঃস্থ ব-য়ের ব্যঞ্জন সত্তার পুনর্বিচার

আবশ্যক। দন্ত্যৌষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব-য়ের উচ্চারণ তৎসম শব্দ থেকে বিদায় নেয় নি বাস্তবিক। সে কথা পরে বলছি। তাছাড়া কিছু বিদেশী শব্দ আশ্রয় করে বাংলায় এই ধ্বনির ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। ওয়াকিবহাল, বেওয়ারিস, ওয়েটিংরুম, টিউবওয়েল বানানে যেখানে 'ওঅ' অর্থে 'ওয়' ব্যবহার, সেখানে দন্ত্যৌষ্ঠ্য ব-য়ের উচ্চারণ রয়েছে। বাঙালির মুখে 'ও' আর 'য়' -কে আলাদা করে উচ্চারণ করবার প্রবণতাও দুর্লভ নয়, তবে মূল ভাষার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তির মান উচ্চারণে অন্তঃস্থ ব ধ্বনিত হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিশ্রেণীতে দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনিটির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।

হাই সাহেব অর্ধস্বর বা 'স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য শিসধ্বনি'[১৯৩] বলতে যে অন্তঃস্থ ব-কে বুঝিয়েছেন, আমরা তা থেকে ভিন্ন করে স্বল্পপ্রাণ ঘোষ দন্ত্যৌষ্ঠ্য শিসধ্বনি বা উষ্মব্যঞ্জন হিসেবে এটিকে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকায় রাখতে চাই। এই ধ্বনির উচ্চারণে বাস্তবিক উপরের দাঁত ও নিচের ঠোঁটে স্পর্শ ঘটে। তাছাডা, আলোচিত ধ্বনিটির একটি মহাপ্রাণ রূপও আছে বাংলায়। গহ্বর, বিহ্বল, আহ্বান জিহ্বা, বহ্বারম্ভ— এই-সব তৎসম শব্দের 'হ্ব' উচ্চারণে আমরা মহাপ্রাণ ঘোষ দন্ত্যৌষ্ঠ্য শিসধ্বনির অস্তিত্ব লক্ষ করি। আব, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি উচ্চারণ করতে গেলে দেখা যাবে— যুক্তধ্বনি উচ্চারণের মতো 'হ্ব' বর্ণের প্রথমাংশে হসন্ত অন্তঃস্থ ব উচ্চারণ হবার পর দ্বিতীয়াংশের মোচন হয় মহাপ্রাণ রূপে। কাজেই এইখানেই আমরা তৎসম শব্দে অন্তঃস্থ ব ও তার মহাপ্রাণ রূপ উষ্ম ভ-এর উচ্চারণ পাচ্ছি।

কম্পনজাত ঘোষ অল্পপ্রাণ র-ধ্বনির উচ্চারণস্থান দন্তমূল। র-কে তরল বা দুর্বল ধ্বনিও বলা হয়। এই দুর্বলতার বশেই হয়তো যুক্ত বর্ণে এই ধ্বনি চ ছ জ ঝ -য়ের আগে প্রশস্ত দন্তমূলীয়, ট-য়ের আগে মূর্ধন্য, ত থ দ ধ -য়ের আগে দন্ত্য এবং শ-য়ের আগে পশ্চাৎ দন্তমূলীয় রূপ স্বীকার করে। চর্চা, মূর্ছনা, বর্জন, নির্ঝর, আর্ট. মর্ত্য, স্বার্থ, মর্দন, বর্ধন, কর্ষণ ইত্যাদি শব্দে দৃষ্টান্ত পাই। র-য়ের মহাপ্রাণ ব্যবহার হৃদয়, হৃষ্ট, হ্রদ, হ্রস্ব, হ্রী, হ্রেষা ইত্যাদি শব্দে।

ঘোষ পার্শ্বিক ল-ধ্বনিরও দ্বিতীয় নাম তরলধ্বনি। আর, এই ধ্বনিও দন্তমূলীয়, আর অল্পপ্রাণ। মূর্ধন্য বা দন্ত্যধ্বনির পূর্বে বিন্যস্ত হলে র-এর মতো এই ধ্বনিও ভিন্ন উচ্চারণস্থান জাত সংশ্লিষ্ট ধ্বনির ধর্ম নেয়। যেমন উল্টোপাল্টা, শ্লেষ, শ্লথ শব্দে। ল-য়ের মহাপ্রাণ রূপ পাই— আহ্লাদ, কহ্লার, প্রহ্লাদ প্রভৃতিতে।

শ (sh) আর স (s) উচ্চারণে মুখবিবরের বায়ুপথকে সংকীর্ণ করা হয় বলে

এ দুটি শিসধ্বনি নাম পেয়েছে, অন্যনাম উষ্মধ্বনি। হস্‌যুক্ত অবস্থাতেও এ দুই ধ্বনির নির্গমনে বাধা নেই। শ(sh)-এর উচ্চারণস্থান পশ্চাৎ দন্তমূল[১৯৪], স(s)-এর দন্তমূল।[১৯৪] তালব্য শ বা দন্ত্য স নামে এই দুই ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণস্থান বোঝানো হয় না বলে ঐ নামে ধ্বনি দুটিকে ডাকা ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত নয়। মুহম্মদ আবদুল হাই কৃত্রিম তালুর সাহায্যে পরীক্ষা করে ধ্বনি দুটির যথার্থ উচ্চাবণ স্থান নির্ণয় করেছেন। দুটি ধ্বনিই অঘোষ এবং অল্পপ্রাণ।

পশ্চাৎ দন্তমূলীয় শ প্রশস্ত দন্তমূলীয় চ ছ জ ঝ বা মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির সঙ্গে যুক্ত হলে প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা মূর্ধন্য ধর্ম গ্রহণ করে। যেমন আশ্চর্য দুশ্চর, বা কষ্ট ওষ্ঠ উচ্চারণে। প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনিগুলির মধ্যে ন র ল শ -য়ের ভিতরে পার্শ্ববর্তী যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রভাব স্বীকার করবার এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

হ উচ্চারণে মুখের ভিতবে জিহ্বাকে সামান্য প্রসৃত করে কণ্ঠনালী থেকে ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়, বায়ুপথ রুদ্ধ করা হয় না। তাই হ-কে কণ্ঠনালীয় ধ্বনি বলা হয়েছে। স্বরযন্ত্রে রণিত হয় বলে হ ঘোষ। বাতাস বা প্রাণের প্রাবল্য আছে বলে হ মহাপ্রাণ ধ্বনিও বটে। কণ্ঠনালীতে বাতাস পিষ্ট হয়ে উচ্চারণ ঘটে বলে এই ধ্বনিকেও উষ্ম বা শিসজাত বলা হয়।

দন্ত্যৌষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব, হ্ব, শ, স, হ -র মতো আরো কয়েকটি উষ্মধ্বনি বাংলা মান উচ্চারণে রয়েছে। 'মেজদি', 'লুচি ভাজতে', বা 'আগডুম বাগডুম' ছড়ার 'বাজতে বাজতে চলল ঢুলি'র জ উচ্চারণ বর্গীয় জ-এর মতো নয়। বর্গীয় জ-য়ের প্রারম্ভের স্পৃষ্টতা এতে নেই, এ ধ্বনি প্রথমাবধি উষ্ম এবং অনবরোধক। রবীন্দ্রনাথ ১২৯২ সালের আশ্বিনে লেখা 'বাংলা উচ্চারণ'[১৯৫] প্রবন্ধে 'লুচি ভাজতে' দৃষ্টান্তে জ-এর এই 'ইংরেজি *z*-এর মতো' উচ্চারণের কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ পরিশীলিত উচ্চারণেই এই *z*-ধর্মাক্রান্ত জ স্বীকৃত। সুনীতিকুমার ত বা দ -য়ের আগে বিন্যস্ত জ-এ এই উষ্মতা লক্ষ করেছেন।[১৯৬]

আমাদের ভাষাব উচ্চারণে কি কি ধ্বনি আছে, তার হিসেব নিতে গিয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিকদের বর্ণিত মূলধ্বনি(Phoneme)-র কিছু সহধ্বনিকে আমরা স্বতন্ত্র মূল্যে বিচার করেছি। মূলধ্বনির সঙ্গে ধ্বনিগতভাবে যথেষ্ট পৃথক হয়ে গেলেই শুধু সে ধ্বনিকে স্বতন্ত্র মূল্যে বিবেচনা করছি। মান উচ্চারণে, অন্তত আবৃত্তির ক্ষেত্রে, লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তনগ্রস্ত ধ্বনির চরিত্র আলোচনা আমাদের সন্দর্ভের জন্যে

জরুরি। কেননা, উচ্চারণপদ্ধতির পার্থক্যে স্পৃষ্টতা বা উষ্মতার কারণে ধ্বনিচরিত্র ও তার তাৎপর্যে প্রভূত বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়।

বাংলায় গৃহীত অনেক বিদেশী শব্দের মূলানুগ উচ্চারণে উষ্ম জ-য়ের ব্যবহার বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যেমন অভিধানে[১৯৭] বিন্যস্ত শব্দ— এগজামিন, একজিবিশন। উর্দু বা হিন্দি ভাষাভিজ্ঞ বাঙালির উচ্চারণে আরবী ফারসী শব্দের মূল উচ্চারণের উষ্মতা অনুসৃত হয়। এ বিষয়ে বর্তমান বাংলাদেশে যতটা মূলানুসরণের প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গে তত নয়। নজরুল, জিন্দাবাদ, আজান, নামাজ, ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণে দুই বাংলায় দুই রকম জ শুনতে পাওয়া যায়। মূলানুসরণে উচ্চারিত দন্তমূলীয় উষ্ম অল্পপ্রাণ ঘোষ জ-কে মান উচ্চারণের ধ্বনি হিসেবে স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়।

দন্তমূলীয় উষ্ম অল্পপ্রাণ ঘোষ জ-য়ের একটি মহাপ্রাণ জাতীয় রূপ আছে 'বুঝদার', 'বুঝতে' উচ্চারণে। উষ্ম জ না হয়ে কখনো কখনো এটি শিসধ্বনিতেও পরিণত হয়। সুনীতিকুমার তাঁর *Bengali Phonetics* পুস্তিকায় এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১৯৮] হসন্ত উচ্চারণে মহাপ্রাণতা হ্রাস পায়, আমরা জানি। সুনীতিকুমার z-এর নিচে ফুটকি দিয়ে (ẓ) বা *s* বর্ণের সাহায্যে ধ্বনিটির উচ্চারণ নির্দেশ করেছেন।[১৯৮]

বিদেশী শব্দের পথ ধরে আরো একটি উষ্মধ্বনি বাংলা উচ্চারণে এসেছে, এটি ফ-র উষ্মরূপ। উচ্চারণে উপর-পাটির দাঁতের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটছে। 'সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধানে' গৃহীত কটি শব্দ উল্লেখ করছি— ফোটোগ্রাফ, ফোন, ফ্যাশান, ফ্রক, ফ্রি, ফ্রেম, ফ্লানেল, ফ্ল্যাট। উর্দু বা হিন্দি ভাষার সাথে বিশেষ পরিচিত বাঙালির উচ্চারণে আরবী ফারসী শব্দের উচ্চারণে ফ-ধ্বনির উষ্মতা শোনা যায়। যেমন— জাফরান, তোফা, ফারুক, ফিরোজ ইত্যাদি শব্দে। নজরুলের কবিতায়— 'দিল্ চাহে সদা দিল-আফরোজ' ('আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়')। ঔষ্ঠ্য ফ-য়ের মতো এই দন্ত্যৌষ্ঠ্য ফ-ও অঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি। বিদেশী শব্দের উচ্চারণে এই উষ্মতা ছাড়াও বাংলা মান উচ্চারণে ফ আর প -এর ঔষ্ঠ্য উষ্মধ্বনি আছে বলে ধ্বনিতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন। ফুল, ভুল উচ্চারণেও ওষ্ঠ ও অধরের মাঝখানে ফাটলাকার সংকীর্ণ নির্গম পথ[১৯৯] তৈরি হয়ে এই উষ্মতা সৃষ্টি হয়। যেমন কবিতায় গানেও পাই— 'জোর নাচো ভাই! হর্দম দাও লাফ' (নজরুল), 'বিফলে প্রভাত বহে যায় যে' (রবীন্দ্রনাথ)।

উষ্মধ্বনিগুলির পরে দুটি তাড়নজাত দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনির কথা বলতে হয়। 'উপর-পাটি দাঁতের গোড়ায় (teeth-ridge) জিভের ডগার উল্টোপিঠের স্বল্পস্থায়ী সংস্পর্শের[২০০] পরেই নীচের পাটির দাঁতের উপর জিভ আছড়ে পড়লে এই ধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব হয়। এই ধ্বানর অল্পপ্রাণ রূপ ড়, মহাপ্রাণ রূপ ঢ়। দুটিই ঘোষ ধ্বনি।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনুস্বারকে বাংলা উচ্চারণে হসন্ত ঙ-র বিকল্প মনে করবার বাধা নেই। কিন্তু বিসর্গকে হ-য়ের হসন্ত রূপ বললে কি যথার্থ হবে? বিস্ময়সূচক শব্দের শেষে ব্যবহৃত বিসর্গ প্রায় হসন্ত হ-য়ের মতোই শোনায় বলে আঃ / আহ্, বাঃ / বাহ্, ওঃ / ওহ্ ইত্যাদি লিখবার চল হয়েছে। কিন্তু আবদুল হাই যখন বিসর্গকে হ-এর অঘোষ রূপ বলেন, তখন সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক— তাহলে বিসর্গ কি ঘোষ মহাপ্রাণ হ-ধ্বনির হসন্ত রূপ বাস্তবিক? মহাপ্রাণ ধ্বনি হসন্তযুক্ত হলে তার মহাপ্রাণতা অনেক কমে যায়— সে আমরা জানি।[২০১] কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে বিসর্গকে বলা হচ্ছে অঘোষ। আমরা লক্ষ করছি, বিসর্গ উচ্চারণে হ-এর পূর্ণ রূপ প্রকাশ পাচ্ছে না। হাই সাহেবের ভাষায়— 'ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের গতি মনে হয় গলনালীতে যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে— প্রাণবায়ুর অন্তহীন মহাপ্রাণ চাপ অবাধে হাহাশ্বাস তুলে যেন আর নির্গত হচ্ছে না।'[২০২] অর্থাৎ বিসর্গ উচ্চারণে হ-য়ের খণ্ড রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। খণ্ডিত হবার ফলে মূলধ্বনির সঙ্গে এতটাই পার্থক্য ঘটছে যে— ধ্বনিটি ঘোষতায়ও সম্পন্ন হতে পারছে না। হাই সাহেব তাঁর 'ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের স্থান'[২০৩] সারণিতে হ আর বিসর্গকে স্বতন্ত্রভাবে বিন্যাস করে দেখিয়েছেন। তাছাড়া বিসর্গকে 'আশ্রয়-স্থানভাগী অঘোষ শিসধ্বনি'[২০৪] বলে বর্ণনা করেছেন। বাস্তবিক, 'বাহবা' বা 'শাহানশাহ্' শব্দে হসন্ত হ-তে যে ঘোষতা ধর্ম লক্ষ করা যায়, আশ্রয়স্থানভাগী বিসর্গের উচ্চারণে তা নেই। বিসর্গ বা অতি সংক্ষিপ্ত হসন্ত হ ঘোষতা, এমন-কি প্রাণশক্তিও প্রভূত পরিমাণে হারিয়ে খণ্ড হ (ঽ) হয়ে পড়ে। খণ্ড উচ্চারণে যা আঃ, বাঃ— পূর্ণ উচ্চারণে তা আহ্, বাহ্। প্রথম দল অঘোষ, দ্বিতীয় দল ঘোষ।

শব্দমধ্যবর্তী অবস্থানে, বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটালেও, সুচারু আবৃত্তির পরিশীলিত উচ্চারণে সেইসঙ্গে হালকাভাবে ঽ তথা বিসর্গধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' শিষ্ট উচ্চারণে 'যাদোপ্‌পতি' নয়, 'যাদোঽ্‌পতি'। মান আবৃত্তিতে শব্দশেষের বিসর্গ যুক্ত 'রোধঃ' উচ্চারণেও খণ্ড

হ্‌ শোনা যাবে। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)'-এর ১৩১২ সালের পঞ্চম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীনাথ সেন বিসর্গ সম্পর্কে লিখেছেন— 'ইহার উচ্চারণ হ-কারের ন্যায় নহে ইহা কেবল অন্য স্বরবর্ণের শক্তিবৃদ্ধিকারক চিহ্নবিশেষমাত্র।'[২০৫] হাই সাহেবও এ ধ্বনিকে আশ্রয়স্থানভাগী বলেছেন। দুইয়ে মিলে এই মত যুক্তি-সহ মনে হয়। তাছাড়া রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও বলেছেন— 'উহা স্বরও নহে, ব্যঞ্জনও নহে ; উহা স্বরবর্ণের বিকৃতি সাধন করে মাত্র।'[২০৬] শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য লিখেছেন— 'হ-কারের অঘোষরূপ বিসর্গ (ঃ)। সম্মুখে আয়না রেখে তাতে মুখের তাপ দিতে গেলে যে ধ্বনি, তাই বিসর্গ ধ্বনি। তাতে স্বরতন্ত্রীর কম্পন হয় না।'[২০৭] এই আলোচনার ভিত্তিতে বিসর্গকে খণ্ড হ্‌ বা আশ্রয়স্থানভাগী কণ্ঠনালীয় অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম খণ্ড ধ্বনি বলা যায়।

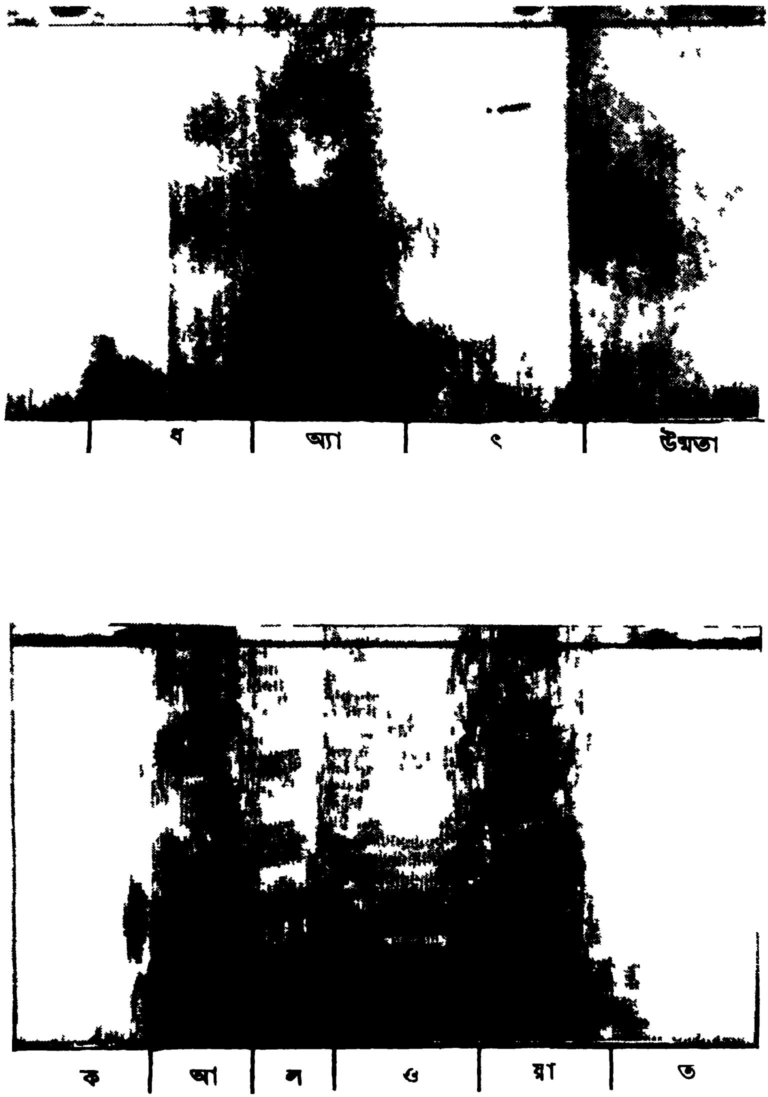
বাংলায় এরকম আরো দুটি খণ্ড ধ্বনি আছে। তার একটি খণ্ড ত নামেই চিহ্নিত। এই ধ্বনি, খণ্ডত্বের ফলে উচ্চারণশেষে ঈষৎ উষ্মতা ছড়ায় বলে কানে ধরা পড়ে। 'ধ্যাৎ' আর 'কালোয়াত' শব্দের স্পেকটোগ্রাফ চিত্রেও এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়। তাছাড়া ত উচ্চারণে জিহ্বা উপরের দাঁতে যেমনভাবে সংস্পৃষ্ট হয়, খণ্ড ৎ-য়ে তেমন না হয়ে দন্তমূলের দিকে সরে আসে। উচ্চারণ শেষের ঈষৎ উষ্মতা হসন্ত থ-য়ের মতো মহাপ্রাণতার আভাস দেয়। হসন্ত ত-য়ের উচ্চারণের সাথে এর ভেদ আছে। হসন্ত ত-য়ের সুস্থির ভাবের জায়গায় খণ্ড ৎ-য়ের উচ্চারণে আকস্মিক সংবরণ বা খণ্ডনের চকিত ভাব জাগে। সারাৎসার, উৎপাত, মাৎসর্য, সৎকাজ, বৎস, মহৎ উচ্চারণের খণ্ড ৎ-য়ের সঙ্গে মহত্ত্ব, আঘাত, আত্মসাৎ, স্যাঁতসেঁতে, ঘাঁতঘোঁত উচ্চারণের হসন্ত ত-উচ্চারণ তুলনীয়। খণ্ড ৎ-কে স্পৃষ্ট অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য খণ্ড ধ্বনি বলা যায়। খণ্ড ৎ-য়ের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে এই ধ্বনিতে মহাপ্রাণতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব।

হসন্ত র আর রেফ চিহ্নের উচ্চারণে পার্থক্য আছে কি-না, এও ভেবে দেখবার বিষয়। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ লিখেছেন— 'র অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে বসিলে রেফ্‌ বলে ; পরে বসিলে র-ফলা '্র' বলে।'[২০৮] কিন্তু উচ্চারণের বেলায় হসন্ত র আর রেফে ভেদ দেখি। তাছাড়া, র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে অন্যান্য ব্যঞ্জনের মতো প্রথম ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। আর রেফের উচ্চারণে র-ধ্বনির আকস্মিক খণ্ডন বা সংবরণ ঘটে। যেমন— সম্পর্ক, মূর্খ, স্বর্গ, অর্ঘ, চর্চা, মূর্ছা, বর্জন, নির্ঝর, অর্ণব, আর্ত, ব্যর্থ, দুর্দৈব, ধনুর্ধর, অর্পণ, সর্ব, নির্ভর, মর্ম, বর্ষ, অর্হণা ইত্যাদি শব্দে। কবিতা আবৃত্তির

উচ্চারণে এ শব্দগুলিকে সম্‌পর্‌কো, মুর্‌খো, শর্‌গো, অর্‌ঘো, চর্‌কা, মুর্‌ছা, বর্‌জোন, নির্‌ঝর্‌, অর্‌নোব্‌, আর্‌তো, ব্যার্‌থো, দুর্‌দৈবো, ধোনুর্‌ধর্‌, অর্‌পোন্‌, সর্‌বো, নির্‌ভর্‌, মর্‌মো, বর্‌শো, অর্‌হোনা বললে উচ্চারণদোষ ঘটবে। বস্তুত, রেফ উচ্চারণে জিভের ডগা দ্রুত সংবৃত হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জন উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে এই-সব শব্দের পরিশীলিত উচ্চারণে র-এর খণ্ডন এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব তথা অবরোধকালের দৈর্ঘ্য[২০৯] ঘটে। এই জন্যে রেফকে র-এর খণ্ড রূপ বলা অযৌক্তিক মনে হয় না।

কবিতা বিশ্লেষণ করবার সময় ধ্বনির হিসেব করতে খণ্ড ৎ খণ্ড হ্‌ -কে এদের পূর্ণ ধ্বনি থেকে ভিন্ন বলে গণ্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কবিতায় খণ্ড ৎ উষ্মতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কার্যকর হবে। খণ্ড হ্‌-র ক্ষেত্রেও হ্‌-এর চেয়ে এই ধ্বনির হীনপ্রাণ অঘোষতা আমাদেরকে হিসেবে রাখতে হবে। রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্বও বাক্‌ধ্বনির হিসেবের ক্ষেত্রে মনে রাখবার বিষয়। রেফযুক্ত বর্ণে— জিহ্বা পরের ব্যঞ্জনের উচ্চারণস্থানে সংবদ্ধ হয়ে র-ধ্বনির স্বভাবচাঞ্চল্য প্রতিহত করে র-ধ্বনির স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এইজন্যেই 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন— দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জন' গানটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ রেফের ভূমিকায় পৌরুষ লক্ষ করেছিলেন।[২১০] খেয়াল করতে হবে, 'গর্জন' 'দুর্দিন' 'তর্জন' পদগুলিতে রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনগুলি স্পৃষ্ট। স্পৃষ্টধ্বনির সম্যক অবরোধ অব্যবহিত স্বরান্ত মোচনকে দৃপ্ত করে। কিন্তু রেফের পরে নাসিক্য বা উষ্মব্যঞ্জন থাকলে, এই-সব ধ্বনির প্রলম্বিত স্বভাবের দরুন সে-সব ক্ষেত্রে রেফের ব্যবহার নিশ্ছিদ্র অবরোধান্তে বলিষ্ঠ মোচনের দৃষ্টান্ত হতে পারে না।

বাংলা উচ্চারণে, ঋ-কার নামে র-য়েরই আরেকটি চেহারা পাওয়া যায়। সাধারণ বাঙালির মুখে এই ধ্বনি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনের সঙ্গে র-ফলায় ই-কার সহযোগে অর্থাৎ ঋ-কার সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটিয়েই উচ্চারিত হয়। কিন্তু মান উচ্চারণ এবং আবৃত্তিতে অনেক ক্ষেত্রেই ঋ-র সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় রাখবার চলন আছে। ফলে সেরকম উচ্চারণে সংলগ্ন ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটে না। 'আবৃত্তি' উচ্চারণ হবে 'আবৃত্‌তি', 'আব্‌বৃত্তি' নয় বা র-ফলা যুক্ত 'আত্রিত্তি' নয়। 'অমৃত'— 'অম্‌মৃত' বা 'অম্রিত' নয়। অর্থাৎ এমন ক্ষেত্রে ঋ-কারযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সিদ্ধ বলে স্বীকৃত হচ্ছে না। তবে, কবিতার ধ্বনি হিসেব করবার কালে ঋ-কারকে সচরাচর র্‌+ই ধ্বনি রূপেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আবার কিছু ঋ-কার যুক্ত শব্দের



'ধ্যাৎ' ও 'কালোয়াত' শব্দের স্পেক্টোগ্রাফ-চিত্র

উচ্চারণে ব্যতিক্রম ঘটে না, এমন নয়। 'অপসৃত' উচ্চারণ হয় 'অপোস্‌সৃত', 'মসৃণ' — 'মোসৃস্‌ন', 'অনুসৃত'— 'ওনুস্‌সৃত', 'অনাদৃত'— 'অনাদ্‌দৃত'। 'অনুগ্রহ', 'নিগ্রহ' শব্দের পদান্তর হিসেবে 'অনুগৃহীত', 'নিগৃহীত' উচ্চারণেও ব্যতিক্রম দেখি, 'ওনুগ্‌-গৃহিতো', 'নিগ্‌গৃহিতো'। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ঋ-কারযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটেছে। কবিতা বিশ্লেষণের সময় এই ধরনের কোনো ব্যতিক্রমের মুখোমুখি হলে আমরা অকুস্থলেই মীমাংসা খুঁজবো।

বাংলা ভাষায় ক্ষ, য-ফলা, ম-ফলা, ব-ফলার উচ্চারণ সর্বত্র এক রকমের নয়। সে-বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ না করে কবিতা আলোচনাকালে উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রয়োজনীয় বিচার-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

'অনবরোধক ধ্বনিচরিত্র' বিষয়টিতে প্রবেশ করবার আগে আবার বলে নেওয়া ভালো, বাক্‌ধ্বনি যদিও অন্য স্বর বা ব্যঞ্জনের সঙ্গে বিন্যাসের ফলে বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জনা পেতে পারে, তবু সকল রকম বিন্যাসের পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব বলে আমরা এখানে কেবল স্বতন্ত্রভাবে ব্যঞ্জনগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রকাশিত বাঙালি সংস্কারের পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

অ ন ব রো ধ ক ধ্ব নি চ রি ত্র

এইবার আমরা ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যঞ্জনা, আর সে-বিষয়ে বাংলা ভাষাসাহিত্যের আলোচনায় বিধৃত মতামতের প্রসঙ্গ শুরু করছি। আলোচনা শুরু হবে অন্তঃস্থ বর্ণমালার শেষ বর্ণ থেকে।

ক ণ্ঠ না লী য় উ ষ্ম ঘো ষ ম হা প্রা ণ ধ্ব নি

প্রথম আলোচ্য— উষ্মধ্বনি হ। হ-কে অনেকেই মহাপ্রাণতার প্রতীক বলে গণ্য করেছেন। 'মহাপ্রাণ বর্ণের বেগবত্তা, স্থূলতা, সমস্তই হ-কারাদি শব্দে বিদ্যমান।' — রামেন্দ্রসুন্দর।[২১১] মুহম্মদ আবদুল হাইও এই ধ্বনির 'অপ্রমেয় প্রাণশক্তি'-র কথা উল্লেখ করে এর ব্যঞ্জনার বিবরণে বলেছেন— এ-ধ্বনি 'হাহাশ্বাসময়'।[২১২] বিসর্গধ্বনির আলোচনা করতে গিয়ে হাই লিখেছেন— 'প্রাণবায়ুর অন্তহীন মহাপ্রাণ চাপ অবাধে হাহাশ্বাস তুলে যেন আর নির্গত হচ্ছে না। ফলে 'হ'-এর যে স্বাভাবিক গুরুগম্ভীর অনুরণন তাও ধ্বনিত হচ্ছে না।...তাদের ব্যঞ্জনা গাঢ় হয় না।'[২১৩]

'হৈ হৈ করিয়া বেড়ানো আস্ফালন-সহিত ভ্রমণ ; উহার রূপভেদ হৈ চৈ। আকস্মিক হেঁচকা টানে কোনো জিনিসকে হেঁচড়িয়া লইয়া যাওয়া হোঁতকা স্বভাবের কাজ ; এই কাজে হ-কারের মহাপ্রাণতার পরিচয় পাই।' —রামেন্দ্রসুন্দর।[২১৪] 'প্রাণ-বায়ুর প্রবল চাপজনিত এর অবাধ মুক্তগতি ধ্বনিটিতে একটি উদার উদাত্ত অনুরণনের সঞ্চার করে।'— মুহম্মদ আবদুল হাই।[২১৫]

উচ্চারণরীতিতে উষ্ম কণ্ঠনালীয় বা আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় ধ্বনি ব'লে হ-ধ্বনিতে রণিত হুতাশের বিস্তার অনুভব করা যায়। উপরে উদ্‌ধৃত মন্তব্যগুলি থেকে প্রাপ্ত হ-য়ের ব্যঞ্জনাবিষয়ক পদ আর বাক্যাংশ কটি পাশাপাশি সাজানো যাক— বেগবত্তা, বলবত্তা, স্থূলতা, অপ্রমেয় প্রাণশক্তি, হাহাশ্বাসময়তা, অবাধ হাহাশ্বাস, গুরুগম্ভীর অনুরণন, গাঢ় ব্যঞ্জনা, আস্ফালন-সহিত ভ্রমণ, আকস্মিক টানে হেঁচড়ানোর উপযুক্ত হোঁতকা স্বভাব, মুক্তগতি, উদার উদাত্ত অনুরণন।

প শ্চা ৎ দ ন্ত মূ লী য় ও দ ন্ত মূ লী য় অ ঘো ষ অ ল্প প্রা ণ উ ষ্ম ধ্ব নি

রামেন্দ্রসুন্দর উষ্মবর্ণ উচ্চারণের প্রকার বর্ণনা করে এই ধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন— 'উষ্মবর্ণ বিশেষত বায়ুর চলাচল স্মরণ করাইয়া দেয়। বায়ুর সহিত উহার সম্পর্ক অতি নিকট। কণ্ঠনিঃসৃত বায়ু জিহ্বার পাশ কাটাইয়া, জিহ্বা ঘেঁষিয়া বাহির হইলে উষ্মবর্ণের উচ্চারণ হয় ; উষ্মবর্ণে কণ্ঠাগত বায়ুর গতি তেমন করিয়া কোথাও একেবারে রুদ্ধ হয় না। অন্য দ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন বাতাসের শব্দই সাঁ সাঁ, সোঁ সোঁ, সন সন, সাঁই সাঁই···।'[২১৬] বায়ুর এই অনিরুদ্ধ চলাচলের জন্য এই ধ্বনির সঙ্গে তরলতার যোগ কল্পনা করে 'শ' ধ্বনি সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর লিখছেন— 'কপালের ঘাম টস টস বা টুসটুস করিয়া টুসিয়া পড়ে— এ স্থলে উষ্মবর্ণ 'স'-য়ের যোগে তারল্যের ভাব আরো ফুটিয়া উঠিয়াছে।···শিরার ভিতরে তরল রক্ত বেগে বহিলে উহা টিশ টিশ করিয়া টিশেয় ও কঠিন যাতনা দেয়। এখানে···উষ্মবর্ণ শ তারল্যসূচক।'[২১৭]

আগের সব দৃষ্টান্তই শ (sh) ধ্বনির। এবার শ (sh) ও স (s) ধ্বনির মিলিত উষ্মতায় সৃষ্ট ব্যঞ্জনা বিষয়ে একটি উদ্‌ধৃতি— 'শিস্‌ধ্বনির আনুপ্রাসিক ব্যবহারকে একেবারেই নির্ব্যঞ্জক মনে হয় না, দিবস শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন পশ্চিম সাগর নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়— পরম্পর এগারোটি শব্দের মধ্যে এই নয়টিতেই যখন চলে আসে 'শ-ষ-স' -এর প্রয়োগ, তখন যেন এক প্রচ্ছন্ন চাপে লাইনটি আপনি গড়িয়ে চলে সংশয়-

ভারাতুরতার দিকে'।[২১৮] রবীন্দ্রনাথের 'দিবসের শেষ সূর্য / শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে, / নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়— / কে তুমি, / পেল না উত্তর।' প্রসঙ্গে ঐ উক্তি।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার 'আস্তে সূর্যাবর্তে সরে' চরণটির বিশ্লেষণে স (s) ধ্বনির ব্যঞ্জনা বিষয়ে সমালোচকের বক্তব্য— ''আস্তে' শব্দটির মধ্যে প্রত্যাসন্ন অবসানের মুমূর্ষু প্রশ্বাস ধ্বনিরূপে স্পন্দিত হচ্ছে।'[২১৯]

সব মিলিয়ে পশ্চাৎদন্তমূলীয় শ এবং দন্তমূলীয় স -এর ব্যঞ্জনা সম্পর্কে পাওয়া শব্দ বা বাক্যাংশ— তারল্যের ভাবযুক্ত, তারল্যসূচক, সাঁ সাঁ সোঁ সোঁ ইত্যাদি বাতাসের শব্দরূপ, প্রচ্ছন্ন চাপে সংশয়ভারাতুরতার দিকে গড়িয়ে চলার ভাব, প্রত্যাসন্ন অবসানের মুমূর্ষু প্রশ্বাসের ধ্বনিরূপী স্পন্দন।

আমরা এই নিবন্ধে বাংলা ভাষণে প্রচলিত আরো কয়েকটি উষ্মধ্বনির কথা বলেছি। কবিতা বিশ্লেষণ-সূত্রে সেই সব ধ্বনির মুখোমুখি হলে আমরা উষ্মধ্বনি প্রসঙ্গে ব্যক্ত সাধারণ মতগুলির সঙ্গে এই-সব ধ্বনির ব্যঞ্জনাগত মিল হিসেব করব। বাংলায় এই কটি ধ্বনির ব্যঞ্জনাসংক্রান্ত পৃথক আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে নি।

দ ন্ত মূ লী য় পা র্শ্বি ক ঘো ষ ধ্ব নি

অন্তঃস্থ ধ্বনির মধ্যে এবারে আসে ল-এর কথা। 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনি-তত্ত্ব' গ্রন্থের মন্তব্য— 'ধ্বনিটি যে পার্শ্বোত্থিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘোষতা ও স্বল্পপ্রাণতার মতো তারল্যও বোধহয় এর একটি গুণগত দিক'।[২২০] রামেন্দ্রসুন্দর পুরাতন প্রচলিত ধ্বনিনাম ব্যবহার করে আলোচনা করেছেন— 'দন্ত্য-ল'য়ে কোমল ও চঞ্চল ভাব আনে।…লক্‌লক্‌, লিক্‌লিক্‌ লিক্‌লিকে প্রভৃতি শব্দ তরল চাঞ্চল্যের পরিচয় দেয়। সংস্কৃতে যাহাকে লোল জিহ্বা বলে উহা লেলিহান হইয়া লক্‌লক্‌ করে, তখন উহাতে লালা…নিঃসৃত হয়।…লচপচ তারল্যের ব্যঞ্জক; লোচ্চা অতি তরলপ্রকৃতির মানুষ…। 'লটপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা' এই বাক্যে মহাদেবের জটাজুটের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে।…লিটপিটে লোকে কাজের শেষ করিতে পারে না; এই কাজে তরল পদার্থের মতো আপনাকে জড়াইয়া কাল গৌণ করে বা লিটির পিটির করে।…ল-কারাদি শব্দে তারল্য, চাঞ্চল্য ও দৌর্বল্যের ভাব মিশ্রিত হইয়া আছে।…বাঙ্গালায় যেখানে ল'য়ের বাহুল্য সেইখানেও যেন আলু-লায়িত কুন্তল অর্থাৎ এলোচুলের মত লটপট হইয়া এলিয়া পড়ার ভাব আসে।'[২২১]

'টলটল, টুলটুল, টলমল করিয়া যাহা টলিয়া বেড়ায়, তাহার তারল্য ও চাঞ্চল্য ট'য়ের পর কোমল দন্ত্যবর্ণ ল'য়ের যোগে আসে।'[২২২] এ ছাড়া বিভিন্ন বর্ণের আলোচনা-সূত্রেও রামেন্দ্রসুন্দর ল-য়ের সাহায্যে 'চাঞ্চল্য' 'তারল্য' এবং 'কোমল' ভাবের উদ্ভাসের কথা বলেছেন।

অমিয় চক্রবর্তীর— 'তার বদলে পেলে—/ সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর / আলোয় ভরা জল - / ফুলে নোয়ানো ছায়া ডালটা / বেগনি মেঘের ওড়া পালটা / ভরলো হৃদয়তল— / একলা বুকে সবই মেলে।' প্রসঙ্গে ল-য়ের ব্যবহার বিষয়ে হেমোপম দস্তিদার লিখেছেন— 'টলোমলো স্নিগ্ধতার আমেজ সৃষ্টিতে এই তরল ধ্বনিটির পৌনঃপুনিক ব্যবহার সার্থক।'[২২৩] নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'স্বর্গের পুতুল' কবিতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের উক্তি— ' ল'-র অনু-প্রাসে 'স্বর্গের প্রলম্বিত আলোর সলিলে মুখ প্রক্ষালন' আমাদের কাছে এত লাবণ্যময় বলে মনে হয়।'[২২৪]

রবীন্দ্রনাথের 'আজি কি তোমার মধুর মুরতি' কবিতার আলোচনা সূত্রে নবেন্দু বসু লিখেছেন, ঐ কবিতার 'প্রভাতে'র বিকল্প হিসেবে 'সকালে' কিছুতেই চলবেনা, কারণ ' "সকালে" কথায় যে "ল" আছে তার অলস মন্থর গতিতে লুটিয়ে চলা অভ্যাস'।[২২৫] সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' কবিতার প্রথম চারটি চরণের বিশ্লেষণে নবেন্দু বসু ল আর র দুই তরল ধ্বনির বিন্যাসে সৃষ্ট ব্যঞ্জনার উল্লেখ করেছেন— 'বেশি পরিমাণে "র" আর "ল" প্রয়োগে ঝর্ণার উৎসমুখে যে লঘু মর্মর আর খলখল শব্দ হতে থাকে তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়'।[২২৬]

উচ্চারণের ধরন থেকে পাওয়া তারল্যের সঙ্গে ল-ধ্বনিতে আরো ধরা আছে— কোমলতা, চঞ্চলতা, তরল প্রকৃতি, তরল পদার্থের ভাব, দৌর্বল্য, আলুলায়িত ভাব, টলোমলো স্নিগ্ধতার আমেজ, লাবণ্যময়তা, অলস মন্থর গতিতে লুটিয়ে চলার ভাব, লঘু খলখল শব্দের প্রতিধ্বনি। ল-ধ্বনির মহাপ্রাণরূপের বৈশিষ্ট্যের কথা সাধারণ-ভাবে মহাপ্রাণ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে। ল-য়ের ভাবের সঙ্গে যুক্ত হবে মহাপ্রাণতার বৈশিষ্ট্য।

দন্তমূলীয় কম্পনজাত ঘোষধ্বনি

ল-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শেষ মন্তব্যটির সঙ্গে র-য়ের ভূমিকার কথা রয়েছে। কারণ র-ধ্বনিকেও 'তরল' নামে বিশেষিত করেছেন অনেকে। ' 'র' হরফ-চিহ্নিত ধ্বনিটিও

অনেকের কাছে তরল ধ্বনি (liquid, weak) নামে পরিচিত। জিভের ডগা কিংবা ডগাসংলগ্ন পাতা গোড়ায় লাগতে-না-লাগতেই যেমন 'ল' ধ্বনির উচ্চারণ পাওয়া যায় তার জন্যে উচ্চারক দুটোর মাংসপেশীর সবল সঞ্চালনের কোনো প্রয়োজন হয় না, 'র' উচ্চারণেও অনেকটা সেরকম হয়।'[২২৭] কিন্তু আবদুল হাই সাহেব আবার ল-য়ের সঙ্গে র-য়ের মিলকে 'আপাতসাদৃশ্য' বলেছেন, কারণ উচ্চারণের প্রকার ভেদে এ দুয়ের ধ্বনিগত এবং রূপগত পার্থক্য ঘটে। তবু, র-ধ্বনিতে মাধুর্য আছে— হাই সাহেব এ কথা বলেছেন। 'বাংলায় একে তো জিভের ডগার কাঁপুনিতে এ ধ্বনির সৃষ্টি তার ওপরে আছে এর সৃজনকালে স্বরতন্ত্রীর কাঁপুনি। এ দুই কাঁপুনিতে মিলে ধ্বনিটিতে একটি মধুর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়।'[২২৮] র-য়ের অল্পপ্রাণ আর মহাপ্রাণ রূপ নিয়ে হাই সাহেব নিম্নোদ্ধৃত উক্তি করেছেন— 'স্বল্পপ্রাণ 'র' এর ধ্বনিমাধুর্য স্বভাবতই মনকে আকৃষ্ট করে··· যথার্থ মহাপ্রাণ উচ্চারণে প্রাণবায়ুর অতিরিক্ত ধাক্কায় মন যে কম আলোড়িত হয় তা নয়। কবিতায়, গানে এর মহা-প্রাণজাত প্রকম্পন হৃদয়ে এক অভাবিতপূর্ব সঞ্চরণশীল ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করে।'[২২৯] ল-এর প্রসঙ্গে উদ্ধৃত নবেন্দু বসুর বিবরণে উল্লেখ পেয়েছি— 'ঝর্ণা' কবিতার প্রথম চার চরণে বিন্যস্ত 'র' 'লঘু মর্মর' ধ্বনিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'আজি কি তোমার মধুর মুরতি' কবিতায় 'শারদ প্রভাতে' পদই যে কবিতার ভাবের জন্যে উপযুক্ত— সে কথা বলতে নবেন্দু বসু লিখেছেন— ' "প্রভাতে"র "র" আর "ত" এর গতি স্বভাবত একটু ক্ষিপ্র। তাই কবিতায় যে সহসা অভিজ্ঞতার ভাব রয়েছে সেই অতর্কিত ভাব একটু ক্ষিপ্র উচ্চারণযুক্ত কথার দ্রুততর গতিতেই যেন ভালো ফোটে।'[২৩০] ক্ষিপ্রগতির উল্লেখে, র-ধ্বনির ভিতরে উচ্চারণবৈশিষ্ট্যজাত স্ফূর্তির ভাব সম্পর্কে আমরা সচেতন হচ্ছি। এ-ধ্বনি যে ক্রীড়াশীলতায় উৎসাহ যোগায় তার ইঙ্গিতও হাই সাহেবের গ্রন্থে পাই— 'দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগা চালনা করে র্-র্-র্-র্-র্ রকমের ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করে এধ্বনিটিকে ধরে রাখতে কোন্ শিশু না অভিলাষী হয় তাই ভাবি। ভালো করে কবিতা আবৃত্তি করতে পারলে 'র' ধ্বনির কাঁপুনিগত প্রলম্বিত (continuant) রূপ পাঠক ও শ্রোতার জিভ ও মনকে এ জন্যে সহজে আবিষ্ট করে।'[২৩১]

র-ধ্বনি সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি লিখেছেন— 'র মূর্ধন্য বর্ণ, অতএব উহা কঠোরতা ও কর্কশতা সূচনা করে।'[২৩২] আমরা আলোচনা করেছি— মূর্ধন্য ধ্বনির পূর্বে যুক্ত হলে র মূর্ধন্য ধর্ম অর্জন করে, কিন্তু র-য়ের উচ্চারণ

স্থান দন্তমূল। সাধারণভাবে এই ধ্বনিতে মূর্ধন্য বর্ণের কার্কশ্য কল্পনা করা সংগত মনে করা যায় না। প্রবন্ধের শেষে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি স্বীকারোক্তিতে র-ধ্বনি বিষয়ে তাঁর ভ্রান্তির কারণ ধরা পড়ে।— 'অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণ প্রদেশভেদে ভিন্ন; আমি উত্তর-রাঢ়ের অধিবাসী; আমার বানানে, বিশেষত র' ও ড়' এই দুই বর্ণের প্রয়োগে, উত্তর রাঢ়ের বিশিষ্ট উচ্চারণ— রেঢ়ো উচ্চারণ হয়তো বহু স্থলে আসিয়া পড়িয়াছে'।[২৩৩] ধ্বনির বিচার তার উচ্চারণের উপরেই নির্ভরশীল। রামেন্দ্রসুন্দরের উচ্চারণে র আর ড় -এর ভেদ স্পষ্ট না হওয়ার দরুন দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ড়-ধ্বনির ধর্ম র-য়ে আরোপিত হওয়া খুবই সম্ভব। তাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত পরিহার করে আমরা এখানে র-ধ্বনি সম্পর্কে অন্য মন্তব্যগুলির সার সংকলন করব— তরল, weak, মধুর, লঘু মর্মরবিশিষ্ট, ক্ষিপ্র / দ্রুত গতি, সহসা অভিজ্ঞতার অতর্কিত ভাব, স্ফূর্তিময় ক্রীড়াশীল ভাব, প্রলম্বিত রূপের আবেশ। এখানে উল্লেখ করি, মৃদু কম্পনে জাত র-ধ্বনিকে ফার্গুসন ও মুনীর 'discontinuous' বলেছেন। মুখবিবরের বাতাস অবিচ্ছেদে মুক্ত না হয়ে, কম্পিত জিহ্বাগ্রের বারংবার উচ্চারণ-স্থান স্পর্শ করবার ফাঁকে ফাঁকে ছাড়া পায় বলেই এ ধ্বনিটিকে 'discontinuous' বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, স্বরধ্বনির সহায়তা ছাড়াও র্-র্-র্-র্ ধ্বনি উচ্চারণ সম্ভব। হাই সম্ভবত এই কারণেই র-কে প্রলম্বিত ধ্বনি বলেছেন।

রেফের ব্যবহারে পৌরুষ ধ্বনিত হবার কথা আমরা আগে বলেছি। দুর্বল র-ধ্বনি যুক্তরূপে সহচর বর্ণটির আশ্রয়ে উচ্চারিত হবার সময় বিস্ময়কর দৃঢ়তার ভাব জাগ্রত করতে পারে। রেফের ব্যবহারে যেমন দেখেছি, তেমন র-ফলার ব্যাপারেও বলিষ্ঠতা তথা দৃঢ়তা দেখতে পাব— বজ্র, বপ্রক্রীড়া, ব্যাঘ্র, আক্রমণ, বিক্রম, দংষ্ট্রারেখা ইত্যাদি শব্দে। এ সব ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের উচ্চারণদ্বিত্বের বলেই অবরুদ্ধ র নিজেকে সবলে মুক্ত করে। আর ঋ-কারের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনে সকল ক্ষেত্রে উচ্চারণদ্বিত্ব থাকে না বলেই ঐ বলের প্রকাশ ঘটে না। সংস্কৃত মতে ঋ-কারকে ব্যঞ্জন ধরা হয় না বলে, বাংলা মান উচ্চারণে অনেকাংশে ঐ সংস্কৃত অনুসারিতা রয়ে গেছে।

অল্পপ্রাণ র-য়ের আলোচনায় এর মহাপ্রাণ রূপের বৈশিষ্ট্যের কথাও হয়েছে— প্রাণবায়ুর অতিরিক্ত ধাক্কায় মনে আলোড়ন এবং অভাবিতপূর্ব সঞ্চরণশীল ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয় মহাপ্রাণ র-উচ্চারণে। সাধারণভাবে মহাপ্রাণ ধ্বনির সকল বৈশিষ্ট্য হ্র/হৃ ধ্বনির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাবে। মহাপ্রাণ ধ্বনির বৈশিষ্ট্যের কথা পরে আসছে।

দন্তমূলীয় মূর্ধন্য তাড়নজাত ঘোষধ্বনি

অন্তঃস্থ ধ্বনি কটির পর, হাই সাহেব-বর্ণিত 'অর্ধবর্গীয় ধ্বনি'[২৩৫] ড় ঢ়-য়ের চরিত্র আলোচনা করব। র-ধ্বনির কথা বলতে গিয়ে আমরা হাই সাহেবের মন্তব্য থেকে ঐ ধ্বনির ক্রীড়াশীলতার ইঙ্গিত পেয়েছি। ড় ঢ় -য়ের ক্ষেত্রে সেই গুণের কথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন। 'বোয়াল মাছ তার ফিঁচে চালনা করে যেমন জলকেলি করে, এ ধ্বনি দুটো উচ্চাবণের প্রক্রিয়াটিও তেমনি মানুষের মুখবিবরে একটা ক্রীড়াশীলতার উদ্রেক করে। শিশু বয়সে জিভের ডগার উল্টোপিঠ অনবরত চালনা করে ড়-ড়-ড়-ড়-ড় ভাবের ধ্বনি করতে কে না তৎপর হয়েছে। ধ্বনিতাত্ত্বিকের কান ও মন নিয়ে এ ধ্বনিটির পরীক্ষা করতে গেলে এখনও এ ধ্বনিটির নড়নক্ষম রূপে বিস্মিত না হয়ে পারি না।'[২৩৬]

বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন— 'আমরা ড় দ্বারা তীব্রতাব্যঞ্জক শব্দ বুঝাই ; যথা— ঝড়, তোড়্ (বেগ অর্থে), দৌড়···, মেঢ়, ভেড়···, ইত্যাদি। "শব্দ" বুঝাইতে হইলে আমরা মূর্ধা হইতে উচ্চারিত বর্ণ দ্বারাই বেশি বুঝাইয়া থাকি।'[২৩৭] রামেন্দ্রসুন্দরের বর্ণনা— 'কাপড় ছেঁড়ার শব্দ পড় পড়—উহা কর্কশ শব্দ ; এখানে ড় কার্কশ্যবোধক'।[২৩৮]

ড়-য়ের উচ্চারণে নড়নক্ষমতার ফলে যে ক্রীড়াশীলতা রয়েছে, ঢ় উচ্চারণে মহাপ্রাণতার যোগে তার সঙ্গে অন্য ধর্মও যুক্ত হবে। সাধারণভাবে মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রসঙ্গে সে গুণের কথা আমরা জেনে নেব। এ ধ্বনির স্বতন্ত্র আলোচনা খুব কম। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ড়-ধ্বনি উপলক্ষে ব্যক্ত 'তীব্রতাব্যঞ্জক শব্দে'র দলে হঠাৎ ঢ়-যুক্ত 'মেঢ়' শব্দ স্থান পেয়েছে। ঢ়-ও তীব্রতাব্যঞ্জক ধ্বনি বটে। ড় ঢ় ধ্বনিতে মূর্ধন্য উচ্চারণের কারণে রামেন্দ্রসুন্দর বর্ণিত কর্কশতা বা কঠোরতার ভাব থাকা সম্ভব। ফার্গুসন-মুনীরের বিবরণে[২৩৯] ড়-ধ্বনিটি discontinuous। আর জানি না কেন, ঢ়-ধ্বনির বিবরণ লিখতে তাঁরা বিরত থেকেছেন।

তাহলে, ড় ঢ় ধ্বনিতে ক্রীড়াশীলতা, নড়নক্ষমতা, তীব্রতা বা বেগ বা জোরালো শব্দের ব্যঞ্জনা জাগে, জানা গেল।

নাসিক্য ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি

এখন, বর্গীয় ব্যঞ্জনের আলোচনার শুরুতে আমরা অন্তঃস্থ বর্ণের সঙ্গে অনবরুদ্ধতাজনিত সাধারণ ধর্মসম্বলিত নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলির চরিত্র পর্যালোচনা করব। এই

ধ্বনি বিষয়ে হাই সাহেবের মন্তব্য— 'নাসিক্য ধ্বনিগুলিতে স্পর্শধ্বনির বৈশিষ্ট্য যতটুকু আছে, ব্যতিক্রম আছে তার চেয়ে অনেক বেশি। এবং এ ব্যতিক্রমের জোরেই নাসিক্যধ্বনি যত না স্পর্শধ্বনি তার চেয়ে অনেক পরিমাণে প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি।'[২৪০] 'এদের উচ্চারক দুটোকে বদ্ধ রেখেই নাসাপথে বাতাস বের করে দেওয়া যায় বলেই এরা সব কটিই প্রলম্বিত ধ্বনি।'[২৪১]

ঙ-ধ্বনির আলোচনা বড়ো একটা পাওয়া যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর 'ঢং' শব্দ বিশ্লেষণ করে বলেছেন –' 'ঢ'টুকু কর্কশ, কিন্তু 'অং'টুকু বেশ মধুর।'[২৪২] এই অনুরণিত ধ্বনিটি সম্পর্কে হাই সাহেবের একটি উক্তি এই— 'ফুসফুস-চালিত বাতাস···আবদ্ধ অবস্থায় না থেকে নাসাপথে মুক্ত হয়ে গিয়ে যে-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে সেটিই হচ্ছে ঘোষ বা নিনাদিত পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ঙ'। রঙ্, ঢঙ্,সঙ্, প্রভৃতি শব্দে এ ধ্বনিটির নির্মল ব্যঞ্জনা এবং যথার্থ পরিচয় আমরা পাই।'[২৪৩] 'নির্মল ব্যঞ্জনা' উল্লেখ কোনো স্পষ্ট ভাব নির্দেশ করে না। রামেন্দ্রসুন্দর ধ্বনিটির মাধুর্যগুণের ক্ষমতা নির্দেশ করেছেন।

ন-ধ্বনির প্রলম্বিত স্বভাব বর্ণনা করে, হাই সাহেব বলেছেন অন্যসব নাসিক্য ব্যঞ্জনের মতো এই ধ্বনির ব্যঞ্জনাও 'নূপুরগুঞ্জনময়' এবং 'মধুর'।[২৪৪] অমিয় চক্রবর্তীর 'বিনিময়' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে ন-য়ের প্রভাব বর্ণনায় সমালোচক বলেছেন— 'এই ধ্বনির অনুষঙ্গে একটি রিক্তভাব ও বিয়োগের সুর প্রধান হয়ে ওঠে, যা কবিতাটির দ্বিতীয় অংশের মুখ্য সুর।'[২৪৫]

তার বদলে পেলে—
শাদা ভাবনা কিছুই-না-এর
খোলা রাস্তা ধূলো-পায়ের
কান্না-হারা হাওয়া—
চেনাকণ্ঠে ডাকলো দূরে
সব হারানো এই দুপুরে
ফিরে কেউ-না চাওয়া।
এও কি রেখে গেলে ॥

দ্বিতীয় স্তবকে ন-ধ্বনির প্রাধান্য প্রসঙ্গে হিসেব দিয়েছেন— সমগ্র কবিতায় এ ধ্বনি ১২ বার, আর দ্বিতীয় স্তবকেই আছে ৭ বার (আমাদের হিসেবে হয় ৮ বার)।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'না-বেচা না-কেনা পণ্য, স্বর্গের তটিনী / সারাদিন

জলে' পদের পর্যালোচনা — ''ন'-অক্ষরটির ধ্বনি সমস্ত পঙ্‌ক্তিটির ব্যঞ্জনাকেন্দ্র বলে পঙ্‌ক্তিটি স্বভাবতই শ্রুতিসুখকর।'[২৪৬] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—' .. 'সেই ধ্বনিতে / চল্‌রে ঘাটে কলসখানি / ভরে নিতে।'— এই চরণের 'ন'-ধ্বনি ঐ তরুণীর কঙ্কণ-কলসের মৃদু সংঘর্ষের ধ্বনিরূপ ভাবতে বাধা কী?'[২৪৭] আলোচ্য ব্যঞ্জনের অনুরূপ প্রতিধ্বনির কথা রামেন্দ্রসুন্দরও লিখেছেন—'রিনিঝিনি, রুনুঝুনু প্রভৃতির অনুনাসিক ধ্বনি ধাতুময় অলংকার শিঞ্জিত মনে আনে।'[২৪৮] এবং ঘণ্টা, ঘুণ্টি 'দুই শব্দের মধ্যস্থ ন-কার ধাতুময় যন্ত্রের ধ্বনি স্মরণ করাইতেছে'।[২৪৯] রামেন্দ্রসুন্দর ন-ধ্বনির আরো কিছু ব্যঞ্জনা নির্দেশ করেছেন— 'টনটনানি যে যাতনা বুঝায়, উহা তীক্ষ্ণ যাতনা; অনুনাসিক ন-কার এই তীক্ষ্ণতা আনে।'[২৫০] 'ত-বর্গের ধ্বনি কোমলতাব্যঞ্জক; তাহার উপর অনুনাসিকত্ব যোগ হইলে উহা আরও কোমলের, এমন-কি, একবারে কাঠিন্যবর্জিতের লক্ষণ টানিয়া আনে।...যাহা কাঠিন্যবর্জিত, মেরুদণ্ডহীন, তাহা নরম।'[২৫১]

ন-সম্পর্কে মন্তব্যগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। নূপুরগুঞ্জনময়, মধুর, রিক্ততা ও বিয়োগের সুরময়, শ্রুতিসুখকর, কঙ্কণ-কলসের মৃদু সংঘর্ষের ধ্বনিরূপ, অলংকার-শিঞ্জিত বা যন্ত্রধ্বনির প্রতিধ্বনিসূচক, তীক্ষ্ণতাব্যঞ্জক, কোমল, কাঠিন্যবর্জিত, মেরুদণ্ডহীন, নরম। মহাপ্রাণ ধ্বনির ক্ষেত্রে সেই প্রাণের বল স্বভাবতই এই-সব ভাবের সঙ্গে যুক্ত হবে। মহাপ্রাণ ন-য়ের ব্যঞ্জনার আলোচনা আমরা পাই নি।

অল্পপ্রাণ নাসিক্য ব্যঞ্জন ময়ের বিচারে রামেন্দ্রসুন্দর—'ম'য়ের অনুনাসিকত্বই প্রবল হইয়া প-বর্গের বিশিষ্ট ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অনুনাসিক বর্ণের বিশেষ লক্ষণ মৃদুতা সম্পাদন; উহা কঠোরকে মৃদু করে, কঠিনকে মোলায়েম করে।'[২৫২] 'ভেড়ার ভ্যা ভ্যা শব্দ কর্কশ; ছাগলের ম্যা ম্যা শব্দ তাহা অপেক্ষা ক্ষীণ মৃদু ও মোলাম'।[২৫৩] 'মৃদু স্বভাব মানুষের বিশেষণ ম্যাদা'।[২৫৪] হাই সাহেব ম-ধ্বনির দ্যোতনা বিষয়ে লিখছেন— 'মুক্ত নাসাপথ দিয়ে ফুসফুস-চালিত বাতাস বের হতে গিয়ে মুখের ভিতরে যে গভীর মনোহর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে বাংলার 'ম' নামক হরফটিতে আমরা সেই ধ্বনিটি পাই। 'ম' ধ্বনি গঠনে মুখবিবর সবচেয়ে প্রশস্ত হয়, ফলে সম্পূর্ণ মুখবিবর জুড়ে তার অনুরণন ধ্বনিত হয় বলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যে 'ম'-এর মতো এমন স্নিগ্ধ গম্ভীর ও প্রাণময় ধ্বনি আর পাওয়া যায় না।'[২৫৫] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ' 'সুধাশ্যামলিম' পদটি দুটি 'ম'-র সাহায্যে কোমলতাসঞ্চারী।'[২৫৬]

মোট কথায়— ম মৃদুতা ও কোমলতাসাধক, ক্ষীণতা-ব্যঞ্জক, মোলায়েম, গভীর মনোহর, স্নিগ্ধ গম্ভীর প্রাণময়, সুর-ঝংকৃত, মধুর, কোমলতাসঞ্চারী।

মহাপ্রাণ ম্হ-তে ম-য়ের গুণের সঙ্গে থাকবে তার মহাপ্রাণতার অতিরিক্ত গুণ। মুহম্মদ আবদুল হাই এই ধ্বনির বিবরণে লিখেছেন— ' 'ম্হ' ধ্বনির প্রথমাংশ প্রলম্বিত হয়ে শ্রোতার কানে দ্বিত্ববোধক আভাস এনে দেয়, আর শেষাংশ নিশ্বাসের একই প্রয়াসে সজোরে নির্গত মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।'[২৫৭]

অ ব রো ধ ক ধ্ব নি চ রি ত্র

অনবরোধক বা continuant ধ্বনিগুলির ব্যঞ্জনার আলোচনা যত পাওয়া গেল, স্বতন্ত্র অবরোধক ধ্বনিগুলির ব্যঞ্জনার কথা সে তুলনায় অল্পই পাওয়া যাবে। আমাদের উপস্থিত নিবন্ধে নির্দিষ্ট অবরোধক ব্যঞ্জনগুলি হসন্ত অবস্থায় ধ্বনিবিকাশ করতে পারে না বলে, এ-সব ধ্বনির স্বাধীন ব্যঞ্জনাক্ষমতা সীমিত। পক্ষান্তরে, অনবরোধক ব্যঞ্জনগুলি হসন্ত অবস্থাতেও ধ্বনিত হয়ে ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে সক্ষম। মনে হয় এই জন্যেই ফার্গুসন-মুনির ঙ ন ম ল র ড় ধ্বনি কটিকে একই সঙ্গে 'vocalic' এবং 'consonantal' বলে নির্দেশ করেছেন।[২৫৮] ল আর শ ধ্বনিমূল (pho neme`-কে তাঁরা 'continuant' বলে চিনিয়ে দিয়েছেন।[২৫৯] ধ্বনিবিজ্ঞানীরা স (s)-কে শ-এর সহধ্বনি বলেন বলে, এই ধ্বনিটিকেও তাঁরা প্রলম্বিত পর্যায়ে ধরছেন, বলতে পারি।

আমাদের বর্ণিত অনবরোধক পর্যায়ের ব্যঞ্জনগুলির ভিতর থেকে দুই ধরনের ব্যঞ্জনকে ফার্গুসন-মুনীর 'discontinuous' বলেছেন। কম্পনজাত ধ্বনি এবং তাড়নজাত ধ্বনি। আবার হাই কম্পনজাত ধ্বনিকে প্রলম্বিত স্বভাবের বলেছেন, আমরা দেখেছি। আর, তাড়নজাত ধ্বনিকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'অর্ধবর্গীয় ধ্বনি' বলে।[২৬১] এই ধ্বনিকে বাস্তবিক অবরোধক-অনবরোধক ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যবর্তী সীমান্তে রাখা চলে। ড-য়ে শূন্য ড় আর ঢ-য়ে শূন্য ঢ়— তাড়নজাত এই ধ্বনি-দুটিকে প্রলম্বিত না করা গেলেও, জিহ্বার তাড়নে হসন্ত অবস্থায় উচ্চারণ করা সম্ভব। যেমন— তড়কা, ষাঁড়, আষাঢ় শব্দে। হাই তাড়নজাত মহাপ্রাণধ্বনিটির কথা বাদ দিয়ে শুধু অল্পপ্রাণ ড়-ধ্বনিটির বিষয়ে লিখেছেন— 'হলন্ত উচ্চারণ পেলেও নড়নক্ষম প্রত্যঙ্গের দ্বারা উচ্চারিত হওয়ার জন্যে এর উচ্চারণ অসম্পূর্ণ থাকতে পারে

না ; এ পরিবেশের প্রলম্বিত (continuant sound) ধ্বনিগুলোর মতো পূর্ণ-ভাবেই উচ্চারিত হয়ে যায়।'[২৬১]

যাই হোক অনবরোধক ধ্বনিগুলি, স্বাধীন সচলতার দরুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অবরোধক ধ্বনিগুলির চেয়ে অধিক গুরুত্ব পায়। আমরা আগে উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাংলাভাষা যেন অ আ ই উ স্বরবর্ণ কয়টাকে লইয়া স্বরের মতো ব্যবহার করিয়াছে।'[২৬২] অনবরোধক ধ্বনিগুলিকেও খানিকটা স্বরের মতো ব্যবহার করবার সুযোগ রয়েছে। স্বরধ্বনি এবং অনবরোধক ধ্বনির সহযোগিতায় অবরোধক ধ্বনিও নানা ভাবের উচ্ছ্বাসে অংশ নেয়। কপকপ, কপাকপ, ঠকঠক, ঠুকঠুক, ঠকাঠক ধ্বনিতে অবরোধক ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণে ও ব্যঞ্জনাপ্রকাশে স্বর-ধ্বনির ভূমিকা স্বীকার না করে উপায় নেই। তা হলেও, অবরোধক ব্যঞ্জনেরও স্বকীয় গুণ নিহিত রয়েছে তাদের উচ্চারণস্থানগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণতা ও ঘোষতার হেরফেরে।

অবরোধক ধ্বনির চরিত্র প্রসঙ্গে যাবার আগে চরিত্র নির্দেশেরই সুবিধার্থে অল্পপ্রাণ / মহাপ্রাণ আর অঘোষ / ঘোষ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে কিছু ধারণা করে নেওয়া দরকার।

অল্পপ্রাণ বা স্বল্পপ্রাণ / মহাপ্রাণ

হাই সাহেবের উক্তি— 'বাতাসের চাপের স্বল্পতাকে 'স্বল্পপ্রাণ' এবং আধিক্যকে 'মহাপ্রাণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির উচ্চারণের সময় ফুসফুস চালিত বাতাসের বেগ হয় বেশি, ফলে উচ্চারক দু'টির উচ্চারণের স্থান থেকে আলগা হওয়ার সময় ফট্‌কার মতো আওয়াজটিও হয় দ্বিগুণ জোরে। সহজ কথায় মহাপ্রাণ ধ্বনি, উচ্চারণের সময় এক ঝলক কিংবা এক হল্‌কা বাতাস দ্রুত বেরিয়ে যায়।'[২৬৩]

রামেন্দ্রসুন্দর অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে 'ক্ষণস্থায়িতা, আকস্মিকতা, তীব্রতা'[২৬৪] আর মহাপ্রাণধ্বনিতে 'বেগবত্তা, বলবত্তা, স্থূলতা'[২৬৫]-র লক্ষণ দেখেছেন। আরো বলেছেন— 'অল্পপ্রাণ ধ্বনির চেয়ে মহাপ্রাণ ধ্বনি জোরালো',[২৬৬] আর 'দ্রুততা ও আকস্মিকতা অল্পপ্রাণ বর্ণমাত্রেরই প্রধান লক্ষণ'।[২৬৭] সুতরাং, 'ড মহাপ্রাণ হইয়া ঢ হয়। ড'য়ের সমুদায় লক্ষণ বর্ধিতবিক্রমে ঢ'য়ে বর্তমান।'[২৬৮]

উল্লিখিত মতে বিচার করলে, বাংলা অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলি অর্থাৎ ক চ ট ত প

গ জ ড দ ব শ স ঙ ন ম ল র ড় র জ় ধ্বনিগুলিতে ক্ষণস্থায়িতা আকস্মিকতা তীব্রতা দ্রুততা এবং মহাপ্রাণ ধ্বনির তুলনায় জোর আর বিক্রমের স্বল্পতা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে মহাপ্রাণ অর্থাৎ খ ছ ঠ থ ফ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ঙহ হ্ন হ্ম হ্ব হ্ল হ্র / হ্ন ঢ় ফ় ঝ় ইত্যাদি ধ্বনিতে বেগবত্তা বলবত্তা স্থূলতা জোর আর অল্পপ্রাণ ধ্বনির তুলনায় বর্ধিত বিক্রমের গুণ ধরা পড়ে।

অল্পপ্রাণ ধ্বনির বিন্যাসঘটিত বৈশিষ্ট্যের কথা রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। ' অল্পপ্রাণ প-বর্ণ ক'য়ের পর বসিয়া উহার দ্রুতগতিকে দ্রুততর করিয়া তোলে।'[২৬৯] ' অল্পপ্রাণ ট-বর্ণযোগে স' আকস্মিকতা বা দ্রুততার ভাব আনে; যেমন সট ক'রে চলা, সটসট বা সটাসট বেত মারা।··· সপ, সপসপ, সপাসপ প্রভৃতি শব্দেও অল্পপ্রাণ প-যোগে এইরূপ অর্থ।'[২৭০]

মহাপ্রাণ ধ্বনিশেষে হ-জাতীয় ধ্বনির অস্তিত্ব সে ধ্বনির উচ্চারণে উষ্মতার প্রভাব বিস্তার করে। উষ্মধ্বনিতে বাতাসের চলাচল থাকে বলেই এ ধ্বনির ব্যবহারে 'দীর্ঘশ্বাসের ব্যঞ্জনা'র[২৭১] কথা সাহিত্য সমালোচকেরা বলেছেন। ''হৃদয়প্রান্তে হে নীরব নাথ' মহাপ্রাণ বর্ণগুলিতে ধৃত রইল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস।'[২৭২] 'অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর' প্রসঙ্গে— 'পঙ্‌ক্তির দীর্ঘস্বরগুলির সঙ্গে যোগ দিল মহাপ্রাণ বর্ণের স্থমিত প্রয়োগ — দীর্ঘশ্বাসের ব্যঞ্জনা এল।'[২৭২] এই দীর্ঘশ্বাসের ব্যঞ্জনা থেকেই সমালোচক-চিত্তে আবার জেগেছে 'ধূসরতা'র বোধ। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে', 'আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে', 'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল', আর 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' পঙ্‌ক্তি কটি প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— ''ঝ', 'ধ', 'ঢ়', 'ভ', 'ঘ' এক ধূসরতাকে ঘনিয়ে তোলে'।[২৭৩]

হসন্ত উচ্চারণে মহাপ্রাণধ্বনির প্রাণশক্তি কমে যায়-— এ-কথা ধ্বনিবিজ্ঞানীরা লিখেছেন।[২৭৪] কিন্তু কবিতার আবৃত্তিতে হসন্ত মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই মহাপ্রাণতার ব্যঞ্জনা ধরে রাখে। যেমন উপরে উদ্‌ধৃত গানের চরণগুলির 'মেঘ' আর 'আষাঢ়' উচ্চারণের ক্ষেত্রে লক্ষ করছি। ঢ় অবশ্য স্পৃষ্টধ্বনির গোত্রভুক্ত নয়, এবং হসন্ত অবস্থাতেও ধ্বনিত হবার শক্তি রাখে— আমরা দেখেছি। কিন্তু কবিতায় হসন্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির ক্ষেত্রে সকল রকম বিন্যাসেই প্রাণের হ্রাস ঘটে, এমন দেখিনা। তবে, বিশেষত হালকা চালের কবিতায় সে-রকম দৃষ্টান্তও দুষ্প্রাপ্য নয়। 'ধুলোকাদা কত মাখছিলে', 'তেমন করে হাত বাড়ালে / সুখ পাওয়া যায়

অনেকখানি', 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে / লয়ে তারিখ-সাল', 'অশোক-শাখা উঠিত ফুটে / প্রিয়ার পদাঘাতে', 'আমায় যদি মনটি দেবে / নিষেধ তাহে নাই' ইত্যাদি পদের হসন্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি পরিবেশ-পরিস্থিতিগত নানাকারণে মহাপ্রাণতা খুইয়েছে। বিন্যাসভেদে বাক্‌প্রবাহে কোথায় কি কারণে হসন্ত মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, তার বিস্তৃত আলোচনা আবদুল হাই তাঁর গ্রন্থে করেছেন।[২৭৫]

এখানে. আমরা শুধু বলতে চাই, কবিতায় সবরকম বিন্যাসে সবসময় হসন্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাণলাঘব হয় না, বিশেষত, সাধুরীতির গুরুগম্ভীর পঙ্‌ক্তিতে প্রাণের হ্রাস তত দেখা যাবে না। অন্যরকম দৃষ্টান্তের পর গুরুগম্ভীর চরণ উদ্‌ধৃত করছি। 'যেতে কি সাধ আছে', 'মর্মর তানে ভরে ওঠ গানে', 'রাখ্‌, রাখ্‌, ফেল্‌ ধনু'. 'কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে', 'হরিল কাননে / নিদাঘ কুসুমকান্তি', 'কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে', 'সেবিবে দাসীভাবে পা দুখানি— এই লোভ মনে— / এই চিরআশা, নাথ', 'বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি, 'মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে সৌরভ' ইত্যাদি ছত্রের দৃষ্টান্ত দেখে, সাধারণ নিয়ম হিসেবে মহাপ্রাণ ধ্বনির হসন্ত অবস্থায় হীনপ্রাণ দশা স্বীকার করা দুষ্কর।

কবিতায় বা সাধু প্রয়োগে হসন্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির ঐ ব্যতিক্রান্ত ব্যবহারের কথা সুনীতিকুমারও লিখেছেন। বিশেষ, তৎসম ('*ts*') অবস্থায় মহাপ্রাণ উচ্চারণ বজায় থাকার বিষয়ে তিনি বলেছেন— 'Final aspirates are deaspirated : but *ts* forms tend to preserve them.'[২৭৬]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোদ্‌ধৃত উক্তি থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনিতে সংশ্লিষ্ট স্বর উষ্মতাশ্বসিত হয়। তাঁর উদাহরণগুলির ভিতরে দুই স্বরের মধ্যবর্তী এবং কেবল স্বরান্ত দুরকম মহাপ্রাণ ধ্বনি রয়েছে। 'মেঘের', 'জমেছে', 'আঁধার', 'গহন' 'মোহন', 'অভিসার' পদে প্রথম ধরনের, আর 'ঘন', 'সন্ধ্যা', 'ঘনিয়ে', 'ঝড়ের' পদে দ্বিতীয় ধরনের বিন্যাসের পরিচয়। স্বর-মধ্যবর্তী বিন্যাসে ঘ ধ ভ ধ্বনিগুলির আচরণ বিষয়ে ফার্গুসন-মুনীর অন্যরকম বলেছেন, ২০১ নম্বর পাদটীকায় আমরা তা দেখেছি।[২৭৭] তবু অন্তত কবিতা আবৃত্তির মান উচ্চারণে মহাপ্রাণতার বিশেষ হানি আমাদের শ্রুতিতে ধরা পড়ছে না। সাধারণ কথ্য উচ্চারণের সঙ্গে আবৃত্তি শিল্পের শীলিত উচ্চারণের ভেদ হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয়। সুনীতিকুমারেও এই মতের সমর্থন পাচ্ছি— 'Inter vocalic aspirates are normally deaspirated, but it is not uncom-

mon to find aspiration in some cases. In formal discourse, and in singing, as well as in careful speech, the aspirates are retained, but they are deaspirated in quick conversation. No hard and fast rule can be laid down in this matter, but it seems that in less common words and forms, and in *tss.* where they are susceptible to the influence of the spelling, the aspiration commonly comes in.'[২৭৮]

অ ঘো ষ / ঘো ষ ধ্ব নি

অঘোষ / ঘোষধ্বনির পার্থক্যবিচারে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি— 'ঘোষবান্ ধ্বনির একটা গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব আছে। যাহা ঘোষহীন ধ্বনিতে থাকে না।'[২৭৯] অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর প্রভূত কম্পনজাত ধ্বনিতে গাম্ভীর্য ঘোষিত হয়, আর ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী সেভাবে কম্পিত না হলে অর্থাৎ অঘোষ ভাবে উচ্চারিত হলে, সেই ধ্বনির ব্যঞ্জনা অগম্ভীর বা লঘু। সুনীতিকুমার 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে' লিখেছেন— 'বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ মৃদু ও গাম্ভীর্যহীন ; কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের এবং পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ গম্ভীর।'[২৮০] সুনীতিকুমারের উল্লিখিত গ্রন্থের আলোচনা অনুসরণ করে মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব অঘোষতা / ঘোষতা বিষয়ে জানিয়েছেন— 'আগের ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে অঘোষ ধ্বনিকে শ্বাস-ধ্বনি (breath sounds, hard sounds বা tenues) এবং ঘোষ-ধ্বনিকে নাদধ্বনি, কোমলধ্বনি তথা soft sound এবং mediæ ও বলা হয়।'[২৮১] এই হিসেবে অঘোষ ক চ ট ত প খ ছ ঠ থ ফ ফ় শ স ধ্বনিগুলিকে আমরা শ্বাসধ্বনি বা hard sound মনে করতে পারি। গ জ ড দ ব ঘ ঝ ঢ ধ ভ ঙহ ন হ্ন ম হ্ম র হ্র / হ্ল ল হ্ল ড় ঢ় হ জ় ঝ় র হ্ব ধ্বনিগুলিকে নাদধ্বনি বা কোমলধ্বনি বলতে পারি। রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্বনিবিচারে ঘোষধ্বনির ভাব সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে— 'দ'য়ের ধ্বনিতে ঘোষ আছে, উহা গম্ভীর জমকাল।'[২৮২] 'ড ও ঢ ট-বর্গের অন্তর্গত ঘোষবান্ ধ্বনি ; ঘোষবান্ ধ্বনির একটা গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব আছে'।[২৮৩]

উচ্চারণে ঘোষ / অঘোষধ্বনির প্রভাব প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি পাই আবদুল হাই সাহেবের গ্রন্থে। স্বরধ্বনির আলোচনায় একবার উদ্ধৃত হলেও ঘোষ / অঘোষ ব্যঞ্জনসম্পৃক্ত বক্তব্য বলে এখানে পুনর্বার উল্লেখ করছি— 'একই

স্বরধ্বনি একাক্ষরিক শব্দে ও অঘোষধ্বনির পূর্বে হ্রস্ব কিন্তু ঘোষধ্বনির পূর্বে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ; যেমন 'আট' ও 'আজ' শব্দের 'আ' প্রথমটিতে হ্রস্ব কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।'[২৮৪] অঘোষ ধ্বনি 'hard' বলেই কি চট করে তার উচ্চারণ নিষ্পন্ন হচ্ছে, আর ঘোষধ্বনির কোমল নাদ উচ্চারণে সময় লাগছে বেশি ? হাই সাহেবের আর-একটি উক্তি দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করি··· 'অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি একরকম ব্যঞ্জনাহীনই।'[২৮৫]

এইবার আমরা অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ ঘোষ-অঘোষ ধ্বনির গুণ স্মরণ রেখে সাহিত্যিক-সমালোচক-ধ্বনিতাত্ত্বিকদের অনুসরণে বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলির ধ্বনিবিচারে প্রবৃত্ত হব। প্রথমে, ঘৃষ্ট চ-বর্গের চারটি ধ্বনি আলোচনা করে নিই। এই ধ্বনি কটিকে অনবরোধক অবরোধকের মধ্যবর্তী স্থলে সন্নিবেশিত করা যায় মনে করে প্রচলিত বর্গীয় বিন্যাসের ক্রমভঙ্গ করছি।

প্রশস্ত দন্তমূলীয় ঘৃষ্টধ্বনি

রামেন্দ্রসুন্দর চ-বর্গকে প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতে তালব্য ধ্বনি ধরে নিয়েই ধ্বনিব্যঞ্জনা বিচার করেছেন। তাঁর মতে— 'চ-বর্গের ধ্বনির লক্ষণই তারল্য।··· অল্পপ্রাণ ক্ষণস্থায়ী চ-ধ্বনি একটা ক্ষণস্থায়িত্ব ও আকস্মিকত্ব সূচনা করে।[২৮৬] 'তালব্য চ'যোগে কোমলতা বুঝায়।'[২৮৭] 'স্নেহপদার্থ তরল··· তার সঙ্গে চকচক, চিকচিক··· ইত্যাদির সম্পর্ক।'[২৮৮] শেষোক্ত এই চকচক চিকচিকের সূত্রেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের একটি মন্তব্যে চ-ধ্বনি ব্যবহারের সঙ্গে চীনামাটির পাত্রের ঝলমলানির যোগনির্দেশ দেখা যায়। 'চেনা চায়না, কতদিন চেনা / চায়ের আসরে কবে'—অমিয় চক্রবর্তীর 'বাসা-বদল' কবিতার এই চরণটি উপলক্ষ করে অলোকরঞ্জনের উপলব্ধি— ' 'চ'-এর বর্ণাবর্তে গৃহঘনিষ্ঠ চীনা মাটির আধার ঝলমল করে উঠছে স্তম্ভিত কান্নার বিদ্যুতে।'[২৮৯]

রামেন্দ্রসুন্দর চ-যুক্ত কিছু শব্দে 'ক্ষণস্থায়িতা, আকস্মিকতা ও তীব্রতা'[২৯·] সংকেত দেখিয়ে, অন্য কিছু শব্দে 'তারল্য সূচনা'[২৯০] দেখিয়েছেন। যেমন—তেল-চকচকে বা চুকচুকে, চিটচিটে, চিটাগুড়, চবচবে, চোপসা ইত্যাদি। এই বর্গের অন্য তিনটি ধ্বনিতেও তারল্যের উদাহরণ— তেলের 'ছেঁক' শব্দে, ছাঁকনী, ছিঁচ-কাঁদুনে, বৃষ্টির ছপছপ, রঙের ছোপ দিয়ে ছোবানো, ছিটকান, বৃষ্টির ছাঁট, চোখের ছলছল ইত্যাদি, শেষপর্যন্ত— 'ছ্যাবলা ও ছিবলে মানুষের চরিত্র তরল'। জ-য়ে

জবজবে আর জ্যাবজ্যাবে। ঝ-য়ে বৃষ্টির ঝমর ঝমর, ঝপঝপ, ঝাপটা, ঝরঝর, ঝরনা, ঝারি, ঝিরঝির, ঝিল, ঝোল, তরল গাঢ় রক্তের ঝলকে ঝলকে নির্গমন ইত্যাদি।[২৯১]

মহাপ্রাণতাযোগে স্বভাবতই 'চ-য়ের চেয়ে ছ জোরালো'[২৯২] জলাশয়ে ধাতব পদার্থ ছিটকে পড়বার শব্দ 'ছঃ'। 'রামাভিষেকে যে হেমঘট তরুণীর কক্ষচ্যুত হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন, উহা সোপান হইতে প'ড়িবার সময় ঠননং ঠঠং ঠং ঠননং ঠঠং শব্দ করিয়া শেষে ছঃ শব্দ করিয়াছিল। এই ছঃ হেমঘটের জলে পতনের শব্দ; উহাতে ঘটের সহিত তরল জলের স্পর্শ-ঘটনা সূচনা করিতেছে।'[২৯৩] রবীন্দ্রনাথের 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে / তব কুঞ্জবনে / বসন্তের মাধবীমঞ্জরী / যেই ক্ষণে দেয় ভরি / মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল / বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।' চরণ-গুচ্ছের মধুর ধ্বনিসৌন্দর্যমোহ যেমন 'ধু' ধ্বনির আঘাতে ভেঙেছিল— তেমনি ভেঙেছিল 'ছ-ধ্বনির আবৃত্তিতে'— লিখেছেন সুধীরকুমার দাশগুপ্ত।[২৯৭] অর্থাৎ ছ-ধ্বনি কেবল তারল্যসূচক নয়. জোরালো স্বভাবে মোহ ছিন্ন করবার শক্তিও তার আছে।

ঘোষ-জ ধ্বনির স্বভাবে 'জাঁক' আর 'গম্ভীর ভাবের ব্যঞ্জনা' থাকবার কথা[২৯৫] 'লোক জোটাইয়া বা জড়ো করিয়া জটলা করিলে কর্মের গুরুত্ব বাড়ে বটে।'[২৯৫] রামেন্দ্রসুন্দর 'জবজবে বা জ্যাবজ্যাবে' শব্দে 'স্থূলতার সঙ্গে আর্দ্রতা'র মিশাল দেখেছেন।[২৯৫] 'উজ্জ্বল দ্রব্যকে জলজলে বা জিলজিলে বলিয়া থাকে। এখানে মূলে হয়ত সংস্কৃত জ্বল ধাতু বর্তমান। উজ্জ্বল দ্রব্যই জেল্লা দেয়।'[২৯৬] দিনেশ দাসের 'সিংহিনী' কবিতায় জ-ধ্বনির আবর্তিত প্রয়োগে সজীবতা লক্ষ করেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। ' 'জঙ্গলেরই জটিল রেখা সবুজ বিজলীর' …অর্থাৎ, 'চিকন এক করুণ নদী' সবুজ বিদ্যুতের মতো জঙ্গলের জটিল শরীর ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।… 'জ'-অক্ষরটির জীবন্ত ব্যবহার আমাদের চোখ-কান এড়িয়ে যায় না'।[২৯৭] কবিতার ধ্বনির এই জীবন কি উজ্জ্বল প্রকাশের জন্যে ?

ঝ-এর 'জাঁক' জ-য়ের চেয়ে প্রাণশক্তিতে প্রবল। 'ধাতুনির্মিত তন্ত্রীর ধ্বনি'তে 'ঝংকার', ধাতুর সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে 'অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা', ঝুমুর, 'কাংস্যময়··· ঝাঁঝ', ঝনঝন শব্দ। 'তীব্রধর্মে'র প্রকাশও ঝ-য়ে— ঝাঁঝ, ঝাঁঝাল, ঝাল। প্রবলতা— 'ঝঞ্ঝা'র ভিতরে। কড়া ভাব— ঝুনো নারকেলের জলে, ঝানু লোকের স্বভাবে। ঝ-এর তারল্য সম্পর্কে খবর তো আমরা আগেই পেয়েছি। এ-সমস্ত মত সবই

রামেন্দ্রসুন্দরে পাচ্ছি। শেষে তিনি বলেছেন যে, ঝ-এ যে গুরুত্বের ভাব আছে সেজন্য এই 'ঘোষযুক্ত বর্ণ…ধ'য়ের ভাব ও ঢ'য়ের ভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। ঝাঁ করিয়া চলা আর ধাঁ করিয়া চলা তুল্যার্থক। ঝিমানো (তন্দ্রা) কার্যে ঢিমা অর্থাৎ আলসে মানুষের ঢুলুঢুলু আঁখি মনে আনে'।[২৮৯]

চ-বর্গীয় ধ্বনিতে তারল্য, ক্ষণস্থায়িত্ব, আকস্মিকত্ব, তীব্রতা। আবার এ-বর্গের মহাপ্রাণ ধ্বনিতে জোরালো ভাব। ঘোষতা যুক্ত হলে— গাম্ভীর্য এবং গুরুত্বের ভাব, আর ঔজ্জ্বল্য। ঘোষতার সঙ্গে মহাপ্রাণতাযোগে প্রবলতা, কড়াভাব, তীব্রধর্ম এবং ঘোষ মহাপ্রাণ ঘৃষ্ট ধ্বনি প্রবলতায়, ট-বর্গ আব ত-বর্গের ঘোষ মহাপ্রাণ ঢ আব ধ ধ্বনির প্রতিস্পর্ধী রূপে গণ্য হচ্ছে।

উচ্চারণের শুরুতে স্পৃষ্ট এবং মোচনকালে ঘৃষ্ট বলে যুক্তবর্ণেব প্রথমে বিন্যস্ত হসন্তরূপী ঘৃষ্টধ্বনি অবরোধক গোত্রীয়। যেমন— উচ্চ, পুচ্ছ, মজ্জমান, কুজ্ঝটিকা শব্দের উচ্চারণে। যুক্তবর্ণের প্রথমে অবস্থিত ঘৃষ্টধ্বনি সংশ্লিষ্ট স্বরান্ত বর্ণের যোগে একত্র মুক্তি পায়। এই জন্য, কবিতাব আলোচনায় যুক্তাক্ষরের প্রথমে নিবেশিত ঘৃষ্টধ্বনিকে আমবা অবরোধক স্পৃষ্টধ্বনির শ্রেণীতে গণনা কবব। স্পৃষ্টধ্বনির ক্ষেত্রেও যুক্তবর্ণের প্রথম ধ্বনিটির মোচন বা স্ফোটন (plosion) ঘটে না। এই উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট বাক্‌প্রত্যঙ্গগুলি খানিকক্ষণ পরস্পর বদ্ধ থাকবার পর যুক্তব্যঞ্জনের দ্বিতীয়াংশের স্বরান্ত মোচনের সময় একযোগে মুক্তি পায়। যেমন— পক্ক, সংঘট্ট, মত্ত, আপ্ত ইত্যাদির বেলা।

আমাদের পূর্ব-আলোচনা-মতে, চ ছ জ ঝ -এর ভিতরে ছ আব ঝ মহাপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে স্বভাবত উষ্মতাবাহী। হসন্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির আলোচনা আগেই হয়েছে। চ আর জ ধ্বনি দুটিও, কি হসন্ত কি স্বরান্ত দুই উচ্চারণেই ঘৃষ্টতার দরুন উষ্মতা সৃষ্টি করে। যেমন— কোচ, সুচ, কাজ, সহজ বা অচেনা, সুচির, অজানা, ভোজন। মুখবিবর থেকে বাইরে আসার সময় উচ্চারকদের চাপে বায়ুতে ঘর্ষণ লাগলে উষ্মতা-সৃজন হবেই। তাই 'বৎসর বৎসর চলে গেল / দিবসের শেষ সূর্য / শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে / নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়' উচ্চারণে কেবল শ / স ধ্বনির উষ্মতা গণনা করলে, কবিতাংশের উষ্মতার পূর্ণ হিসেব নেওয়া হয় না। দুটি খণ্ড ৎ, তিনটি স্বরান্ত চ (চলে, উচ্চারিল, পশ্চিম), একটি স্বরান্ত জ (সূর্য), এবং 'নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়' বাক্যাংশের স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ-য়ের উষ্মতাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

অবরোধক-অনবরোধক স্বভাবের দরুন ঘৃষ্টধ্বনিগুলির ব্যঞ্জনা-ক্ষমতা বাংলার অন্যান্য অনবরোধক ধ্বনির পরেই। এই কারণে অবরোধক স্পৃষ্টব্যঞ্জনের আগে ঘৃষ্টধ্বনির ব্যঞ্জনাপ্রসঙ্গ বিন্যাস করা সংগত মনে হয়েছে।

জি হ্বা মূ লী য় স্পৃ ষ্ট ব্য ঞ্জ ন

ক খ গ ঘ ধ্বনির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আলোচনা খুব কম পাওয়া যায়। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলির ভিতরে ক উচ্চারণেই সবচেয়ে কম সময় লাগে, কারণ ফুসফুস থেকে বাতাস বার হতে গিয়ে জিহ্বামূলে রুদ্ধ হবার পরমুহূর্তে এই ধ্বনির উচ্চারণ। মুখবিবরের ভিতরের প্রান্ত থেকে দেখলে, কণ্ঠনালীয় মহাপ্রাণ ধ্বনি হ-য়ের পরেই ক-য়ের উচ্চারণস্থান। সেই মতে ক-ধ্বনির লক্ষণ 'দ্রুততা ও আকস্মিকতা'।[২৯৯] এ ধ্বনির সঙ্গে অন্য অল্পপ্রাণ ধ্বনির যোগেও দ্রুততা-বোধ জাগে, যেমন— কচ, কট, কপ।[২৯৯] ক-য়েব স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনার আলোচনায় না গিযে রামেন্দ্রসুন্দর এর সঙ্গে অন্য ধ্বনির যোগে সৃষ্ট ভাবেরই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

খ-য়ের উচ্চারণে মহাপ্রাণতার ব্যঞ্জনায় 'জোরে'র প্রকাশ— 'কচ শব্দ জোরে উচ্চারিত হইয়া খচ…'।[৩০০] গ-য়ে ঘোষতার গাম্ভীর্য।[৩০১] ঘ-য়ে ভারতচন্দ্রের উদ্‌ধৃতি-সহযোগে স্নিগ্ধ গাম্ভীর্যের প্রকাশ দেখিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। 'রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষের কথা মহাকবির উক্তি।'[৩০২]

ক খ গ ঘ চারটি ধ্বনিতেই তারল্যভাবযুক্ত ধ্বনিযোগে তরলতা বা চাঞ্চল্য, মূর্ধন্য ধ্বনিযোগে কাঠিন্য, অ-কার আ-কার ই-কার উ-কার যোগে ভাবের আনুপাতিক তারতম্য ইত্যাদি ব্যঞ্জনার বিবরণ দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বস্তুত, অবরোধক ধ্বনিগুলির আপন বৈশিষ্ট্য তার উচ্চারণরীতি এবং অল্পপ্রাণতা-মহাপ্রাণতা, ঘোষতা-অঘোষতা প্রভৃতি শ্রেণীচরিত্রে। অবরোধক ষোলোটি ধ্বনি যেন মূলত ভাষার উপাদান যোগানোতেই ব্যাপৃত। স্বরধ্বনি আর অনবরোধক ধ্বনিগুলি তাতে প্রয়োজনমতো ব্যঞ্জনা মিশিয়ে গতিবিধান করে ভাষার ভাববহনের কাজে সহায়তা করে চলেছে।

দ ন্ত মূ লী য় মূ র্ধ ন্য স্পৃ ষ্ট ধ্ব নি

হাই সাহেব এই ধ্বনিটির বর্ণনায় এর ব্যঞ্জনার বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। 'জিভের ডগা উলটিয়ে দন্তমূলের সঙ্গে লাগানোর ফলে উদ্‌ভূত ধ্বনিটির ব্যঞ্জনা নিছক

দন্তমূলোত্থিত ধ্বনির মতো সুস্পষ্ট হয় না, হয় আড়ষ্ট ও প্রতিবেষ্টিত।'[৩০৩] 'জিভের ডগার সামান্যতম 'curling' বা দুমড়ানোর জন্য মুখ-গহ্বরে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস কিছুটা প্রতিবেষ্টিত হয়ে যায়। বায়ুপথের এটুকু প্রতিবেষ্টন বা retroflexion-এর জন্যে এই ধ্বনিগুলোর যে ব্যঞ্জনা আমরা পাই তা কোমল, মধুর বা স্বচ্ছ ততটা নয় যতটা গম্ভীর।'[৩০৪] রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন— 'ট-বর্গের সহিত···কঠিন পদার্থের সম্পর্ক'।[৩০৫] 'কঠিন দ্রব্যের সহিত কঠিন দ্রব্যের সংঘট্টের পরিচয় দেয়'।[৩০৬] আড়ষ্টতার সঙ্গে জড়তা-কঠিন ভাবের যোগ রয়েছে, ট-ধ্বনিতে সেই কাঠিন্যের দরুন আঘাতের ভাব আছে। তাই রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন— 'তীব্র লোহিতবর্ণ চক্ষুতে আঘাত দেয়— এই জন্য উহা রাঙা টকটকে'।[৩০৭]

'ট-য়ের মহাপ্রাণ ঠ; উহাতে কাঠিন্য ও কঠোরতার ভাব আবো সুস্পষ্ট হইয়া উঠে', 'কঠিন বাক্য অন্তরেন্দ্রিয়ে আঘাত দিলে ঠাট্টায় পরিণত হয়' —রামেন্দ্র-সুন্দর।[৩০৮] সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' কবিতার বিশ্লেষণে নবেন্দু বসু দেখিয়েছেন— সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' যখন 'শৈলের পৈঠা'য় আছড়ে পড়তে লাগল— তখনই বর্ণনাতে এসেছে ঠ-য়ের ব্যবহার।[৩০৯]

ড আর ঢ-য়ের বেলায় ধ্বনি দুটির ঘোষতার প্রভাব ট-বর্গীয় কাঠিন্যের স্বভাবকে 'কোমল' করছে। 'ড···ধ্বনিব একটা গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব আছে···। বস্তুতই ড-কারের ও ঢ-কারের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য উহাদের কাঠিন্যসূচনার ভাবকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।'[৩১০] বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন— 'অর্বাচীন সংস্কৃতে এবং একালের ভাষায় ভীম শব্দ বুঝাইবার অক্ষর হইল ড।···বৈদিক প্রয়োগেও 'ড' দ্বারাও ষণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায়।'[৩১১]

রামেন্দ্রসুন্দর ঐ দুই ধ্বনির তুলনা করে বলেছেন— 'ড'য়ের সমুদায় লক্ষণ বর্ধিত-বিক্রমে ঢ'য়ে বর্তমান। ঢ'য়ের ধ্বনি ড'য়ের চেয়ে মোটা,···ঢ···স্থূলত্ব বোঝায়।··· স্থূলত্বের সহিত জড়তার, নিশ্চেষ্টতার, আলস্যের ভাব জড়িত; যথা— ঢিলা, ঢিমা, ঢোলা (তন্দ্রা), গা ঢিসঢিস করা।'[৩১২] 'ঢপঢপে ঢ্যাবঢেবে দ্রব্য নিস্তেজ'। 'তন্দ্রাগত ব্যক্তির ঢুলু ঢুলু আঁখিতে আলোর সহিত আলস্যের ভাব মিশ্রিত'।[৩১৩]

ট-বর্গীয় অঘোষ এবং ঘোষ ধ্বনির ব্যঞ্জনাতে পার্থক্য লক্ষ করা গেল। ট ঠ আড়ষ্ট, কঠিন, আঘাতকারী, কঠোর। ড গম্ভীর, গুরু, ভীম। ঢ গম্ভীর, গুরু, ড-য়ের চেয়ে মোটা বা স্থূল এবং স্থূলতাবশে জড়তা নিশ্চেষ্টতা ও আলস্যময়, নিস্তেজ।

দ ন্ত্য স্পৃ ষ্ট ধ্ব নি

রামেন্দ্রসুন্দরের বিচারে— 'কোমল দ্রব্যে কোমল দ্রব্যের আঘাতে অথবা কোমলে-কঠিনে আঘাতে ত-বর্গের ধ্বনির সৃষ্টি।...উপর হইতে মাটিতে পড়িলে আঘাতের শব্দ থপ্, দপ্, ধপ্। এই কোমলভাব 'ত-বর্গের ধ্বনির বিশিষ্ট ভাব'।[৩১৪] 'ত-বর্গের ধ্বনির সহিত তারল্যের সম্পর্ক'।[৩১৫] সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' কবিতার ধ্বনিঝংকার অনুধাবন করতে গিয়ে নবেন্দু বসু কঠিন ধ্বনির বিপরীতে 'ত' ধ্বনির তারল্যের ইঙ্গিত করেছেন— 'নদী যখন জলপ্রপাত হয়ে নীচেকার শিলাপীঠে আছড়ে পড়তে লাগল তখন বর্ণনায় 'ত' আর 'ঠ' বেশি'।[৩১৬]

থ-ধ্বনির বিবরণ—' 'থ' মহাপ্রাণ বলিয়া ত'য়ের তুলনায় ইহার ভার কিছু অধিক।'[৩১৭] এবং, 'তুসতুসের চেয়ে মোটা জিনিস থুসথুসে'। স্থূলত্বও মহাপ্রাণত্বের ফলে।

ঘোষধ্বনির চরিত্র অনুসারে আমরা জানি, দ গম্ভীর এবং জমকালো।

'ধ'য়ের ধ্বনিতে গুরুত্ব ও স্থূলত্বের অর্থ টানিয়া আনে।'[৩১৮] 'হালকা জিনিস যেখানে দপ করে, ভারি জিনিস সেখানে ধপ করিয়া পড়ে। দপদপ, দুপদাপ-এর চেয়ে ধপধপ, ধুপধাপ-এর গুরুত্ব বেশি। থেই থেই নাচের চেয়ে ধেই ধেই নাচের গুরুত্ব বেশি। পৃষ্ঠোপরি দুমদাম কিলের চেয়ে ধমাধম বা ধপাধপ কিলের গুরুত্ব অধিক।'[৩১৯] গুরুত্ব আর স্থূলত্বের জন্যেই সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে' ইত্যাদি স্তবকটিতে 'ন-ধ্বনি, ম-ধ্বনি ও ল-ধ্বনির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের ক্রিয়া'র পর 'বিদায়-গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল' চরণে 'ধু-ধ্বনির আবৃত্তিতে সে মোহ আঘাত পায়'।[৩২০]

ত-বর্গের বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণনা পাওয়া গেল— কোমল, কোমলে-কঠিনে আঘাতের ধ্বনি, তরল। এবং এই বর্গীয় অল্পপ্রাণ অঘোষ রূপ থেকে মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তুলনামূলক স্থূলত্ব বা আধিক্য, গাম্ভীর্য, গুরুত্ব আর আঘাতের ওজন বেড়ে চলে।

ও ষ্ঠ্য স্পৃ ষ্ট ধ্ব নি

রামেন্দ্রসুন্দর আনুপূর্বিক বর্ণমালা ধরে বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্রে বিশেষ ব্যঞ্জনার আলোচনা করেছেন বলে আমাদের এই নিবন্ধে তাঁর বহুল উল্লেখ অনিবার্য হচ্ছে। প ফ ব ভ বিষয়ে তাঁর মত— 'প-বর্গের ধ্বনির সহিত বায়ুপূর্ণ ফাঁপা

দ্রব্যের স্বাভাবিক ধ্বনির সম্পর্ক রহিয়াছে। বায়ুপূর্ণ দ্রব্যের অভ্যন্তর হইতে বাতাস বাহির হওয়ার সময় এইরূপ ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া থাকে।'[৩২১] উচ্চারণরীতি লক্ষ করলে এই মতের সমর্থন পাওয়া যাবে— বদ্ধ ওষ্ঠের ভিতর দিকে মুখবিবরের বায়ু ওষ্ঠাধর পৃথক করে বার হয়ে যাবার সময়ই প ফ ব ভ ধ্বনির উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়। উচ্চারণের প্রকারভেদ থেকে প্রত্যেকটি ওষ্ঠ্য ধ্বনির ভিতরে আবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। যেমন— মহাপ্রাণতার দরুন প-য়ের চেয়ে ফ উচ্চারণে তুলনামূলক ভাবে বেশি জোর প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ আবার ফ-ধ্বনিতে 'একটা অবজ্ঞার ভাব' লক্ষ করেছিলেন আমরা আগেই দেখেছি।[৩২২]

বাংলাভাষায় ব্যঞ্জনের প্রচলন অনুপাত বা frequency-র হিসাব অনুযায়ী ব একটি বহু ব্যবহৃত ধ্বনি।[৩২৩] কিন্তু ব-য়ের প্রসঙ্গে ধ্বনিটির ঘোষতার এবং বর্গীয় কিছু গুণের কথা পরোক্ষভাবে পাওয়া গেলেও, বিশেষভাবে এই ধ্বনির ব্যঞ্জনার কোনো আলোচনা পাই না। এ ধ্বনি কি তবে ভাষার উপাদান গঠনেই প্রধানত আপনাকে নিয়োজিত রাখে?

ভ-ধ্বনি সম্পর্কে পাই একটি উল্লেখ— 'ভ-বর্ণ মহাপ্রাণ ও ঘোষবান্; উহাতে স্থূলতা জ্ঞাপন করে। ভোমা শব্দে এই স্থূলত্বের ভাব আসে দেখিয়াছি।'[৩২৪]

প ফ ব ভ সম্পর্কে হাই সাহেবের সাধারণ মন্তব্য— 'তাদের ব্যঞ্জনা তেমন অনুরণনশীল নয়, নয় তেমনি গাঢ় কি গম্ভীর'।[৩২৫] তা ছাড়া এই চারটি ধ্বনিতে বায়ুপূর্ণ ফাঁপা জায়গা থেকে বাতাস বেরিয়ে যাবার ভাব আছে, ফ-য়ে আছে অবজ্ঞা, ব-য়ে ঘোষতা, ভ-য়ে ঘোষতা ও মহাপ্রাণতার দরুন স্থূলতা।

যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সংযুক্ত ধ্বনিগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরস্পর প্রভাবে মিলিত ব্যঞ্জনা বিকাশ করে। সকল যুক্তব্যঞ্জনের আলোচনায় প্রবেশ না করে, কবিতা বিশ্লেষণকালে উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে সৃষ্ট ব্যঞ্জনার বিবেচনার মাধ্যমেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছুবার চেষ্টা করব। আমরা জানি, এই প্রবন্ধে বিন্যস্ত স্বতন্ত্র ধ্বনিচরিত্র আলোচনা বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্রের পূর্ণ পরিচয় নয়। বাকধ্বনির বিচিত্র বিন্যাস বিচিত্র চরিত্র প্রকাশে সক্ষম। কিন্তু সর্বপ্রকার বিন্যাসের আলোচনা সম্ভব নয় বলে, স্বতন্ত্র ধ্বনিচরিত্র বা স্বতন্ত্রভাবে বাক্‌ধ্বনি বিষয়ে বাঙালির সংস্কার পর্যালোচনা করে আমাদের ক্ষান্ত হতে হচ্ছে। কবিতা বিশ্লেষণকালে আমরা প্রয়োজনমতো বিন্যাসের আলোচনা করে অগ্রসর হব।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

ক. অবরোধক

স্পৃষ্টধ্বনি— ক খ গ ঘ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ৎ

খ. অবরোধক-অনবরোধক

ঘৃষ্টধ্বনি— চ ছ জ ঝ

গ. অনবরোধক

নাসিক্যধ্বনি— ঙ ন ম ঙহ হ্ন হ্ম

উষ্মধ্বনি— হ শ (sh) স (s) অন্তঃস্থ ব হ্ব জ় (z) ফ় (f) বিসর্গ

তাড়নজাত ধ্বনি— ড় ঢ়

কম্পনজাত ধ্বনি— র হ্র / হ্‌ রেফ

ধ্বনি থেকে কবিতা

ক. নিরুদ্দেশ যাত্রার ধ্বনি

এক.

'গৌঃ' শব্দে 'গোরু' বোঝায় বলে গ-ধ্বনি শুনলেই 'গোরু'র স্মৃতি মনে জাগবে— এমন কথা হাস্যকর ঠেকতে পারে। ভর্তৃহরি তাঁর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে এ কথা নিয়ে পরিহাস করেছেন। কিন্তু, বিষয়টিকে অত লঘু করে না দেখে প্রয়োগের ব্যবহারিক বিচারের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করাই আমরা সমীচীন মনে করি। মানুষের সংস্কারে কোন্ শব্দ তথা শব্দার্থের সঙ্গে কোন্ ধ্বনি সম্পর্ক গড়ে বসবাস করতে শুরু করে দেয়, তার ঠিকঠিকানা নেই। এক এক সংস্কৃতিতে এরকম নানা ধারণা সঞ্চিত হয়ে হয়ে, তার আপন একটি ধারা সৃষ্টি হতেই পারে। তখন ধ্বনিসাদৃশ্যে সেই সংস্কৃতির মানুষের চিত্তে নির্দিষ্টরকমের ভাবের উদ্রেক হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'গ' বললে 'গোরু' যদি নাও বোঝায়, 'গবা' বা 'গবচন্দ্র' বলতে 'গোরুর ভাব'ই বোঝায় তো ঠিক।

বাঙালির পক্ষে, জাতীয় সংস্কার সূত্রে বা বাংলা ভাষার উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে, বাক্‌ধ্বনির ভিতরে সংগতিপূর্ণ ভাব কল্পনা করা সম্ভব। ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার ধ্বনি ছাড়াও, যে দল বা সিলেব্‌লের উচ্চারণ হস্-অন্ত অর্থাৎ বাধাযুক্ত, আর যে দল বাধাহীন বা মুক্ত, সেই রুদ্ধ বা মুক্ত দলের বিন্যাসের ধরনে ভিন্ন ভিন্ন বোধ জাগা বিচিত্র নয়। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে, ভাষাধ্বনির উচ্চারণের প্রকার পাঠকের মনে উচ্চারণ অনুগ বোধের আলপনা এঁকে চলতে পারে। নির্দিষ্ট ধরনের ধ্বনির সমাবেশ আর বিন্যাসের রূপ বাচ্যার্থের পাশে পাশে প্রবাহিত হয়ে বক্তব্যকে গতি আর স্ফূর্তি দিয়ে রসিকচিত্তে কাব্যাত্মার দ্যুতি উদ্‌ভাসিত করতে পারে। এ-সব কথা আগেও বলা হয়েছে, তবু, ধ্বনি থেকে কবিতায় পৌঁছুবার চেষ্টার প্রাক্কালে কথা-গুলি আরেকবার নাড়াচাড়া করা অবান্তর নয়। এখন, নিকট পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিষয়টির বিচার করা যাক। রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার ধ্বনিসমাবেশ জরিপ করে, পরে বাচ্য এবং ব্যঞ্জিত অর্থের সঙ্গে তার যোগ সন্ধান করে প্রস্তাবটি যাচাই করব।

দুই.

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে
তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগনকোণে।
কী আছে হোথায়— চলেছি কিসের
অন্বেষণে ?

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায়
অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?

তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না বলে।

হুহু করে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া।
দুলিছে যেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার
বিলাস হেন।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
'কে যাবে সাথে'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে?

মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ
কখনো রবি—
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো
শান্তছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়-
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়,
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমিরতলে?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি।'

কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না।
নীবব হাসি।

প্রথমেই উচ্চাবণবীতিব ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন স্তবক অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিব হিসেব গুচ্ছ কবে সাজিয়ে নেব। তাব ভিতবে আবো বিভাজন লিপিবদ্ধ কববাব দবকাব হবে— স্বরান্তধ্বনি এবং হসন্তধ্বনি, আব অঘোষ / ঘোষ অল্পপ্রাণ এবং অঘোষ / ঘোষ মহাপ্রাণ।

উচ্চাবণবীতি

	স্তবক	১	২	৩	৪	৫	৬
স্ববান্ত স্পৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ	ক	৯	৩	৭	৮	৯	১৩= ৪৯
	ট	০	০	০	০	০	১= ১
	ত	৮	১১	৯	৭	১৩	৪= ৫২
	প	৪	৪	৪	৮	৪	৫= ২৯
		২১	১৮	২০	২৩	২৬	২৩=১৩১
স্ববান্ত স্পৃষ্ট ঘোষ অল্পপ্রাণ	গ	৪	৩	৪	১	২	২= ১৬
	ড	১	০	০	১	০	১= ৩
	দ	৫	৩	৪	১	০	৩= ১৬
	ব	৭	৫	৬	৬	৭	১১= ৪২
		১৭	১১	১৪	৯	৯	১৭= ৭৭
স্ববান্ত স্পৃষ্ট অঘোষ মহাপ্রাণ	খ	২	৪	০	৫	৫	৩= ১৯
	ঠ	১	০	০	১	১	০= ৩
	থ	১	৩	০	৫	৩	২= ১৪
	ফ	০	০	১	২	০	০= ৩
		৪	৭	১	১৩	৯	৫= ৩৯

স্বরান্ত স্পৃষ্ট ঘোষ অল্পপ্রাণ	ঘ	০	১	২	০	০	০= ৩
	ঢ	০	০	০	০	০	১= ১
	ধ	৪	৪	২	১	৩	৫= ১৯
	ভ	১	০	১	০	১	২= ৫
		৫	৫	৫	১	৪	৮= ২৮
স্বরান্ত স্পৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ	চ	২	৫	১	৫	৩	০= ১৬
		২	৫	১	৫	৩	০= ১৬
স্বরান্ত স্পৃষ্ট অঘোষ মহাপ্রাণ	ছ	৫	৫	৪	৩	৭	১= ২৫
		৫	৫	৪	৩	৭	১= ২৫
স্বরান্ত স্পৃষ্ট ঘোষ অল্পপ্রাণ	জ	৩	৫	৪	৪	২	২= ২০
		৩	৫	৪	৪	২	২= ২০
স্বরান্ত স্পৃষ্ট ঘোষ মহাপ্রাণ	ঝ	১	১	২	০	০	০= ৪
		১	১	২	০	০	০= ৪
স্বরান্ত উষ্ম অঘোষ অল্পপ্রাণ	শ (sh)	১০	৫	১০	১১	৭	১৫= ৫৮
	স (s)	০	০	০	০	১	০= ১
		১০	৫	১০	১১	৮	১৫= ৫৯
স্বরান্ত উষ্ম ঘোষ মহাপ্রাণ	হ	৪	২	৮	৪	৪	৬= ২৮
		৪	২	৮	৪	৪	৬= ২৮
স্বরান্ত নাসিক্য ঘোষ অল্পপ্রাণ	ন	১২	৫	১১	১০	৯	৮= ৫৫
	ম	৭	৮	৪	৫	৭	২= ৩৩
		১৯	১৩	১৫	১৫	১৬	১০= ৮৮

স্বরান্ত কম্পনজাত ঘোষ অল্পপ্রাণ	র	৬	৮	১৩	৬	৬	১০=	৪৯
		৬	৮	১৩	৬	৬	১০=	৪৯
স্বরান্ত পার্শ্বিক ঘোষ অল্পপ্রাণ	ল	৬	১১	৬	৮	৮	৪=	৪৩
		৬	১১	৬	৮	৮	৪=	৪৩
স্বরান্ত তাড়নজাত ঘোষ অল্পপ্রাণ	ড়	১	১	১	০	০	৩=	৬
		১	১	১	০	০	৩=	৬

সর্বমোট স্বরান্ত ব্যঞ্জন ৬১৩টি।

হসন্ত স্পৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ	ক্	০	১	০	১	১	১=	৪
	প্	০	০	০	০	১	০=	১
		০	১	০	১	২	১=	৫
হসন্ত স্পৃষ্ট ঘোষ অল্পপ্রাণ	গ্	০	০	১	০	১	০=	২
	ব্	০	০	১	০	১	২=	৪
		০	০	২	০	২	২=	৬
হসন্ত স্পৃষ্ট ঘোষ মহাপ্রাণ	ঘ্	০	০	০	০	১	০=	১
	ঙ	০	০	১	০	০	০=	১
	ভ্	০	০	০	০	০	১=	১
		০	০	১	০	১	১=	৩
হসন্ত ঘৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ	চ্	০	০	১	০	০	০=	১
		০	০	১	০	০	০=	১

হসন্ত ঘৃষ্ট ঘোষ অল্পপ্রাণ	জ্	০	০	১	০	০	০ = ১
		০	০	১	০	০	০ = ১
হসন্ত উষ্ম অঘোষ অল্পপ্রাণ	শ্	১	০	৩	১	১	১ = ৭
	স্	০	২	০	০	১	০ = ৩
		১	২	৩	১	২	১ = ১০
হসন্ত নাসিক্য ঘোষ অল্পপ্রাণ	ঙ্	১	০	০	০	০	০ = ১
	ন্	৫	২	৬	৭	৬	২ = ২৮
	ম্	০	৩	১	৩	০	০ = ৭
		৬	৫	৭	১০	৬	২ = ৩৬
হসন্ত কম্পনজাত ঘোষ অল্পপ্রাণ	র্	৮	৭	৩	৬	৪	৪ = ৩২
	রেফ	০	১	২	০	০	১ = ৪
		৮	৮	৫	৬	৪	৫ = ৩৬
হসন্ত পার্শ্বিক ঘোষ অল্পপ্রাণ	ল্	০	৪	১	২	০	১ = ৮
		০	৪	১	২	০	১ = ৮

সর্বমোট হসন্ত ব্যঞ্জন ১০৬টি।

কবিতাটির মোট ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ৭১৮। তার ভিতরে স্বরান্ত রয়েছে ৬১৩টি, হসন্ত ১০৬। স্বরান্ত মুক্তদল স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন আছে ২৭৫টি। আর হসন্ত রুদ্ধদল স্পৃষ্টব্যঞ্জন রয়েছে ১৪টি। ১৪টি স্পৃষ্ট রুদ্ধদলের দৃষ্টান্ত ২৭৫টি স্পৃষ্ট মুক্তধ্বনির তুলনায় চোখে পড়বার মতো সংখ্যালঘু। অবশ্য আরো দুটি ধ্বনিকে আমরা স্পৃষ্ট রুদ্ধধ্বনির শ্রেণীতে গণনা করব। সে দুটি এই কবিতার 'গর্জন' এবং 'জলোচ্ছ্বাস' পদের হসন্ত ঘৃষ্ট জ এবং চ। রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনের উচ্চারণদ্বিত্ব ঘটছে।

কিন্তু হসন্ত রূপে ঘৃষ্টধ্বনি স্পৃষ্ট অবস্থায় থাকে, স্বরান্ত মোচনের সময়ে এ ধ্বনির ঘৃষ্টতা ঘটে। সেই জন্যেই 'গর্জন' আর জলোচ্ছ্বাসে'র প্রথম জ্ আর চ্ স্বরে বাহিত না হওয়ায় স্পৃষ্ট রয়ে গেছে। স্পৃষ্ট রুদ্ধধ্বনির দলে পড়ে যাওয়ায় পূর্বে কথিত ১৪টি হসন্ত স্পৃষ্টধ্বনির সঙ্গে এই দুটি ধ্বনি যোগ হয়ে ঐ ধরনের মোট ধ্বনির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৬। ঘৃষ্টধ্বনির গোত্র থেকে ২টি হসন্তধ্বনি এভাবে চলে এসেছে স্পৃষ্ট গোত্রে।

অন্যান্য হসন্ত ব্যঞ্জনের ভিতরে রয়েছে ৩৬টি ঙ ন ম, ৩২টি র, ৪টি রেফ, ৮টি ল এবং ১০টি শ (sh) স (s)। নাসিক্য ব্যঞ্জনের হসন্ত উচ্চারণেও নাক দিয়ে বাতাস বার হয়ে ধ্বনি উৎপন্ন হতে পারে বলে উপস্থিত ৩৬টি হসন্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনিপ্রবাহকে অবরুদ্ধ করতে পারছে না। হসন্ত র-ধ্বনি কম্পনজাত স্বভাবের জন্য আঁটভাবে রুদ্ধ হতে পারে না। ধ্বনিটিকে এইজন্যেই 'তরল' নামেও অভিহিত করবার চল রয়েছে। ৪টি রেফ ধ্বনির ভিতরে দ্বিতীয় স্তবকের 'উর্মি-মুখর' আর শেষ স্তবকের 'স্বর্ণ-আলোক' পদে 'র্ম্' আর 'র্ন্' বিন্যাসে সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনের সহায়ে হসন্তধ্বনির অবরোধ অকার্যকর হয়ে যায়। আর, রেফ উচ্চারণের জায়গা থেকে জিহ্বা দ্রুত সরে গিয়ে ম আর ন উচ্চারণের জায়গায় অবস্থান নেয়। 'দীর্ঘশ্বাস' আর 'গর্জন' পদের রেফ-সংশ্লিষ্ট হসন্ত গ আর হসন্ত জ-তে অবশ্যই সম্যক অবরোধ ঘটে। কিন্তু লক্ষ করতে হবে যে, রেফ ধ্বনির উচ্চারণ স্থান থেকে সরে গিয়ে হসন্ত গ আর জ-এর উচ্চারণ স্থলে পৌঁছে জিহ্বা বায়ুপথকে সম্পূর্ণ রোধ করে। অর্থাৎ রেফ উচ্চারণে অবরোধ ঘটে না, ঘটে গ্ আর জ্ উচ্চারণে। ল-ধ্বনি স্বভাবতই তরল। আমরা জানি, জিহ্বার দু-পাশ থেকে বাতাস বেরিয়ে গিয়ে, হসন্ত ল-ও অনর্গল (**continuant**) ধর্ম পায়। হসন্ত শ এবং স উচ্চারণে বাক্‌প্রত্যঙ্গ পরস্পর সংলগ্ন থাকলেও এই দুই ব্যঞ্জন শিসধ্বনি হয়ে বাতাসে ভাসতে পারে।

ফলত, মোট ১০৬টি হসন্ত ব্যঞ্জন বা রুদ্ধদল ধ্বনির ভিতরে মাত্র ১৬টি ধ্বনি সত্যিকার অর্থে অবরোধক দল (**syllable**) তৈরি করতে পারছে। অন্য দিকে, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার ৬১৩টি মুক্তদল ব্যঞ্জনের সঙ্গে, হসন্ত হলেও, ধর্মে অনর্গল হবার দরুন ৩৬টি ঙ্ ন্ ম্+৩২টি র্+৪টি রেফ+৮টি ল্+১০টি শ্ স্—মোট ৯০টি ব্যঞ্জন যোগ করে মোট অনর্গল স্বভাবের ধ্বনি তথা 'দল' পাচ্ছি ৭০৩টি। সব মিলিয়ে, নিশ্ছিদ্র রুদ্ধদল এ কবিতায় একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

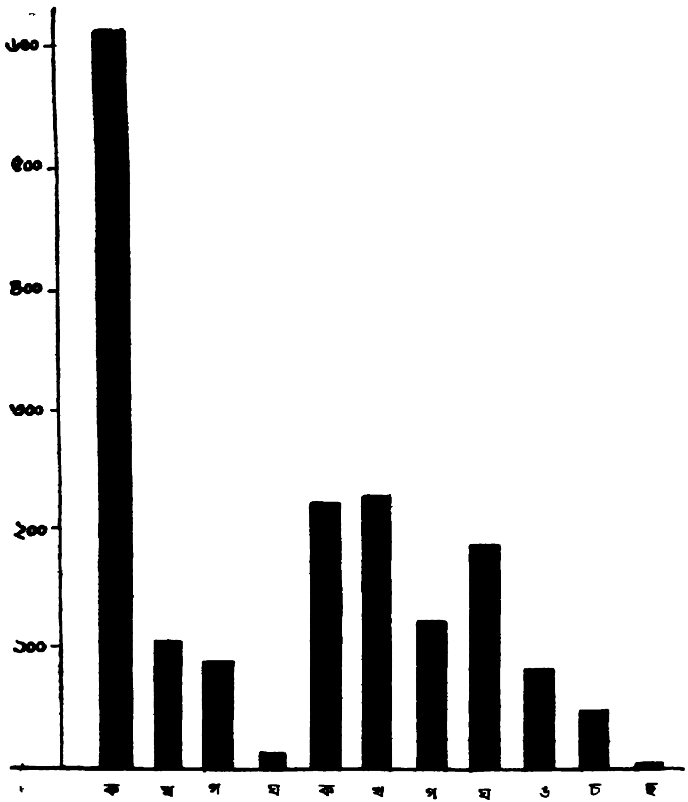
স্বরান্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনগুলির ভিতর থেকে মহাপ্রাণ ধ্বনি কটিকে সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ মহাপ্রাণ ধ্বনিশেষে সংলগ্ন স্বর-উচ্চারণে, ব্যঞ্জনশেষের হ-জাতীয় ধ্বনির প্রভাবে বাতাসে উষ্মতা জাগে। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ উষ্মতাধর্মী শোনায়। আলোচ্য কবিতার ৬৭টি স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনিকে এই জন্য উষ্মতাধর্মী ধ্বনিপর্যায়ে স্থানান্তর করা সংগত। ২৭৫টি স্বরান্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন থেকে ৬৭টি সরে গেলে স্বরান্ত স্পৃষ্ট বৃত্তে রইল ২০৮টি ধ্বনি।

মোট ৬৭ খানি ঘৃষ্টধ্বনির মধ্যে হসন্ত ঘৃষ্টধ্বনি দুটিকে উচ্চারণের স্পৃষ্টতার দরুন আমরা স্পৃষ্টধ্বনি বলে গণ্য করেছি। বাকি স্বরান্ত ৬৫টি ঘৃষ্টধ্বনিতে উচ্চারণের শেষভাগের ঘর্ষণ উষ্মতা সঞ্চার করছে। ফুসফুস থেকে বার হবার সময়ে মুখের ভিতরে বাতাস ঘষ্‌টে গেলে এই উষ্মতার সঞ্চার হয়। কাজে কাজেই স্বরান্ত ঘৃষ্টধ্বনিগুলিকেও আমরা উষ্মতাধর্মী পর্যায়ভুক্ত করব।

কবিতাটিতে, উষ্মধর্মের জন্যে চিহ্নিত শ(sh) স s) হ ধ্বনি রয়েছে ৯৭টি। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে ৬৭টি স্বরান্ত মহাপ্রাণ আর ৬৫টি স্বরান্ত ঘৃষ্টধ্বনি যোগ করলে উষ্মতাধর্মী ধ্বনির সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৯টি।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র ৩৬টি হসন্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনের কথা আগে বলেছি, এ কবিতায় স্বরান্ত নাসিক্যব্যঞ্জন রয়েছে ৮৮টি। একুনে ১২৪টি। কবিতায় সাংগীতিক কোমলতা বা মাধুর্য সঞ্চারে এই-সব নাসিক্য ব্যঞ্জনের ভূমিকা আমরা লক্ষ করব। দৃষ্টান্তস্বরূপ— 'সংশয়ময় ঘন নীল নীর, / কোনোদিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর, / অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া / দুলিছে যেন, তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ, তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ, / তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি / হাসিছ কেন? / আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার / বিলাস হেন।'

পূর্বে উল্লিখিত ৩২টি হসন্ত র আর ৪টি রেফের সঙ্গে আরো ৪৯টি স্বরান্ত কম্পন-জাত র রয়েছে কবিতাটিতে। ৩২ + ৪ + ৪৯ = ৮৫। র আর রেফের উচ্চারণে তালু আর দন্তের মাঝামাঝি উপরের পাটি দাঁতের মূলের ঢালু মতো জায়গায় জিভের পাতা ভালোরকমে সংলগ্ন হতে-না-হতে কেঁপে ওঠে। সেই জন্য এই উচ্চারণে তারল্য আর চাঞ্চল্য টের পাওয়া যায়। 'হোথায় কি আছে আলয় তোমার / ঊর্মিমুখর সাগরের পার, / মেঘচুম্বিত অস্তগিরির / চরণতলে?' অংশে র আর রেফের আচরণ লক্ষণীয়। মুহম্মদ আবদুল হাই র-ধ্বনির মাধুর্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'বাংলায় একে তো জিভের ডগার কাঁপুনিতে এ ধ্বনির সৃষ্টি তার ওপরে



নিরুদ্দেশ যাত্রা ১ ও ২

১। ক. মুক্তদল — ৬১৩

খ. রুদ্ধদল — ১০৬

গ. প্রলম্বিত ধ্বনিতে রুদ্ধদল — ৯০

ঘ. সম্যক্ রুদ্ধদল — ১৬

২। ক স্পৃষ্টতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি — ২২৪

খ. উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি — ২২৯

গ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি — ১২৪

ঘ. { নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি + নাসিক্য অনুরণনযুক্ত উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি ১২৪ + ৬৫ = ১৮৯

ঙ. কম্পনজাত ব্যঞ্জনধ্বনি — ৮৫

চ. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি — ৫১

ছ. তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি — ৬

নিরুদ্দেশ যাত্রা ৩, ৪, ৫ ও ৬

৩। সংবৃত ই উ স্বরধ্বনি

স্তবক ১	স্তবক ২	স্তবক ৩	স্তবক ৪	স্তবক ৫	স্তবক ৬
৪৩	২৭	৩১	২২	২৫	২৫

৪। অর্ধসংবৃত এ ও স্বরধ্বনি

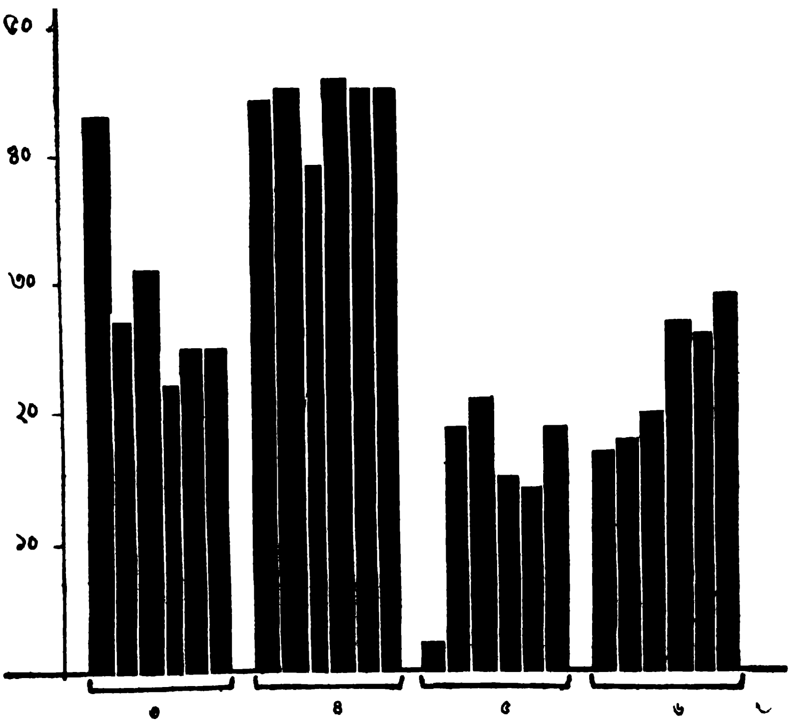
স্তবক ১	স্তবক ২	স্তবক ৩	স্তবক ৪	স্তবক ৫	স্তবক ৬
৪৪	৪৫	৩৯	৪৬	৪৫	৪৫

৫। অর্ধবিবৃত অ্যা অ স্বরধ্বনি

স্তবক ১	স্তবক ২	স্তবক ৩	স্তবক ৪	স্তবক ৫	স্তবক ৬
২	১৯	২১	১৫	১৪	১৯

৬। বিবৃত আ আঁ স্বরধ্বনি

স্তবক ১	স্তবক ২	স্তবক ৩	স্তবক ৪	স্তবক ৫	স্তবক ৬
১৭	১৮	২০	২৭	২৬	২৯



নিরুদ্দেশ যাত্রা ক ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১ । ক. সংবৃত ই উ স্বরধ্বনি স্তবক ১—৪৩
খ. অর্ধসংবৃত এ ও স্বরধ্বনি স্তবক ১—৪৪
গ. অর্ধবিবৃত অ্যা অ স্বরধ্বনি স্তবক ১—২
ঘ. বিবৃত আ আঁ স্বরধ্বনি স্তবক ১—১৭

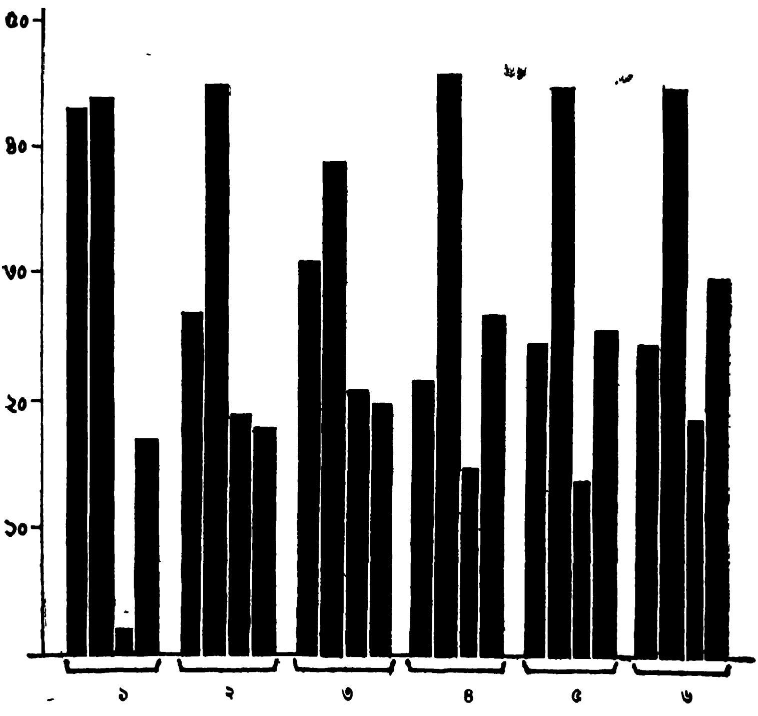
২ । ক. সংবৃত ই উ স্বরধ্বনি স্তবক ২—২৭
খ. অর্ধসংবৃত এ ও স্বরধ্বনি স্তবক ২—৪৫
গ. অর্ধবিবৃত অ্যা অ স্বরধ্বনি স্তবক ২—১৯
ঘ. বিবৃত আ আঁ স্বরধ্বনি স্তবক ২—১৮

৩ । ক. সংবৃত ই উ স্বরধ্বনি স্তবক ৩—৩১
খ. অর্ধসংবৃত এ ও স্বরধ্বনি স্তবক ৩—৩৯
গ. অর্ধবিবৃত অ্যা অ স্বরধ্বনি স্তবক ৩—২১
ঘ. বিবৃত আ আঁ স্বরধ্বনি স্তবক ৩—২০

৪ । ক. সংবৃত ই উ স্বরধ্বনি স্তবক ৪—২২
খ. অর্ধসংবৃত এ ও স্বরধ্বনি স্তবক ৪—৪৬
গ. অর্ধবিবৃত অ্যা অ স্বরধ্বনি স্তবক ৪—১৫
ঘ. বিবৃত আ আঁ স্বরধ্বনি স্তবক ৪—২৭

৫ । ক. সংবৃত ই উ স্বরধ্বনি স্তবক ৫—২৫
খ. অর্ধসংবৃত এ ও স্বরধ্বনি স্তবক ৫—৪৫
গ. অর্ধবিবৃত অ্যা অ স্বরধ্বনি স্তবক ৫—১৪
ঘ. বিবৃত আ আঁ স্বরধ্বনি স্তবক ৫—২৬

৬ । ক. সংবৃত ই উ স্বরধ্বনি স্তবক ৬—২৫
খ. অর্ধসংবৃত এ ও স্বরধ্বনি স্তবক ৬—৪৫
গ. অর্ধবিবৃত অ্যা অ স্বরধ্বনি স্তবক ৬—১৯
ঘ. বিবৃত আ আঁ স্বরধ্বনি স্তবক ৬—২৯



আছে এর সৃজনকালে স্বরতন্ত্রীর কাঁপুনি। এই দুই কাঁপুনিতে মিলে ধ্বনিটিতে একটি মধুর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়।'[৩২৬] র-য়ের এই মাধুর্য কবিতাটির সাংগীতিকতার সহায় হচ্ছে। রেফের ক্ষেত্রে 'ঊর্মি' আর 'স্বর্ণ' শব্দে সংশ্লিষ্ট ম আর ন ধ্বনির মাধুর্য একত্র গণ্য করা যদি যায়ও, 'দীর্ঘশ্বাস' আর 'গর্জনে'র ক্ষেত্রে মাধুর্য নয়, বলিষ্ঠতা বা পৌরুষের ভাবই গণনীয় মনে হয়।

৮টি হসন্ত পার্শ্বিক ল-ধ্বনির সঙ্গে এ কবিতায় আরো ৪৩টি স্বরান্ত ল-ধ্বনি স্থান পেয়েছে। ৪৩+৮=৫১টি পার্শ্বিক তরলধ্বনি। 'ঝলিতেছে জল তরল অনল, / গলিয়া পড়িছে অম্বরতল, / দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি / অশ্রুজলে' অংশে বাক্‌-ধ্বনির সাহায্যে তারল্য বিস্তারে ল-য়ের ভূমিকা হিসেব করতে হবে। উদ্ধৃত অংশে তরল র-ধ্বনিরও সহায়তা রয়েছে।

তাড়নজাত ড়-ধ্বনি কবিতাটিতে খুব কম। মাত্র ৬টি, তার সব কটি স্বরান্ত। 'ভিড়িবে' 'পড়িছে' 'পড়ে' 'পড়িবে' 'উড়ে পড়ে' পদ কটিতে র-য়ের চেয়ে গুরু-ভাব সত্ত্বেও, ড়-ধ্বনির উচ্চারণে তাড়নের দরুন জিহ্বার বিচলন স্পষ্ট। যাই হোক, এই সমস্ত ব্যঞ্জন উপাদানের সঙ্গে স্বরধ্বনি এবং অর্ধস্বর বা ব্যঞ্জন মিলে গোটা কাব্যঅঙ্গ গঠিত হয়েছে।

এইবার, স্বরান্ত ও হসন্ত ব্যঞ্জনের বিন্যাসবৈশিষ্ট্যে উচ্চারণগতভাবে গণ্য স্পৃষ্টতাধর্মী, উষ্মতাধর্মী, নাসিক্য, কম্পনজাত, পার্শ্বিক ও তাড়িত ধ্বনিগুলির সংখ্যা পরপর সাজিয়ে দেখা যাক—

স্পৃষ্টতাধর্মী ব্যঞ্জন— ২২৪
উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জন— ২২৯
নাসিক্য ব্যঞ্জন— ১২৪
কম্পনজাত ব্যঞ্জন— ৮৫
পার্শ্বিক ব্যঞ্জন— ৫১
তাড়িত ব্যঞ্জন— ৬

আধিক্যের ক্রমানুযায়ী সাজালে উষ্মতাধর্মী ধ্বনি শীর্ষে স্থান পায়। উষ্ম হ-ধ্বনির উষ্মতাধর্মের ধ্বন্যাত্মক বিবরণ 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'হুহু করে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস'। হিসেব বলছে— এই শ্বসিত বা উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনই কবিতাটির ভিতরে হুতাশের অনুভব জানিয়ে দেয়। কিন্তু আরো একটি বিবেচনা বাকি থেকে গেছে। নাসিক্য ব্যঞ্জন, এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত অনুনাসিক

স্বর, স্বভাবে এতই প্রলম্বনধর্মী যে উভয় পার্শ্বের অন্য ধ্বনিতেও এরা আপন গুণ ছড়িয়ে দেয়। হাই সাহেব লিখেছেন— 'নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-সংশ্লিষ্ট অক্ষরটির সামগ্রিক উচ্চারণ নাসিক্য অনুরণনময় তথা Prosodic।…দ্ব্যক্ষরিক, ত্র্যক্ষরিক, কি চতুরক্ষরিক শব্দেও নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির অনুরণন তাদের পূর্বে ও পরে প্রসৃত হয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অক্ষর এবং সমগ্র শব্দেরই সম্পদরূপে গণ্য হয়।'[৩২৭] 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সংখ্যাগরিষ্ঠ উষ্মধ্বনির উপরে ঐ রকম নাসিক্য অনুরণনের ফলে হুতাশের সঙ্গে মাধুর্যের ধ্বনিগত মিশ্রণেব বৈশিষ্ট্য গণনায় আনতে হবে। উপস্থিত কবিতার ৬৫টি ধ্বনিতে নাসিক্য ব্যঞ্জনা বিস্তৃত হয়েছে। এখানে মোটা হরফে ছাপা উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনগুলিতে নাসিক্য অনুরণনের বিস্তার লক্ষ করা যাবে— সুন্দরী, সোনার, যখনি, বিদেশিনী, মধুবহাসিনী, জানি, সিন্ধু, পশ্চিমে, অন্বেষণে, সন্ধ্যার, যেন, আঁখি, উর্মিমুখর, মেঘচুম্বিত, মুখপানে, অন্ধ, গর্জন, সংশয়ময়, ঘন, নাহি, অসীম, যেন, তরণীহিরণ, সন্ধ্যা, মাঝে, বুঝি না, হেন, যখন, প্রথম, চাহিনু, সমুখে, পশ্চিম, অসীম, চঞ্চল, শুধানু, তখন, নবীনজীবন, সোনার, মুখ, মেঘ, কখনো, কখনো, কখনো, শান্ত, সোনার, পশ্চিমে, নামিছে, এখন, স্নিগ্ধমরণ, শান্তি, কথা না, আঁধার, রজনী, এখনি, সন্ধ্যা, স্বর্ণ। অর্থাৎ এই ৬৫টি ধ্বনিতে হুতাশের বোধের সঙ্গে মাধুর্যের বোধ মিশে গেছে— হুতাশ কেবলি শূন্যতার ভাব ধরে নি। নাসিক্যধ্বনি সংগোপনে আপন সীমানা অতিক্রম করে হুতাশকে মধুর করেছে।

তিন.

এখন, অর্ধব্যঞ্জন অর্ধস্বরের হিসেব লিখতে উচ্চারণরীতিবৈশিষ্ট্যে স্বরান্ত / ও হসন্ত দুইভাবে সংবৃত, অর্ধসংবৃত, অর্ধবিবৃত ক্রমে প্রতি স্তবকে ব্যবহৃত ধ্বনির তালিকা বিন্যাস করব। আর-একবার বলে নেওয়া ভালো, ১৯৬০ সালেব '*Language*' পত্রিকার ষট্‌ত্রিংশ খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত চার্লস এ. ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরীর লেখা 'The phonemes of Bengali' প্রবন্ধ অনুযায়ী আমরা বাংলাতে ই্‌ এ্‌ ও্‌ উ্‌ চারটি অর্ধস্বর বা অর্ধব্যঞ্জন স্বীকার করে এই আলোচনা লিখছি। আগে অথবা পরে স্বরধ্বনি যোগেই কেবল এই ধ্বনি সম্পূর্ণ উচ্চারিত হতে পারে।

উচ্চারণরীতি

	ছত্র	১	২	৩	৪	৫	৬	
স্বরান্ত সংবৃত	ই	১	১	২	৩	৪	১ =	১২
স্বরান্ত অর্ধসংবৃত	এ	০	১	১	১	২	০ =	৫
		১	২	৩	৪	৬	১ =	১৭
হসন্ত সংবৃত	ই	১	২	০	০	০	২ =	৫
হসন্ত সংবৃত	উ	০	০	০	০	০	১ =	১
হসন্ত অর্ধসংবৃত	এ	১	৩	২	২	৩	২ =	১৩
হসন্ত অর্ধসংবৃত	ও	১	০	০	০	০	০ =	১
		৩	৫	২	২	৩	৫ =	২০

সাবণিতে দেখা যাচ্ছে— 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় বিন্যস্ত অর্ধব্যঞ্জন বা অর্ধস্বরের ভিতবে ১৭টি স্ববান্ত। যেমন পাচ্ছি 'নিয়ে' পদের 'য়ে' আর 'গলিয়া' পদের 'য়া' ইত্যাদি উচ্চারণে। আর ২০টি আছে হসন্ত, যেমন 'শুধাই' পদের 'ধাই' বা 'হোথায়' পদের 'থায়' উচ্চারণে।

আমবা জানি, হসন্ত অর্ধস্বর ধ্বনিগুলিকে প্রচলিত ব্যাকরণে যৌগিক ধ্বনি বলা হয়ে থাকে। উচ্চারণে, এক স্বরধ্বনিতে শুরু হয়ে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিতে পৌঁছেই রাশ টেনে থেমে-যাওয়া এই ধ্বনির বৈশিষ্ট্য। হসন্ত অর্ধব্যঞ্জনকে কবিতাব ছন্দের আকৃতি বিচারের সময় সচরাচর রুদ্ধদল বলে গণ্য করা হয়। উচ্চাবণে, স্বরের আকস্মিক সংবরণ মুখগহ্বরের ভিতবে ফুসফুস থেকে বাব-হয়ে-আসা বাতাসে চাপ সৃষ্টি করে ধ্বনিশেষে উষ্মতাব জন্ম দেয়। সেদিক থেকে দেখলে, এই কুড়িটি হসন্ত অর্ধধ্বনি গোটা কবিতার উষ্মতাধর্মী ধ্বনির সংখ্যা কিছু বাড়িয়ে তুলবে। উষ্মতায়-রুদ্ধ এই-সব দলকে নিশ্ছিদ্র ধ্বনের রুদ্ধদল না বলে অনর্গল স্বভাবাশ্রিতই বলতে হবে।

স্বরান্ত অর্ধব্যঞ্জন কটি কবিতায় মুক্তদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, হসন্ত অর্ধব্যঞ্জন-গুলিও থেকে যাচ্ছে অনর্গল। কবিতাটিতে একটি চলমান তরণীর বর্ণনা আছে বলেই কি কবিতার ধ্বনিপ্রবাহে সম্পূর্ণ রুদ্ধদলের সংখ্যা এত কম?

চার.

স্বরধ্বনির তালিকা রচনাতে উচ্চারণরীতিবৈশিষ্ট্যে সংবৃত, অর্ধসংবৃত, অর্ধবিবৃত, বিবৃত ক্রমে প্রতি স্তবকে ব্যবহৃত স্বরের হিসেব লিখব।

উচ্চারণবীতি

	স্তবক	১	২	৩	৪	৫	৬
সংবৃত	ই	২৮	১৬	২৬	১৫	১৮	১৯=১২২
	উ	১৫	১১	৫	৭	৭	৬= ৫১
		৪৩	২৭	৩১	২২	২৫	২৫=১৭৩
অর্ধসংবৃত	এ	২১	১৮	১৭	২৪	১৮	২০=১১৮
	ও	২৩	২৭	২২	২২	২৭	২৫=১৪৬
		৪৪	৪৫	৩৯	৪৬	৪৫	৪৫=২৬৪
অর্ধবিবৃত	অ্যা	১	১	৩	১	২	০= ৮
	অ	১	১৮	১৮	১৪	১২	১৯= ৮২
		২	১৯	২১	১৫	১৪	১৯= ৯০
বিবৃত	আ	১৭	১৭	২০	২৬	২৬	২৮=১৩৪
	আঁ	০	১	০	১	০	১= ৩
		১৭	১৮	২০	২৭	২৬	২৯=১৩৭

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার মোট স্বরধ্বনি সংখ্যা ৬৬৪। এর ভিতরে ১১৩টি স্বর কোনো-না-কোনো হসন্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে বসে আপন মুক্তগতিতে বাধা পেয়েছে। অর্থাৎ এই ১১৩টি স্বরধ্বনি রুদ্ধদলের প্রারম্ভে সংস্থিত। বাকি ৫৫১টি স্বর মুক্ত সিলেব্‌ল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কবিতায় ই আর উ এই দুই সংবৃত স্বর রয়েছে ১৭৩টি, অর্ধসংবৃত এ আর ও ২৬৪টি, অর্ধবিবৃত অ আর অ্যা ৯০টি, বিবৃত আ আর আঁ ১৩৭টি। হিসেব করে

দেখা যাচ্ছে বিবৃত আর অর্ধবিবৃত ১৩৭+৯০=২২৭টি ধ্বনির তুলনায় সংবৃত আর অর্ধসংবৃত ধ্বনি অনেক বেশি— ১৭৩+২৬৪=৪৩৭টি। মুক্তদল ব্যঞ্জন ব্যবহারের দিক থেকে কবিতাটির মুক্তগতি চলনে স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভব সত্ত্বেও, উষ্মধ্বনির আধিক্য এবং সংবৃত স্বরধ্বনি ব্যবহারের আধিক্যের বিচারে কবিতার আত্মায় ক্ষোভ ও সংবৃতিজনিত চাপের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। উচ্চারণরীতির দিক থেকে সংবৃত স্বরধ্বনিতে সংবরণের ভাব প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক।

স্বরধ্বনি-বিন্যাসের স্তবকভিত্তিক সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— প্রথম দিকে সংবৃত স্বরধ্বনির ব্যবহার যত বেশি ছিল, শেষদিকে তা কমে এসেছে। আবার অর্ধসংবৃত ধ্বনির সংখ্যা পূর্বাপর মোটামুটি কাছাকাছি রয়েছে। বিবৃত ধ্বনির সংখ্যা, তুলনায় সবচেয়ে বেড়ে গেছে। অর্ধবিবৃত ধ্বনির ভিতরে অ্যা-ধ্বনির ব্যবহার সামগ্রিকভাবে বাংলাভাষাতে যেমন[৩২৮] এখানেও তেমনি বিরল। প্রথম দিকে যা ছিল, তা থেকে বেড়ে-কমে-বেড়ে শেষ স্তবকে অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু অপর অর্ধবিবৃত ধ্বনি অ ১টি থেকে শুরু করে শেষ স্তবকে পৌঁছে হয়েছে ১৯টি। শেষ স্তবকের স্বরধ্বনিগুলির ভিতরে বিবৃত আ সংখ্যাগরিষ্ঠ। উচ্চারণরীতির দিক থেকে বিবৃত স্বরধ্বনিতে মুখবিবরের সর্বাধিক উন্মোচন বলে এ ধ্বনিতে সংবৃতি-জনিত চাপ থাকে না। শেষ স্তবকে বিবৃতধ্বনির সমধিক ব্যবহার থেকে ধারণা হয়, কবিতার পূর্ববর্তী স্তবকগুলির প্রশ্নের চাপ আর উৎকণ্ঠা শেষপর্যন্ত বহুল পরিমাণে বিমোচিত হয়েছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও, রহস্যময়ীর ব্যবহার থেকে ক্রমে উপচিত বিশ্বাসের দরুন উপসংহারে উষ্মধ্বনির দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই কবিকে বুঝে নিতে হচ্ছে 'কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না / নীরব হাসি'।

আবেগের চাপ আর অনিবার গতি— দুয়ে মিলে জীবনযাত্রার জটিলতাকেই কি নির্দেশ করে না এ কবিতার স্বরভঙ্গি? উপস্থিত নৌযাত্রায় কবি বা সৌন্দর্য-উৎসুক শিল্পীর জীবনযাত্রার বিচিত্র টানাপোড়েনের সুর বাক্ধ্বনির বিন্যাসের ধরনে বেজে উঠেছে। কবিতায় বলা আছে— তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ, / কখনো রবি কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো / শান্তছবি'।

মুক্তগতির জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ উষ্মধ্বনি বাধা নয় এই কবিতায়। সমুদ্রে প্রবাহিত স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে, অন্তরীক্ষে বাতাসে বয়ে চলেছে হুতাশের শ্বাস— 'হুহু করে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস'। উপর্যুপরি প্রশ্ন— তরঙ্গের পর তরঙ্গে তার উদ্‌বেলতা, আর অপর পক্ষের নির্বিকার উজ্জ্বল হাস্যের স্থির প্রতিভাসে, মুগ্ধ বিস্ময়বশে

আবেগের ক্ষণিক শান্তি। তারপর শেষ স্তবকের উপান্ত চরণে আবেগ নিবারণ করে নিয়তির মত-নির্দিষ্ট সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ— 'কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না / নীরব হাসি'। যতক্ষণ উত্তর মেলে নি, প্রশ্নের ধাবমান স্রোত চলেছে সংবৃতধ্বনির চাপা টানে আশা ধরে রেখে। শেষে 'না' শব্দের আ-কার সকল আশা পরিহার করে বিরাম মানল।[৩২৯] এই বিরামে আবেগমুক্তির প্রশান্তি।

পাঁচ.

কিছু পুনরুক্তি-দোষের সম্ভাবনা স্বীকার করেই, এবার কবিতাটির বাচ্যার্থের আলোচনায় যাওয়া যাক। কবিতার দৃশ্যরূপও বাচ্যার্থবিচারে সহায়তা দেবে। কবিতা বলে, অভিধার সঙ্গে লক্ষণাও বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠবে।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটিতে, অস্তসূর্যের আভায় ঝলকিত জলরাশির উপর দিয়ে প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যার অভিমুখে অগ্রসরমাণ একটি তরণীর ছবি রয়েছে। তরীর আরোহী— পরিণাম-শঙ্কা-ব্যাকুল অথচ রহস্যবিমুগ্ধ এক যাত্রী। তরঙ্গচঞ্চল জলরাশির উপর দিয়ে ভেসে-চলা তরীর কর্ণধার রহস্যগুণ্ঠিত, এবং নিরুদ্‌বিগ্ন। কেশে বেশে আবেদনে ইনি নারী। যাত্রার লক্ষ্য বিষয়ে সুস্পষ্ট না জেনেও, যাত্রী তাঁর জীবনপ্রভাতে এই রমণীর মোহন সঙ্গ স্বীকাব করেছিলেন। এখন, সম্মুখে সূর্য অস্তগামী। দিগন্তে গোধূলির উজ্জ্বল আলোক-অবসানে সন্ধ্যা-অন্ধকারের আশঙ্কা যাত্রীকে ব্যাকুল করেছে। কিন্তু যাত্রার লক্ষ্য এবং পরিণাম সম্পর্কে, প্রভাত থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাত্রীর প্রশ্নের জবাবে রমণী, কখনো কখনো আদিগন্ত-বিস্তৃত পথের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করলেও নীরব, অথচ আবার রহস্যমধুব হাস্যে উদ্‌ভাসিত।

কবিতার দৃশ্যপটে উজ্জ্বলতা আছে— পশ্চিমদিগন্তে সূর্যাস্তের সোনার রঙে, সেই বর্ণে রঞ্জিত সন্নিহিত সাগরে হিরণ্ময় তরণীতে, আর রমণীর হাসিতে। বিপরীতে অন্ধকার রয়েছে— বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভয়াবহতায়, আর নৌকারোহীর অন্তরে লালিত স্বপ্নের পরিণামের অনিশ্চয়তা এবং জীবনসন্ধ্যার আসন্নতার অনুভবে।

শেষ স্তবকের ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার জানিয়ে দেয়— এই আশঙ্কা-ক্ষুব্ধ ভাবনাপ্রবাহের উপর দিয়ে তরণী ভেসেই চলবে। তাই অন্ধকার-কবলিত অবস্থাতেও জলের কলধ্বনি বাজতে থাকবে কানে। যাত্রীর কাছে অজ্ঞাত— কাণ্ডারীর অভিপ্রেত লক্ষ্যের অভিমুখে তরীর চির-চলা। জীবননিশার ঐ

অন্ধকারেও রমণীর দেহসৌরভে আর বায়ুতাড়িত কেশস্পর্শের আভাসে নায়ক জানবেন, তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা আছেন পাশেই, তরীর কর্ণ তাঁরই হাতে। কেবল, যে নয়নের আলোক তাঁকে এই যাত্রায় প্রেরণ করেছিল— যে স্থির হাসি সমস্ত জীবন তাঁকে মুগ্ধ বিস্মিত করে টেনে আনল— অন্ধকারে তা দৃষ্টির অগোচর হবে। রহস্যময়ীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্যে যাত্রীর ব্যাকুলতা তখন বেড়ে উঠবে আরো। তবে কবিতার শেষে সুদীর্ঘ জীবনযাত্রায় লব্ধ প্রজ্ঞায় ইনি জেনেছেন— এ-ই তাঁর বিধিলিপি— রহস্যাবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের আকর্ষণে অজানা সৌন্দর্যলোকের অভিমুখে চিরপথিক ভূমিকা তাঁর।

জীবনপ্রভাত আর জীবনসন্ধ্যাব উল্লেখে মনে হয়, মৃত্যুর অন্ধকারের গভীরেও অনিঃশেষ যাত্রার কথা বলা হয়েছে। জীবনেমরণে— অবিচ্ছেদে সৌন্দর্যের তটের দিকে কবির অভিযাত্রা।

সৌন্দর্যের তটের কথা বলতে গিয়ে উপস্থিত কবিতায় কল্পিত পটভূমি-বহির্ভূত একটি দৃশ্য আকস্মিকভাবে কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে স্থান নিয়েছে। সে দৃশ্য সৌন্দর্য-বিষয়ে কবির পূর্ববর্তী এক কবিতার ভাবনাকল্পনার সঙ্গে এই কবিতার যোগ স্থাপন করেছে। 'ঝলিতেছে জল তরল অনল / গলিয়া পড়িছে অম্বরতল / দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি / অশ্রুজলে'— এই কল্পনার ছবিতে তরণীর সম্মুখে প্রসারিত জলবাশির শেষে রয়েছে সূর্যাস্ত-আভায় অরুণ দিগন্ত। রহস্যময়ীর আবাসের ঠিকানা জানতে চেয়ে হঠাৎ ঐ ভূদৃশ্যের মাঝখানে 'মেঘচুম্বিত অস্তগিরি'ব ছবি টেনে আনা হয়েছে। এই কবিতার বুননের পটে ঐ গিরির আবির্ভাব আকস্মিক। যেন দৃশ্যরূপের ছন্দের শৃঙ্খলা-বিপর্যয়। এ ছবি তো 'ইন্দ্রনীল শৈলমূলে' অবস্থিত সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বাসভূমির! 'মেঘদূত' কবিতায় সৌন্দর্যের প্রতিমা যে বিরহিণীকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন কালিদাস-বর্ণিত গিরিনিবাসে— 'অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে / নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে / সুবর্ণ সরোজফুল্ল সরোবরকূলে / মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা / কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা'। কবিতার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে কবির পূর্বরচিত কাব্যের ইতিহাস জানবার নীতি না মানলে, স-তর্ক বিশ্লেষণে এই কবিতার অস্তগিরির দৃশ্যটিকে নিয়ে বিপদে পড়তে হয়। তাই মনে হয়, কবিতার রসাস্বাদনের জন্য সকল রকম পদ্ধতি অনুসরণ করে সকল ধারণার সংশ্লেষণ ঘটানোই বোধ করি সর্বোত্তম পথ।

লক্ষ করতে হবে, কবির গহন-বোধেব ছন্দ এখানে আপাত-বিশৃঙ্খল গূঢ়তর

ছন্দে তাঁর উপলব্ধির অতীত আর বর্তমানকে রূপের বন্ধনে বেঁধে নিল। উপস্থিত কবিতার সীমায় এই দৃশ্যবিপর্যয়ের যুক্তি মিলবে না। যদিও কবিতার গীতিময় ধ্বনির অনিবার্য প্রবাহ এমন টেনে নিয়ে যায় যে, সাধারণভাবে 'অস্তগিরি'কে এ দৃশ্যপটের আকস্মিক বাধা বলে খেয়াল করবার অবকাশ মেলে না। কিন্তু বোধকে ভাষায় ব্যক্ত করবার পথ পরিহার করে, কবি অস্তগিরির দৃশ্যরূপের ইঙ্গিতে আপন 'আত্মার ইতিহাস'কে পূর্বাপর সম্পর্কিত করেছেন।

যাই হোক, অন্তিম স্তবকের পূর্ব পর্যন্ত কবিতাটির বৈশিষ্ট্য— নিরন্তর প্রশ্নের অস্থিরতা। তার সঙ্গে আছে অপরিচিতার নীরব-মধুর হাসির কথা— যা কবিকে কখনো বিচলিত, কখনো কুতূহলী, কখনো-বা আশ্বস্ত করে টেনে নিয়ে চলে যাত্রাপথে। অপরিচিত সঙ্গ পরিহার করবার কথা ওঠে না, কাবণ, মাধুর্যে সম্পন্ন স্থির হাসিতে একরকম প্রাপ্তি ঘটে যায়। সে প্রাপ্তি অপরপক্ষের নীরবতায়-সম্ভব অশান্তি লাঘব করে বলে কবির চলার আকর্ষণ হয় অশেষ। সমগ্র জীবন-কাল পার হয়ে জীবনসন্ধ্যাতেও তরী যদি কূলে নাও ভেড়ে, শেষপর্যন্ত কবি সেই মোহিনী কর্ণধারের দেহগন্ধ আর কেশস্পর্শের রোমাঞ্চ সম্বল করেই নিয়ত ভেসে চলবার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অন্যপক্ষের নির্বিকারতা যাত্রীর উচ্ছ্বাসকে নিঃসন্দেহে প্রতিহত করে, তবু সেই অটল-নীরব মাধুর্যপ্রসারী অভিভবে কবি আপনাকে সমর্পণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যের স্বরূপ-সন্ধানমূলক কবিতার ধারায় 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পূর্ববর্তী প্রধান কবিতাগুলির শেষে কবির প্রশ্ন, ক্ষোভ আর ক্ষোভশান্তির প্রার্থনা জেগে থেকেছে। 'মেঘদূত'-এর শেষে সৌন্দর্যস্বরূপ আর সন্ধানীর নিত্য বিচ্ছেদ কবিকে অশান্ত প্রশ্নে ব্যাকুল করে— 'কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান? / কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ? কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?…'। 'সোনার তরী' কাব্যের প্রথম তরণীটিতে কবির স্থান সংকুলান হয় না, ক্ষুব্ধ কবি পরিত্যক্ত হন 'শূন্য নদীর তীরে'। 'মানসসুন্দরী'র শেষে বেদনাবিদ্ধ কবি প্রার্থনা করেন— 'এসো সুপ্তি, এসো শান্তি; / এসো প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি; / বক্ষে মোরে লহ টানি— শোয়াও যতনে / মরণসুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতিশয়নে।' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র শেষে সেই ক্ষোভ আর হতাশার পরিবর্তে ভাগ্যের অনিবার্য গতি বিষয়ে কবির প্রাজ্ঞতার বোধ পূর্বের কবিতাগুলির চেয়ে এ কবিতায় তাঁর পরিণত ভাবনার প্রশান্তি প্রতিফলিত করে।

ছয়.

আমরা বলেছি, কবিতাটিতে উদ্‌বেগ-ব্যাকুলতা সত্য, কিন্তু আরো সত্য অস্থিরতার উপরে স্থির প্রতিমা-সৌন্দর্যের প্রশান্ত উদ্‌ভাস। বাঙ্‌ময়ী না হলেও, নিয়তিস্বরূপিণী আভাসময়ী। কবিতাটির তিন স্তবকে বিন্যস্ত ইংরেজি অনুবাদেও রবীন্দ্রনাথ এই হাসির আশ্বাসের কথা ঘুরে ফিরে এবং বিস্তৃত করে বলেছেন। 'The silence of thy smile fell on my question like / The silence of sunlight on waves.' 'No answer came from thee, only thine eyes smiled like / The edge of a sunset cloud.' 'Thy smile shines in the heart of the hush like the / Star-mist of midnight.'[৩২৮]

Creative Unity বইয়েতে 'The Poet's Religion' প্রবন্ধে ইংরেজি অনুবাদটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করে রবীন্দ্রনাথ বুঝাতে চেয়েছেন— 'In the poet's religion we find no doctrine or injunction, but rather the attitude of our entire being towards a truth which is ever to be revealed in its own endless creation.'[৩২৯] জীবনযাত্রার সকল ক্লান্তি, ক্লেশ, বিড়ম্বনা সত্ত্বেও বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে চারপাশ ঘিরে— তার অমৃত-প্রভাব নিয়ে। 'But all this has not the definiteness of an answer ; it has only the music that teases us out of thought as it fills our being.'[৩৩০]

ধ্বনিগতভাবে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় ঐ music এসেছে অনুপ্রাসের বিন্যাসে, নাসিক্য ব্যঞ্জনের কোমলতার বহুল প্রয়োগে, তরল পার্শ্বিক ধ্বনি ল-য়ের ব্যবহারে, কম্পনজাত ধ্বনির ঝংকারে আর মুক্তধ্বনির অবারিত স্রোতে।

সাত.

অবিরল অনুপ্রাস-ঝংকার এই কবিতার ধ্বনিকে কতখানি গুঞ্জনমধুর করেছে, তার খানিক পরিমাপ করা যাক। ন ল র শ ব্যঞ্জনধ্বনি বা ই উ এ স্বরধ্বনির অনুপ্রাস যদি-বা কানে বাজে, পায়ে পায়ে বেজে-চলা ছোটোখাটো অনুপ্রাসগুলোর দিকে আমাদের তত নজর পড়ে না। চলার ঝোঁকে আমরা সেগুলোকে কিছু অবহেলাই করি। কিন্তু, 'তবুও তাহারা / প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর, / ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর'।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় প্রায়শ মধ্যমিল রয়েছে, আবার সর্বত্র নেই বলে, প্রত্যাশা ছাড়াই পেয়ে যাওয়াতে শ্রবণ নন্দিত হয়। 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে', 'বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার', 'ঝলিতেছে জল তরল অনল', 'বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়', 'আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি', 'আঁধার রজনী আসিবে এখনি'…। পরপর দুই পঙ্‌ক্তিতে অথবা একই পঙ্‌ক্তিতে অপ্রত্যাশিত স্থানেও এমন মিল স্বরে বেজে উঠেছে- 'ভিড়িবে তোমার / সোনার', 'ডুবিছে তপন / গগন', 'হোথায় কি আছে আলয়', 'মেঘচুম্বিত অস্ত', 'সংশয়ময়', 'ঘননীল নীর', 'পশ্চিম পানে অসীম', 'নবীন জীবন / আশার স্বপন', 'আছে কি সুপ্তি / তিমির', 'জল-কলরব', 'সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক', 'বিকল হৃদয় বিবশ শরীর', 'করহ পরশ'। একই বা একই ধাঁচের বাক্যাংশের প্রত্যাবৃত্ত মিলও কবিতাতে রয়েছে। যেমন—'তারি 'পরে' 'তারি 'পরে' 'তারি মাঝে', 'আছে কি' 'ফলে কি', 'কখনো রবি / কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো', 'আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি', 'শুধু ভাসে', 'শুধু কানে আসে'…। একটানা মুক্ত ধ্বনির বিন্যাস বা মুক্ত-রুদ্ধ-দলের বিশেষ সজ্জায় তৈরি প্যাটার্নেও ধ্বনির ছন্দগীতি রচিত হয়েছে। কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির আরম্ভেই 'আর' পদের রুদ্ধদলের পরে মুক্তধ্বনির ধারা ছুটেছে 'কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে' প্রশ্নের টানে। এমন চলমান মুক্তধ্বনির উদাহরণ— 'বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে', 'তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে / কথা না বলে', 'হুহু করে বায়ু ফেলিছে সতত', 'তীর' পদের রুদ্ধতায় ঠেকবার আগে পর্যন্ত— 'কোনোদিকে চেয়ে নাহি হেরি',— এরকম শেষ দলে রুদ্ধ-মুক্ত-ধ্বনিপঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত ঢের আছে। পরপর একটি মুক্ত আর একটি রুদ্ধ ধ্বনিসন্নিবেশে আবর্তিত প্যাটার্ন— 'এখন বারেক শুধাই তোমায়', 'বিকল হৃদয় বিবশ শরীর'। ধ্বনিনিক্কণ এই কবিতার আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য বলে উদাহরণ সংকলনে ক্লান্ত হতে হয়।

এই-সব ধ্বনিকে শৃঙ্খলা দিয়ে প্রবাহিত করেছে তানময় মাত্রাবৃত্তের কলছন্দ। প্রথমাবধি কবিতার অন্তঃস্বরটিকে গুঞ্জিত করে-চলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দস্রোত নায়কের সংবেদী চিত্তের নিত্য সন্ধানকে গতিময় করেছে, যে গতি স্বভাবগত গীতিধর্মে বিষাদের কুহেলি অগ্রাহ্য করে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হতে পারে।

স্বরধ্বনিতে সংবৃতি থেকে বিবৃতি, উষ্মতার দীর্ঘশ্বাস সত্ত্বেও ব্যঞ্জন উচ্চারণে মুক্তদলের প্রাধান্যযুক্ত মাত্রায় আবৃত্ত চলনের অগ্রসরণ,— বাক্‌ধ্বনি আর ছন্দের সমাবেশ সব মিলিয়ে চিন্তাপ্রবাহের দুই গতিকে ধরে রেখেছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।

জীবনেব গতির নানামুখিতা ধ্বনিমালার পর্যাবৃত্তির ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে বিচিত্রগতি তরঙ্গময় জীবনের সমগ্রতাকে ধরবার চেষ্টা করেছে। বক্তব্যে আর ধ্বনিতে এই মিল বাক্‌ধ্বনির ভাববহনেব ক্ষমতার পবিচায়ক।

খ. "চম্পা" ও রূপান্তর

এক.

'কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিকা' বিষয়ের পবিধি নির্ধারণের সময আমরা 'চম্পা' কবিতার উল্লেখ কবেছিলাম। প্রসঙ্গ ছিল— মূল ছন্দ বজায বেখে শুধু ভাষার পরিবর্তন করলেও কবিতার মূল স্বর বিঘ্নিত হয়। এবার আমবা মূল কবিতা, পূর্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত তার ভাষান্তরিত রূপ এবং ছন্দান্তরিত একটি রূপেব বিশ্লেষণ করে বুঝবার চেষ্টা করব— বাচ্যার্থ এক থাকা সত্ত্বেও এই-সব ধ্বনি অর্থাৎ শব্দ ও ছন্দোবিন্যাসের পরিবর্তনে কী করে ব্যঞ্জনার হেরফের ঘটে যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনার ধ্বনি ও ছন্দসজ্জা আমাদের ভিতরে কী বোধ সঞ্চারিত করে তা প্রথমে বুঝে নিতে হবে। উপক্রমে বাচ্যার্থের আলোচনা ছন্দ ও ধ্বনি-বিন্যাসের উপযোগিতা নির্ণয়ে সহায়তা করবে।

গ্রীষ্মেব দাবদাহ যখন অপ্রতিহত তেজে জলস্থল শোষণ করে চতুর্দিকে শুষ্কতা বিস্তার করছে— সেই প্রতিকূল পরিবেশে কিঞ্চিৎ ত্রাসে কিঞ্চিৎ উল্লাসে শিহরিত চম্পার বিকাশ। সূর্যকরের প্রহারে মূর্ছিত কলেবর অথচ মোহমুগ্ধ চম্পা আপনাতে সূর্যসঞ্চারিত লাবণ্যের উচ্ছ্বাস অনুভব করতে করতে শেষে নিজেকে সূর্যের সৌরভ বলে পরিচয় দিয়ে দৃপ্ত গরিমায় সূর্য প্রণাম কবে।

৮+১০ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কবিতার গতিতে ধীরতা অনুভব করি। এই মন্থর-গম্ভীর গতি প্রতপ্ত পরিবেশে উদ্‌ভিন্ন চম্পার পবম গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির স্পন্দকে যোগ্যভাবে ধাবণ কবেছে।

কবিতাব পরিবেশ রচনায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছে উষ্মধ্বনি। গ্রীষ্মের উষ্মতা বহন করবার কাজে সমগ্র কবিতার ৩১৩টি ব্যঞ্জনের মধ্যে ৪২টি শ, ১১টি হ, ১টি স, ১টি অন্তঃস্থ ব, আর ১টি হ্ব ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে। মোট ৫৬টি উষ্মব্যঞ্জন। এর উপবে আবো আছে ১৭টি স্বরান্ত স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ, ১টি হসন্ত মহাপ্রাণ (শেষ চরণের 'সৌরভ' পদে) আর ১৭টি স্বরান্ত ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন। সবশুদ্ধ ৯১টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনির সহায়ে সামগ্রিক পরিবেশে উষ্মশ্বাসের প্রবাহ সঞ্চালিত হচ্ছে।

শ— এই কবিতার সর্বাধিক প্রযুক্ত ব্যঞ্জন। কিন্তু লক্ষ করতে হবে— প্রথম স্তবকে শ-য়ের সংখ্যা ১৭টি, দ্বিতীয়ে ১২, তৃতীয়ে ৮, চতুর্থে ৫। আর শেষ স্তবকে বেড়ে-ওঠা উষ্মব্যঞ্জন হ (প্রথম স্তবকে ৩, দ্বিতীয়ে ১, তৃতীয়ে ২, চতুর্থে ৫), প্রথম চরণের 'বাহিরিয়া' ছাড়া অন্য চরণে নাসিক্য ব্যঞ্জনের পরম্পর অনুপ্রাস এবং উক্ত ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্টতাব ফলে অনুনাসিকতার প্রভাবে হুতাশের স্থলে আবেগের সন্তাপ সৃষ্টি করেছে। 'মূর্ছে দেহ মোহে মন— মুহুর্মুহু করি অনুভব' পঙ্‌ক্তিতে হ-ধ্বনির উপরে ম-য়েব অনুনাসিকতার প্রভাবের ফলে চম্পার বিহ্বল মুগ্ধতার আবেশ ধ্বনিতে সংবাহিত হয়েছে।

মুহম্মদ আবদুল হাই Kymograph tracing-এর ভিত্তিতে পরীক্ষা করে নাসিক্য ব্যঞ্জনের এই জাতীয় প্রভাবের কথা তাঁর বইতে লিখেছেন। 'নিরুদ্দেশ যাত্রার ধ্বনি' প্রসঙ্গে সেই মত আমরা উদ্‌ধৃত করেছি। উপরে উদধৃত চরণটিতে 'দেহ' আর 'মোহে' এত সংলগ্নভাবে উচ্চারিত হয় যে, 'দেহ'-র হ-তে 'মোহে'-র ম-য়ের অনুনাসিক রণন সঞ্চারিত হয়ে যায়। কবিতার শেষভাগে প্রধান দুটি উষ্মধ্বনির সংখ্যা হ্রাসে সে ধ্বনির প্রভাব-লাঘব থেকে কি ধারণা করা যায় যে, প্রথম দিকে শুষ্কতার প্রভাব প্রতিষ্ঠার পরে অন্য কোনো ভাবের প্রতি ধ্বনিগত নির্দেশ জেগে উঠছে?

কিন্তু শুধু শ আর হ ধ্বনিকে গণ্য না করে সকল উষ্মতাধর্মী ধ্বনিতে সন্নিহিত, নাসিক্য ব্যঞ্জনের প্রভাব জরিপ করে বাক্‌ধ্বনির অভিপ্রায় বুঝতে হবে। 'চম্পা'য় মোট নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংখ্যা ৬৯টি। ন ৩৬ ম ৩৩। প্রথম স্তবকে উষ্মতাধর্মী ধ্বনি আছে ২৫টি, নাসিক্য ব্যঞ্জন ১৫। তার ভিতরে 'ব**স**ন্তের অন্তিম নি**শ্বাসে**' আর 'বি**ষণ্ণ যখন**' বাক্যাংশের মোটা হরফে ছাপা ৬টি উষ্মধ্বনির উপরে নিকটবর্তী নাসিক্য ধ্বনির অনুরণন বিস্তৃত হয়েছে।[৩১] দ্বিতীয় স্তবকে উষ্মতাধর্মী ধ্বনি ২৫টি, নাসিক্য ব্যঞ্জন ২১। 'বনানী**শোষ**ণ', 'বিম**র্ষ**কুঞ্জে', '**শো**না', **জ**ন্ম-**য**বনিকা', '**শূ**ন্য' পদগুলিতে ৮টি উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনে নাসিক্য ব্যঞ্জনের অনুরণন সঞ্চার হচ্ছে। তৃতীয় স্তবকে ১৯টি উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জন, নাসিক্য ব্যঞ্জন ১৬টি। এ স্তবকে '**স**ম' আর 'মুহ্যমান' (মু**জ্‌ঝো**মান) পদ দুটিতে ৩টি উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনে নাসিক্য ব্যঞ্জনের মাধুর্য-প্রভাব রয়েছে। চতুর্থ স্তবকে উষ্মধ্বনি ২০টি, নাসিক্য ব্যঞ্জন ১১টি, 'দে**হ** মো**হে**', 'মু**হু**র্মু**হু**' 'নম**স্কা**র'— পদের ৫টি উষ্মতাবাহী ব্যঞ্জনে নাসিক্য ব্যঞ্জনা বিস্তৃত হয়েছে। এ ছাড়া কবিতায় পাশাপাশি বিন্যস্ত পদে সংলগ্ন-প্রায় উচ্চারণে কোথাও কোথাও নাসিক্য

ব্যঞ্জনের গুণ সম্প্রসারিত হয়ে থাকতে পারে। 'দেখিলাম **জলস্থল**', 'শূন্য **শুষ্ক**', 'তনু-**ভরি**' ইত্যাদি অংশ বিবেচ্য। এই বিবেচনার কথা ছেড়ে দিলেও আলোচিত ২২টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনিতে মাধুর্য-প্রভাবেব তথ্য লক্ষ কববার মতো। ৬৯টি নাসিক্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে ঐ ২২টি নাসিক্যগুণান্বিত ধ্বনি যোগ করলে ৯১টি মাধুর্যবিস্তারী ধ্বনি ৯০টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনিকে ছাপিয়ে যায়।

আমরা নাসিক্যগুণকে উষ্মতায় অন্য ধর্ম আরোপের উপাদান হিসেবে দেখছি বলে, ত দ র ইত্যাদি অন্য-সব ধ্বনিতে সঞ্চারিত নাসিক্যগুণেব আলোচনায় প্রবেশ করলাম না।

আর-একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, নাসিক্য ব্যঞ্জনের মাধুর্য-প্রভাবেব জন্যে উষ্মতাধর্মী ধ্বনির উষ্মতা নিবারিত হয় না; কিন্তু, উষ্ম শ্বাসবাযুব সঙ্গে মাধুর্যের যোগ তাপ-জর্জর চম্পার হৃদয়ে মুগ্ধ আবেশের জন্ম সূচনা করে। সাহসিকা চম্পা খরতাপে বিশুষ্ক না হয়ে সূর্যের বিভূতি পান করে লাবণ্যে পরিপূরিত হয়ে ওঠে। লাবণ্যবতী চম্পার সেই অন্তর-মাধুর্যই নাসিক্য ব্যঞ্জনার সঞ্চরণে কবিতায় ব্যবহৃত অতগুলি উষ্মধ্বনিকে মাধুর্যগুণান্বিত করে তোলে। সমগ্র কবিতায় উষ্মধ্বনি আব নাসিক্যধ্বনির এই সমান্তরাল প্রাধান্য এমনিভাবে কবিতার মূলস্বরের তাৎপর্যটি বহন করেছে।

'চম্পা' কবিতায় র-ব্যঞ্জন আছে মোট ৩০টি, রেফের খণ্ড র ৯টি। নির্মম, মর্মরি, বিমর্ষ, জর্জর, আশীর্বাদে, মূর্ছে, মুহুর্মুহু, সূর্যের, সূর্যেরি— এই-সব পদে ব্যবহৃত খণ্ড র তথা রেফ, আর র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন এই কবিতায় বলিষ্ঠতা সঞ্চার করেছে। রেফযোগে 'পৌরুষ' ধ্বনিত হবার কথা আমরা ব্যঞ্জনধ্বনিচরিত্র প্রসঙ্গে বলেছি। র-ফলাযুক্ত শব্দের পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বা উচ্চারণ-প্রাক্‌কালীন দীর্ঘ অবরোধের পর র-য়ের সঙ্গে একত্র মোচন এই যুক্তবর্ণের উচ্চারণে দৃঢ়তার শক্তি প্রকাশ করে। যুক্তবর্ণে গুরুত্ব বা জোরের প্রকাশ সম্পর্কে স্নুনীতিকুমারের উক্তি সংকলন করছি। **'Length of consonants commonly described as "doubling", often serves to distinguish words in Bengali, and is thus of considerable importance.'**[৩৩২] 'বাঙ্গালায় বিশেষ জোর দিয়া বলিতে হইলে, ক্বচিৎ শব্দ-স্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিকে দীর্ঘ বা দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়, যথা— «সকলে— সক্কলে, সবাই— সব্বাই, তখনি— তক্ষনি (তক্‌খনি)…»।'[৩৩৩] অর্থাৎ

দ্বিত্ব উচ্চারণে জোর বা বল প্রকাশ হয়। গ্রীষ্মের, রুদ্র, ত্রাসে, প্রান্তে, নেত্র, উগ্র, রৌদ্র পদগুলিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দশোভন বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে।

র-ধ্বনি প্রলম্বিত স্বভাবের ফলে হসন্ত অবস্থাতেও ভাষার ধ্বনিপ্রবাহকে সম্যক্ রোধ করে না। তাছাড়া র-য়ে আছে স্ফূর্তির ভাব। র-য়ের ব্যবহার এই কবিতার গতিবিধানে এবং নিহিত স্ফূর্তি ধারণে কার্যকর হয়েছে।

কোমল, মধুর, ললিত, সুকুমার ল এই কবিতায় আছে ১৪টি। 'চম্পা'র ললিত সৌকুমার্য ধারণ করতে 'আধেক উল্লাস' আর 'লাবণ্য' নির্দেশক এই-সব ধ্বনি সহায়তা দিয়েছে।

অঙ্গগঠনের উপাদান হিসেবে পরিচিত অবরোধক ধ্বনিগুলির ভিতরে এ কবিতায় ব ব্যবহৃত হয়েছে সবচেয়ে বেশি— ২৬টি। তারপরে ত ২৪টি, ক ১৮টি, দ ১২টি, প ৯টি, গ ৪টি, ট ২টি। হসন্ত ঘৃষ্টধ্বনিগুলিকেও স্পৃষ্ট অবরোধকের পর্যায়ে ফেলে দেখতে হবে। হসন্ত জ আছে ৪টি— 'জর্জর', 'মুহ্যমান', আর দুটি 'সূর্য' উচ্চারণের রেফের পরবর্তী রুদ্ধ জ-য়ে। হসন্ত চ আছে ১টি— 'মূর্ছে' উচ্চারণে রেফের পরে। মোট ৫টি হসন্ত ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন। উপাদান জাতীয় ধ্বনি সর্বমোট ২০০টি। তার মধ্যে ব দ গ জ ধ্বনি কটি ঘোষতার ফলে কোমল নাদ ধ্বনি। ২৬+১২+৪+৪=৪৬টি কোমল নাদ ধ্বনিতে 'চম্পা'র গঠন-সৌকুমার্য ধরা পড়ছে। ত-ধ্বনিও কোমলতা প্রকাশক, আমরা জানি। ফলে ৪৬টি ঘোষধ্বনির সঙ্গে ২৪টি ত মিলে ৭০টি ধ্বনি 'চম্পা'র কমনীয় অঙ্গের উপযোগী উপাদান হয়েছে। বাকি ৩০টি রয়েছে উপাদানধর্মী অন্য ব্যঞ্জন।

দুই.

অর্ধস্বর বা ব্যঞ্জন এই কবিতাটিতে আছে মাত্র ৪টি। ২টি স্বরান্ত, ২টি ব্যঞ্জনান্ত। স্বরান্ত দুটি ই্ রয়েছে তৃতীয় আর চতুর্থ স্তবকে একবার করে ব্যবহৃত 'বাহিরিয়া' শব্দের শেষভাগে। হসন্ত ২টি উ আছে 'রৌদ্র' আর 'সৌরভ' শব্দের প্রথম অংশে। এই চারটি অর্ধব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাতাস খানিকটা চাপ খায় বলে এই ধ্বনি কটিতে ঈষৎ উষ্মতা প্রকাশ পাবার কথা। অর্ধস্বর বা ব্যঞ্জন কটিকে কবিতায় উষ্মতাগুণের সহায়ক বলে গণ্য করা যায়।

তিন.

এবার 'চম্পা' কবিতার স্বরধ্বনি ব্যবহারক্রম উল্লেখ করব। সর্বোচ্চ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন সংখ্যার দিকে গেলে— এ কবিতায় ও ৫৬টি, আ ৪৯টি, ই ৪৪, এ ৩৮, অ ৩৩, উ ২৯, এবং অ্যা ২টি। রবীন্দ্রনাথ (রামেন্দ্রসুন্দরও, ভাষান্তরে) বলেছিলেন অ আ ই উ ধ্বনি কটি আমাদের ভাষায় 'সুর লাগাইবার কাজে' আছে। অর্ধসংবৃত এ আর ও, আব অর্ধবিবৃত অ্যা-কে তাঁরা গণনায় আনেন নি। উপস্থিত কবিতায় অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি দুটিকে অন্ততপক্ষে সংখ্যার দিক দিয়ে তুচ্ছ করবার উপায় নেই। কবিতাটির বিবৃত স্বরের সংখ্যা ৪৯, আর অর্ধবিবৃত অ অ্যা ৩৫। তার পাশে অর্ধসংবৃত এ ও ৯৪টি। সংবৃত ই উ স্বরও সংখ্যায় অনেক, একত্রে ৭৩। স্বতন্ত্র হিসেবে বিবৃত আ-ধ্বনি যদিও অর্ধসংবৃত ও-ধ্বনির পরেই স্থান পায়। তবু সামগ্রিক হিসেবে 'আধ ত্রাস আধেক উল্লাসে'র পদক্ষেপে সংবৃত আর অর্ধসংবৃত ভাবই প্রাধান্য পাচ্ছে। নব উন্মীলনের দিক থেকে সংবৃত / অর্ধসংবৃত ভাব উপযুক্ত বলেই মনে হয়।

চার.

এবারে আমরা ছক কেটে এই কবিতাব দলবিন্যাসের হিসেব নেব।

মু ক্ত দ ল

	প্রথম পঙ্‌ক্তি	দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি	তৃতীয় পঙ্‌ক্তি	চতুর্থ পঙ্‌ক্তি	মোট
প্রথম স্তবক	১১	৮	১১	১৫	=৪৫
দ্বিতীয় স্তবক	১০	১০	১৩	৫	=৩৮
তৃতীয় স্তবক	১২	১৭	৯	১৩	=৫১
চতুর্থ স্তবক	১৩	১২	১৪	১০	=৪৯
					সর্বমোট=১৮৩

রু দ্ধ দ ল

	প্রথম পঙ্‌ক্তি	দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি	তৃতীয় পঙ্‌ক্তি	চতুর্থ পঙ্‌ক্তি	মোট
প্রথম স্তবক	৫	৭	৫	২	=১৯
দ্বিতীয় স্তবক	৫	৬	৪	৯	=২৪
তৃতীয় স্তবক	৪	১	৭	৩	=১৫
চতুর্থ স্তবক	৩	৪	৩	৬	=১৬
					সর্বমোট=৭৪

মুক্তদল ১৮৩টি, রুদ্ধদল ৭৪টি। দ্বিতীয় স্তবকে রুদ্ধদলের সংখ্যা তুলনামূলক-ভাবে বেশি। এই স্তবকটিতে নবোদ্‌ভিন্ন চম্পা তার বিকাশক্ষণের ক্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবৃত করেছে। পরিস্থিতি সহজ নয় বলেই পদক্ষেপ এখানে বাধাযুক্ত। তৃতীয় স্তবকে মুক্তদল সর্বাধিক, রুদ্ধদলের তিনগুণেরও বেশি। এই স্তবকে পর্যুদস্ত না হবার আত্মবিশ্বাস ঘোষিত হয়েছে, 'উগ্র মদ্যসম রৌদ্র' সহজেই পান করছে চম্পা। সেই সহজ চলা অবাধ গতি পেয়েছে মুক্তদলে। শেষ স্তবকেও মুক্তদলের সংখ্যা রুদ্ধদলের তিনগুণের বেশি। এই স্তবকটিতেই পূর্ণ বিকশিতা চম্পা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে 'সূর্যেরি সৌরভ' বলে নিজের পরিচয় জানাচ্ছে। মুক্তদল-প্রধান প্রথম স্তবকে চম্পা মোটামুটি স্বচ্ছন্দগতি হলেও দ্বিতীয় স্তবকের পরিবেশ তার চলার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তৃতীয় আর চতুর্থ স্তবকে বাধা জয় করে চম্পা স্বচ্ছন্দ গতি পেয়েছে। অর্থাৎ প্রতি স্তবকে ভাবের বিকাশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দলবিন্যাস হয়েছে। কিংবা বলা যায়, বক্তব্য বিষয় আর ভাষাধ্বনি অন্যোন্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে ভাবব্যঞ্জনার সহায় হয়েছে।

আরো একটি হিসেব দেখবার আছে। সমগ্র কবিতায় সম্যক্ রুদ্ধদল কটি পাওয়া যায়? প্রথম স্তবকের 'রুদ্র' আর 'আধেক' পদে ২টি, দ্বিতীয় স্তবকের 'একবার' 'বারেক' 'নেত্র' 'জর্জর' পদে ৪টি, তৃতীয় স্তবকের 'উগ্র' 'মদ্য' 'রৌদ্র' 'মুহ্যমান' 'আশীর্বাদে' পদের ৫টি, চতুর্থ স্তবকের 'আতপ্ত' 'মূর্ছে' 'অনুভব' 'সূর্যের' 'সূর্যেরি' পদের ৫টি। 'সৌরভ' উচ্চারণ শেষের মহাপ্রাণধ্বনিজাত উষ্মতার জন্য হসন্ত ভ ধ্বনিটিকে গণনা থেকে বাদ দেব। সমস্ত কবিতার মধ্যে একুনে ১৬টি সম্যক্‌ভাবে রুদ্ধদল পাওয়া যাচ্ছে। এই হিসেব থেকে বোঝা যায়— এই কবিতায় গুরু-গম্ভীর আত্মোপলব্ধির প্রসঙ্গ, এবং সকল প্রতিকূলতা জয় করে মাথা তুলে দাঁড়াবার কঠিন সংকল্প থাকলেও, অন্তর্লীন মাধুর্যে মূলস্বর স্বচ্ছন্দ মুক্তগতি পেয়েছে। সকল প্রতিবন্ধ অঙ্গীকার করে সত্তার লাবণ্যময় বিকাশই 'চম্পা'র মূলস্বর— ধ্বনিবিন্যাস-বৈশিষ্ট্য সে কথাটি জানিয়ে দেয়।

পাঁচ.

অনুপ্রাসরসিক সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতার অনুপ্রাসগুলি লক্ষণীয়ভাবে নিম্নকণ্ঠ। বলা যায়, কবিতাটির গম্ভীর চাল বা ছাঁদ অনুপ্রাসগুলিকে মোটামুটি গোপনসঞ্চারী রেখেছে। অর্থাৎ কবিতার ছন্দগঠন এর ধ্বনিঝংকারকে মৃদু করেছে। অথচ

হিসেব করলে অনুপ্রাস খুব কম আছে— বলা যাবে না।' 'ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে' চরণে ত শ ন -য়ের অনুনাদ। 'বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত' পদে ই-কার, শ আর ন-য়ের ছন্দোময় বিন্যাস। 'রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে' পঙ্‌ক্তিতে র আর শ-য়ের আবর্তন। 'আসিতে হল— সাহসিকা অপ্সরার মতো' অংশে শ-য়ের মতো ফিরে ফিরে আসছে ও-স্বরধ্বনি। ও-র অনুপ্রাস আছে দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম চরণেও— 'বনানী শোষণ ক্লিষ্ট মর্মরি উঠিল'। এখানে ন আর শ-য়ের ব্যবহারেও ঝংকার এসেছে। 'বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর'-এ, ক শ ন আর ও-স্বরধ্বনির আবর্তিত ধ্বনিঘাত। 'জন্ম-যবনিকা প্রান্তে মেলি নব নেত্র সুকুমার' পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে পরপর কটি ন আর র-য়ের লীলাময় সংঘাত। 'দেখিলাম জলস্থল, ···বিহ্বল'-এ ল-য়ের কলনাদ। ব-য়ের অনুপ্রাস 'তবু এনু বাহিরিয়া,— বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান' পদে। 'উগ্র মদ্যসম রৌদ্র,— যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান' চরণে যুক্তাক্ষর সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে ধ্বনিসাম্য। আরো আছে ও-ধ্বনির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার। 'ধীরে এনু বাহিরিয়া উষার আতপ্ত কর ধরি' উচ্চারণে র-য়ের মাধুর্যপূর্ণ প্রয়োগ। স্বরধ্বনি উ ও, আর ব্যঞ্জনধ্বনি হ-য়ের ধ্বনিসংগতি 'মূর্ছে দেহ, মোহে মন,— মুহুর্মুহু করি অনুভব' উক্তিতে। 'সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি' আবৃত্তি করতে অনুভব করা যায় ৪টি ত-ধ্বনিতে বিস্তৃত কোমল প্রভাব।

এখানে গোটা কবিতার ভিতরে কেবল দশম, দ্বাদশ আর ষোড়শ পঙ্‌ক্তি থেকে আমরা দৃষ্টান্ত দিতে পারি নি। কিন্তু, অন্যতর মিলের বিন্যাস এ-কটি চরণেও বিদ্যমান। যেমন দশম পঙ্‌ক্তির— 'ঝরিব না মরি', দ্বাদশ পঙ্‌ক্তির 'বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা', ষোড়শ পঙ্‌ক্তির 'সূর্যেরি সৌরভ'। শেষ দৃষ্টান্তটির স্বরান্ত ঘৃষ্ট জ-য়ের উষ্মতার পরে স্বরান্ত র, আর বিপরীত দিক থেকে 'সৌরভ'-এর উষ্ম-ধ্বনি আর স্বরান্ত র ব্যবহারেও মিল সৃষ্টি হয়েছে। মিলের আরো উদাহরণ রয়েছে, যেমন— 'ফুটিতে···বসন্তের', 'বিষণ্ণ···বিশ্ব···গ্রীষ্মের', 'ত্রাসে···উল্লাসে', দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম চরণের শেষে বিন্যস্ত 'একবার' সঙ্গে সঙ্গেই বিপরীত বিন্যাসে ফিরে আসছে পরবর্তী চরণের প্রথমে 'বারেক' পদে। 'শূন্য, শুষ্ক', 'ধীরে এনু বাহিরিয়া উষার আতপ্ত কর ধরি' ইত্যাদি দৃষ্টান্তক্রমে বলা যায়— সত্যেন্দ্রনাথ স্বধর্মচ্যুত না হয়ে, গতির ধীরতায় আমাদের নিবিষ্ট রেখে, আপন গীতিগুঞ্জনে আপনি আবিষ্ট থেকেছেন।

ছয়.

এবার একবার স্মরণ করা ভালো, কবি তাঁর সৃষ্টিকালে ব্যঞ্জনধ্বনি-স্বরধ্বনি-মুক্তদল-রুদ্ধদল-অনুপ্রাস ইত্যাদির এমন কর-গোনা হিসেব করেন, তা নয়। জীবনপথে চলতে চলতে প্রত্যেক মানুষের মনে তার আপন ভাবপ্রকাশের বাহন ভাষার ধ্বনি-বিষয়ে কিছু সংস্কার জমা হয়। কবিতা রচনার বিশেষ মুহূর্তে সেই-সব ধ্বনি কবির ভাবের আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে নির্বাচিত শব্দ ও তার সজ্জার ভিতরে স্বতঃই স্ফূর্ত হয়। আর, একই ভাষাভাষী মানুষের মনেও অনুরূপ সংস্কার থাকে বলেই— কবিতার ধ্বনিগত আবেদন তাদেরকে স্পর্শ করে। এবং, সেই অনুধাবনেও কর গুণবার দরকার হয় না। তবু, ভালো-লাগা কবিতার গঠনপ্রকৃতির ভিতরে কেমন করে তার মর্মবাণী বাঁধা পড়ে, তা বিশ্লেষণ করে দেখলেও কবিতার রসগ্রহণের সহায়তা হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি ?

সাত.

'কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিকা' প্রবন্ধে সন্নিবেশিত 'চম্পা' কবিতার একই ছন্দে বদ্ধ ভাষান্তরিত রূপটি এবার আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব। ছন্দোগত ঐক্যের ফলে কবিতার মূল গতির সঙ্গে এই রূপান্তরের মোটামুটি মিল থাকবার কথা। পূর্ববর্তী ঐ প্রবন্ধে আমরা পরিবর্তিত রূপটিতে আড়ষ্টতা আছে বলে উল্লেখ করেছি। ধ্বনিগতভাবে ঐ ধারণার মূলানুসন্ধান করা দরকার। ধ্বনি-ব্যবহার ও বিন্যাস, মুক্তদল ও রুদ্ধদল এবং অনুপ্রাস প্রয়োগের ভেদে মূলের সঙ্গে পার্থক্যের প্রকার বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক।

রূপান্তরে সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন র ৪৬টি, রেফ ১টি। কম্পনজাতধ্বনি মোট ৪৭টি। ন-ধ্বনির প্রয়োগ এর পরেই— ৩২টি। অন্য নাসিক্য ব্যঞ্জন দুটি এর সঙ্গে যুক্ত হলে— ৩২টি ন+২০টি ম+১টি ঙ— যোগফল ৫৩। নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার ভাষান্তরিত কবিতাতে কমে গেছে।

স্বতন্ত্র ব্যবহারের হিসেবে ন-য়ের পরে রয়েছে ২৮টি ত-ধ্বনি। এই ধ্বনিকে অবয়ব গঠনের উপাদানরূপে পেয়েছি আমরা। উপাদান শ্রেণীর জন্য অন্য ধ্বনিগুলিকেও ত-য়ের পাশে ব্যবহারাধিক্যের ক্রম-অনুযায়ী সাজিয়ে দেখে নিই। ত ২৮, ব ২৫, ক ১৮, দ ১১, প ১০, গ ৬, ট ১, ড ১, হসন্ত চ ৩, হসন্ত জ ১। উপাদানজাতীয় ধ্বনিগুলির ভিতরে ২৮ টি ত কোমল স্বভাবান্বিত। তেমনি আবার

ঘোষতার দরুন 'জমজমে' গম্ভীর এবং কোমল স্বভাববিশিষ্ট ধ্বনি এই কবিতার ২৫টি ব, ১১টি দ, ৬টি গ, ১টি ড আর ১টি জ। অর্থাৎ মোট ১০৩টি উপাদানের ভিতর ৭২টি ব্যঞ্জনেই চম্পার অঙ্গগঠনের উপযোগী কোমলতা লক্ষ করা যাচ্ছে। মূল কবিতায় উপাদান-ধ্বনি ছিল ১০০টি, তার ৭০টি ধ্বনিতে ছিল কোমল স্বভাব। এই ধ্বনির বিষয়ে মূলের সঙ্গে রূপান্তরের অবস্থাসাম্য দেখা গেল।

রূপান্তরিত 'চম্পা'য় শ-ধ্বনি আছে ২৬টি। অন্য দুটি উষ্মধ্বনি স হ আর বিসর্গ রয়েছে যথাক্রমে ৫, ১০ ও ২টি। মোট উষ্মধ্বনি ৪৩টি। অন্যান্য উষ্মতাধর্মী ধ্বনিকে এর সঙ্গে যোগ করতে হবে। স্বরান্ত ঘৃষ্ট চ ৮+ছ ২+জ ১১=২১, স্বরান্ত স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ খ ২+থ ৫+ফ ১+ধ ৬+ভ ৮=২২। হসন্ত স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ খ ১+ধ ১+খণ্ড ৎ ২=৪। সর্বমোট ৪৩+২১+২২+৪=৯০। এই সংখ্যা কম্পনজাত ৪৬টি র ধ্বনির দ্বিগুণের কাছে দাঁড়াল। এদিকে মূল কবিতার ৫৫টি উষ্ম এবং ৩৫টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনির মিলিত সংখ্যার সঙ্গে, রূপান্তরের মোট উষ্মতাধর্মী ধ্বনির ঐক্য হল।

মূল কবিতার নাসিক্য গুণান্বিত উষ্মধ্বনির হিসেব করা হয়েছিল, রূপান্তরের ক্ষেত্রেও আমরা সেই হিসেব করব। প্রথম স্তবকের 'বিকশিনু' 'মধু' 'দুঃখমগ্ন' 'চণ্ড' 'কুঞ্জে' 'মেশা' 'শূন্য' 'যেমত' পদগুলিতে ৮টি উষ্মধ্বনি মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে 'শ্রান্ত' 'অবসন্ন' 'আত্মহারা' পদে ৩টি, তৃতীয় স্তবকে 'চাঁপা' 'হবে না জীবন' 'হেন' 'রশ্মি' পদে ৪টি, চতুর্থ স্তবকে 'বিকশিনু' 'উষ্ণ হস্ত' 'মোহে' 'প্রণাম হে' 'চাঁপা' পদে ৬টি ধ্বনিতে নাসিক্য মাধুর্য সঞ্চারিত হয়েছে। ৮+৩+৪+৬=২১টি উষ্মধ্বনিতে নাসিক্য প্রভাব রয়েছে বলে ৫৩টি নাসিক্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে এই ২১টি ধ্বনিকে যোগ করে মোট উষ্মধ্বনির সঙ্গে এ ধ্বনির তুলনা করতে পারি। ৫৩+২১ =৭৪। এইখানে ৯০টি উষ্মধ্বনির পাশে নাসিক্য মাধুর্য বিশিষ্ট ধ্বনির পরিমাণ সংখ্যাগতভাবে হার মানল। রূপান্তরিত 'চম্পা'তে মাধুর্যের হিসেবে ন্যূনতা ঘটেছে। অর্থাৎ মূল কবিতার চম্পার মতো রূপান্তরিত 'চম্পা'র হৃদয়মাধুর্য কবিতায় ধ্বনিগত আবেদনে গ্রীষ্মের দাবদাহকে মাধুর্যরসে সিঞ্চিত করে আপন লাবণ্যবিভায় পরিণত করতে পারছে না। মূল কবিতার উষ্মতা, নাসিক্যমাধুর্যের সহায়তায় চম্পাকে কান্তি দিতে পেরেছিল।

মনে রাখা দরকার, সত্যেন্দ্রনাথের কবি-আত্মা কী সহজ উচ্ছ্বাসে উষ্মতা আর নাসিক্য মাধুর্যের পরস্পর প্রভাবের যৌগিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছিল, সেই আলোচনা

সূত্রেই আমরা রূপান্তরিত কবিতায় ঐ বিষয়ের ঘাটতি হিসেব করছি। অন্যপক্ষে, সাধারণভাবে মাধুর্য এবং স্ফূর্তির বাহক র-ধ্বনি যে মূলের চেয়ে রূপান্তরে বেড়ে উঠেছে, সে দিকেও নজর রাখতে হবে। মূলে ছিল ৩০টি র, পরিবর্তিত রূপে ৪৬টি। এতে অন্তত বোঝা যায় 'চম্পা'র স্ফূর্তির ব্যাঘাত এদিক থেকে রূপান্তরিত 'চম্পা'য় ঘটে নি।

লালিত্যময় ল-ধ্বনি কবিতাটির আলোচ্যরূপে রয়েছে ৭টি। মূল কবিতায় ছিল ১৪টি, এখানে তার অর্ধেক। এতে রূপান্তরিত 'চম্পা'র 'উল্লাস' আর 'লাবণ্য' খানিকটা কমে যাচ্ছে বটে।

আট.

অর্ধস্বরের সংখ্যা ভাষান্তরিত কবিতায় বেড়ে গিয়েছে। মূলের ৪-য়ের জায়গায় এখানে আড়াই গুণের ওপরে, ১১টি। ৩টি স্বরান্ত (বিদায়ের, উন্মীলিয়া, অনায়াসে), বাকি ৮টি হসন্ত (দৈব, ভয়, ভয়, মিলায়, কায়, রৌদ্র, কায়, হয়)। ১০টি অর্ধস্বর তথা ব্যঞ্জন উচ্চারণে মুখগহ্বরের বাতাসে অল্পবিস্তর চাপ পড়ে কবিতায় উষ্মতাপ্রভাব খানিকটা বাড়িয়ে তুলছে।

নয়.

'চম্পা'র ভাষান্তরিত রূপে ও-স্বরধ্বনি সংখ্যায় সর্বাধিক, ৬৯টি। অপর অর্ধসংবৃত ধ্বনি এ আছে ৩৪টি। কবিতায় ৬৯+৩৪=মোট ১০৩টি অর্ধসংবৃত ধ্বনি রয়েছে। সংবৃত ই ৩৬টি, উ ২৫টি=মোট ৬১টি সংবৃত ধ্বনি। অর্থাৎ সংবৃত এবং অর্ধসংবৃত ধরনের স্বরধ্বনি এ কবিতায় রয়েছে ১৬৪টি। বিবৃত আ-ধ্বনি স্বতন্ত্র গণনাতে ও-র পরেই স্থান পায়, ৪৫টি আ+৩টি আঁ=৪৮টি। অর্ধবিবৃত অ ৪০টি, অ্যা ১টি। মোট বিবৃত-অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনির সংখ্যা ৮৯। মূল কবিতার মতো ভাষান্তরিত 'চম্পা'তেও সংবৃত-অর্ধসংবৃত ধ্বনির সংখ্যা বেশি। মূল কবিতায় বিবৃত-অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি ছিল ৪৯+৩৫=৮৪টি, সংবৃত-অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি ছিল ৯৪+৭৩=১৬৭। মূলের স্বরধ্বনির হিসেবের সঙ্গে খুব পার্থক্য ঘটে নি এ বিষয়ে।

দশ.

এইবারে আমাদের রূপান্তরিত 'চম্পা'র মুক্তদল-রুদ্ধদলের হিসেব নিতে হবে।

মু ক্ত দ ল

	প্রথম পঙ্‌ক্তি	দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি	তৃতীয় পঙ্‌ক্তি	চতুর্থ পঙ্‌ক্তি	মোট
প্রথম স্তবক	১৫	১২	১১	১০	= ৪৮
দ্বিতীয় স্তবক	৭	১০	৯	১৩	= ৩৯
তৃতীয় স্তবক	১৬	১২	১০	১৩	= ৫১
চতুর্থ স্তবক	১৩	৭	১৪	১৬	= ৫০
					সর্বমোট = ১৮৮

রু দ্ধ দ ল

প্রথম স্তবক	২	৪	৬	৫	= ১৭
দ্বিতীয় স্তবক	৭	৫	৫	৩	= ২০
তৃতীয় স্তবক	২	৪	৫	৩	= ১৪
চতুর্থ স্তবক	৪	৭	৩	১	= ১৫
					সর্বমোট = ৬৬

মূল কবিতায় ১৮৩টি মুক্তদল + ৮৬টি রুদ্ধদল মিলে মোট দল ছিল ২৬৯টি। এই রূপান্তরে মুক্তদল ১৮৮টি, রুদ্ধদল ৬৬টি—মোট ২৫৪টি। মূলের দ্বিতীয় স্তবকে বক্তব্যে বাধার পরিচয় দিতে রুদ্ধদল যেমন অধিক সংখ্যায় বেড়ে উঠেছিল—এখানে বাড়ে নি। ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে এই ভেদটি গণনা করবার মতো।

এরপর সম্যক্ অবরুদ্ধ দলবিন্যাসের হিসেব। প্রথম স্তবকে '**দুঃ**খমগ্ন' 'জগ**ৎ**' 'তা**প**' '**মগ্ন**' 'উ**চ্ছ্বা**সে' 'এক**ক**' 'অ**প্স**রা' পদগুলিতে ৮টি দল, দ্বিতীয় স্তবকে 'বারে**ক**' 'র**ব**' 'প**ট**' 'চো**খ**' পদে ৪টি, তৃতীয় স্তবকে 'রৌ**দ্র**' 'তী**ব্র**' 'জগ**ৎ**' পদে ৩টি, চতুর্থ স্তবকে 'মূ**ছে**' 'চি**ত্ত**' 'বো**ধ**' 'ঋ**দ্ধ**' পদে ৪টি- মোট ১৯টি দল সম্যক্‌ভাবে রুদ্ধ। 'জগৎ' আর 'চোখ' শব্দের শেষে মহাপ্রাণতা সত্ত্বেও দল দুটিকে শ্রুতিগত বিচারে রুদ্ধশ্রেণীতে রাখাই সংগত মনে হল। মূল কবিতায় এরকম দলের সংখ্যা ছিল ১৬টি। দুইয়ে সামান্যই তফাৎ। তবে মূলে স্তবক অনুক্রমে সম্যক্ রুদ্ধদল ছিল ২, ৪, ৫, ৫। এখানে ৮, ৪, ৩, ৪। প্রথম স্তবকে অধিক সংখ্যক বাধার জন্যেই নিশ্চয় রূপান্তরটি পড়তে গেলে প্রথমেই আড়ষ্ট ঠেকে।

এগারো.

সার্বিক পর্যালোচনায় নাসিক্য ব্যঞ্জন আর তার প্রভাবজাত মাধুর্য, এবং তরল ল-ধ্বনির লালিত্যের দিক থেকে রূপান্তরিত কবিতাটিতে কমতি দেখা গেল। আবার মধুর স্বভাবের র-ধ্বনির সংখ্যাবৃদ্ধি রূপান্তরটিতে এই ধ্বনির হিসেবে তুলনামূলকভাবে বাড়তি কিছু মাধুর্য আর স্ফূর্তি এনে দিয়েছে। কিন্তু নাসিক্য ব্যঞ্জনের মাধুর্য-প্রভাব হ্রাসের ফলে মূল কবিতায় চম্পার অন্তর্গত মাধুর্যের যে আবহ রচনা হয়েছিল. তা রূপান্তরে হারিয়ে গেল। এ কথা বলতে গিয়ে অনুভব করছি, নাসিক্য ব্যঞ্জনের মাধুর্যে যে নিবিড়তা আছে তার সঙ্গে র-য়ের মাধুর্য এক স্তরের নয়। র-য়ের ধ্বনিগুণে মাধুর্যের চেয়ে স্ফূর্তির স্বভাবই প্রবল। তাছাড়া মূল কবিতার চেয়ে ১৬টির বেশি হলেও, ৭টি ল আর ১৬টি নাসিক্যগুণ-ঋদ্ধ উষ্মধ্বনির ঘাটতি রূপান্তরে কমনীয়তার ক্ষতি সাধন করেছে। কাব্যছন্দের ঐক্য এবং ধ্বনিগত ও দলগত (সিলেব্‌ল) সাম্য সত্ত্বেও ভাষান্তরিত 'চম্পা'তে মাধুর্যের ন্যূনতা, আর কবিতারন্ধ্রে গতিতে তুলনামূলকভাবে অধিকতর অবরোধ ভাষান্তরিত কবিতাটিকে কিছু রুক্ষ কিছু আড়ষ্ট করেছে।

বারো.

মূল 'চম্পা'র নিহিত অনুপ্রাসও কবিতাটির ধ্বনিকে ছন্দিত করেছিল। কবিতার সর্বাঙ্গে অন্তর্নিবিষ্ট গোপনসঞ্চারী অনুনাদের বিস্তৃত আলোচনা আমরা করেছি। ভাষান্তরিত অঙ্গে অনুপ্রাসঝংকারের দৃষ্টান্ত সংখ্যায় অনেক কম। ন এবং যুক্তধ্বনির সংঘাত আছে 'চণ্ড তপোমগ্ন কুঞ্জে ভয়-মেশা আনন্দ উচ্ছ্বাসে' পদে। 'অরণ্য কাতরশুষ্ক, মর্‌মর্‌ উচ্চারে বারেক' আর 'হেরিলাম ধরা ধূ ধূ— আত্মহারা জরজর কায়' এই দুই চরণে র-য়ের অনুপ্রাস। 'ধরা ধূ ধূ' তে ধ-য়ের অনুপ্রাস জেগেছে। ন আর ব -য়ের ঝংকার—'শ্রান্তরব অবসন্ন বনেতে'। ত থ -য়ের অনুপ্রাস আছে 'আস্থাবৃন্তে থরো থরো,— তথাপি বিকচ ফুলতনু' পঙ্‌ক্তিতে। শ-য়ের আবর্তন 'ঈশ্বরের শুভাশিসে অনায়াসে করি তা সেবন' পদে। ও-ধ্বনির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ—'মৃদুমন্দ বিকশিনু, প্রভাতের উষ্ণ হস্ত ধরি' উক্তিতে। ব-য়ের অনুপ্রাস 'বারংবার বোধ হয় সবই' অংশে। ত এবং ই স্বরধ্বনি ফিরে ফিরে এসেছে 'তথাপি রবির জ্যোতি দেহ তোলে কান্তিঋদ্ধ করি' পঙ্‌ক্তিতে। 'বিকশিনু দৈবযোগে মধুঋতু বিদায়ের শ্বাসে' আর 'দুঃখমগ্ন এ জগৎ যবে খরতাপ বশীভূত' চরণ দুটিতে যথা-

ক্রমে ই আর ও স্বরধ্বনির সমাবেশ আছে। এ ছাড়া 'মেলি উন্মীলিয়া' 'হবে না জীবন', আর 'যার তাপে জগৎ কাতর' অংশের ধ্বনিসুষমা হিসেবে আনবার মতো। কিন্তু এই কটি অনুপ্রাস মূল কবিতার প্রায় প্রতি চরণের অনুনাদ ঐশ্বর্যের পাশে অতি অল্প।

রূপান্তরে ব্যবহৃত 'দৈবযোগে', 'যবে', 'খরতাপ-বশীভূত', 'যেমত' 'তথাপি,' 'বারংবার' পদগুলি কবিতার প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছে। উল্লিখিত কটি শব্দের চারটি আছে প্রথম স্তবকে। মধুসূদনের কবিতায় যে-সব পদ চলিত, এ কবিতায় তা অচল বলেই রূপান্তরটি, বিশেষত এর প্রথম স্তবক পড়তে অস্বাচ্ছন্দ্যের বোধ জাগে।

তেরো.

সবশেষে আমরা 'চম্পা' কবিতার একটি ছন্দান্তরিত রূপ পর্যালোচনা করব। স্বরবৃত্ত ৩ / ৪ / ৪ / ৪ ছন্দে গাঁথা পদ্যটি প্রথমে উপস্থিত করা যাক।

আমারে ফুটতে হল বসন্তেরই শেষ নিশাসে,
প্রতাপী গ্রীষ্মতাপে বিশ্ব যখন ক্লিষ্ট নত ;
সুকঠিন তপে মগন কুঞ্জে দ্বিধার ত্রাস উল্লাসে,
একাকী আসতে হল দৃপ্ত স্বর্গ- নটীর মতো।
বনানী শোষণ-কাতর মর্মরিয়া উঠল বারেক,
কোকিলের ক্লান্ত কুহু উঠল বেজে ক্ষণেক তরে ;
জীবনের যবনিকার প্রান্ত তুলি নবীন চোখে
দেখিলাম বসুন্ধরা শূন্য বিভোল খরায় জ্বরে।
শিহরি এলাম তবু বিশ্বাসেরই বৃন্তে ফুটে,
চাঁপা নাম প্রখর তাপের মার কি কভু আমায় ঝরায় !
ঝাঁঝালো রোদের নেশায় মূর্ছাহত বিশ্ব যখন
বিধাতার আশীর্বাদে সে রস পানে পুষ্ট এ কায়।
উষসীর তপ্ত করে হস্ত রাখি বাহির হলেম ;
মুরছে দেহ যতই মোহে পরান হয় প্রতিভাস,
সবিতার বিভূতিতে লাবণ্যময় এ বরতনু ;
দিনদেব জানাই প্রণাম, চম্পা আমি, তোমার সুবাস !

ছন্দান্তরিত কবিতাটির অতিপর্বিক ৩ মাত্রা স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্যপরতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। ছড়ার ধর্ম এই বিন্যাসে সুপরিস্ফুট। কোনো গাম্ভীর্যপূর্ণ আত্মোপলব্ধির সুর এই ছন্দোবন্ধে বেজে-ওঠা সম্ভব নয়। সত্যেন্দ্রনাথের স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা গম্ভীর সুরের 'ইচ্ছামুক্তি' কবিতার কথা আমরা ভুলি নি। কিন্তু মাত্রা ও পর্ববিন্যাসের প্রকারে, বিশেষত পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্যে সে গাম্ভীর্য সম্ভব হয়েছিল। ৩/৪/ ৪ ৪ মাত্রা বিন্যাসে সেই গম্ভীর মনোভঙ্গি প্রকাশ পেতে পারে না। অনুপ্রাসের প্রকটতা ও চটুল ধ্বনিলীলার পরিচয়ে মূল কবিতার মাধুর্যসমৃদ্ধ দৃপ্ত ভাবের পরিপন্থী হয়েছে। সমমাত্রিক পর্বের স্বরবৃত্তে বিন্যাস করে ছন্দান্তরের ফল বিচার করা বরং সংগত হবে। কবিতাটিকে সেইভাবে পুনর্বিন্যাস করা যাক।

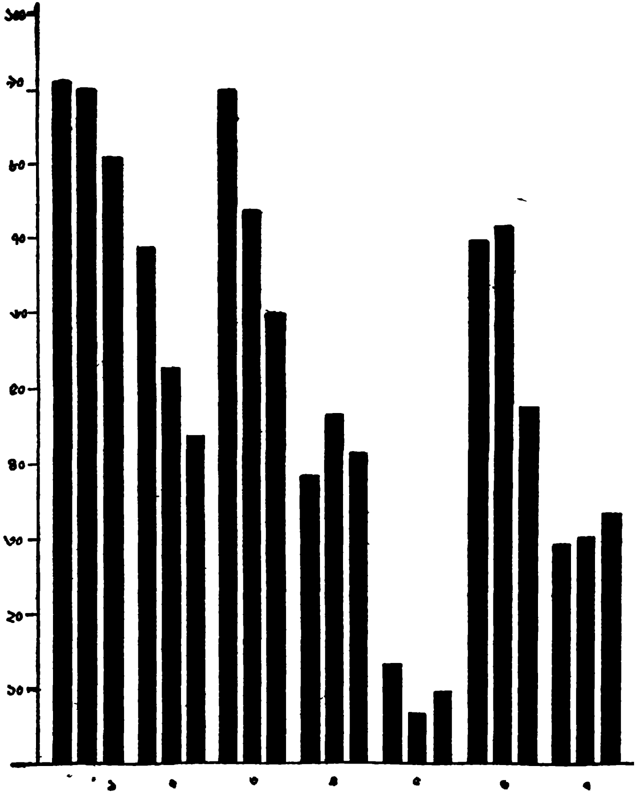
আমার ফোটা মধুঋতুর শেষ নিশাসে,
বিশ্ব যখন গ্রীষ্মতাপে খিন্ন নত,
কঠিন তপের কুঞ্জে, দ্বিধায় ত্রাস-উল্লাসে
একলা ফোটা, দৃপ্ত স্বর্গনটীর মতো।

প্রখর তাপে ক্লিষ্ট কানন মর্মরিল,
কুঞ্জে বারেক ক্লান্ত পিকস্বর কুহরে,
জন্মক্ষণে চক্ষু মেলি ধরায় দেখি,
শূন্য বিভোল শুষ্ক সবই সূর্যকরে।

কম্প্রদেহে বিশ্বাসে থির বাহির হনু,
চম্পা আমি প্রখর তাপে নাহি ঝরি,
রৌদ্রতেজের তীব্র সুরায় সবাই ঝুরে
দেব-আশিসে সহজে তা সেবন করি।

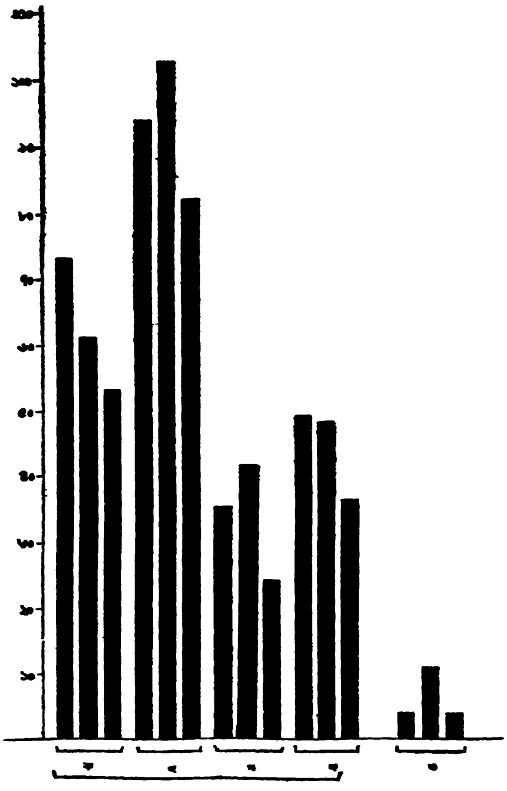
উষাসখীর হস্ত ধরি বাহির হলেম,
মূর্ছাহত সত্তা মম উঠছে ভরি
সূর্যমহিম লাবণ্যেতে; চম্পা আমি,
সুবাস তোমার হে দিনদেব, প্রণাম করি।

স্বরবৃত্ত ছন্দে সাজানো এই রূপটির বিশ্লেষণ করে আমরা মূল কবিতার সঙ্গে



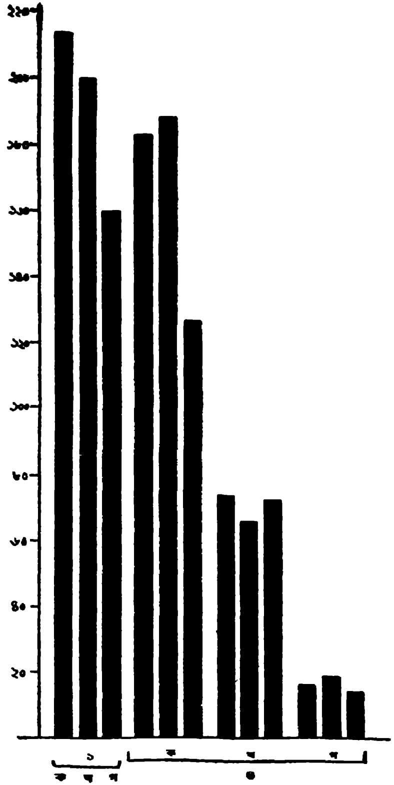
চম্পা (তিন কবিতারূপের এক ধরনের ধ্বনির গ্রাফ ১)

		চম্পা	রূপান্তরিত-চম্পা	ছন্দান্তরিত-চম্পা
১.	উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি	৯১	৯০	৮১
২.	নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি	৬৯	৫৩	৪৪
৩.	নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি + নাসিক্য অনুরণনযুক্ত উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি	৯০	৭৪	৬০
৪	কম্পনজাত ব্যঞ্জনধ্বনি	৩৯	৪৭	৪২
৫	পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি	১৪	৭	১০
৬.	উপাদানধর্মী কোমল-ব্যঞ্জনধ্বনি	৭০	৭২	৪৮
৭.	উপাদানধর্মী অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি	৩০	৩১	৩৪



চম্পা (তিন কবিতারূপের এক ধরনের ধ্বনির গ্রাফ ২ ও ৩)

		চম্পা	রূপান্তরিত-চম্পা	ছন্দান্তরিত-চম্পা
২।				
	ক. সংবৃত ইউ স্বররধ্বনি	৭৩	৬১	৫৩
	খ. অর্ধসংবৃত এ ও ,,	৯৪	১০৩	৮২
	গ. অর্ধবিবৃত অ্যা অ ,,	৩৫	৪১	২৪
	ঘ বিবৃত আ স্বরধ্বনি	৪৯	৪৮	৩৬
৩।	অর্ধস্বর বা অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি	৪	১১	৪



চম্পা (তিন কবিতারূপের এক ধরনের ধ্বনির গ্রাফ) ১ ও ৪

১। ক. চম্পা — কম্পনজাত ব্যঞ্জনধ্বনি
পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি
উপাদানধর্মী কোমল ব্যঞ্জনধ্বনি
নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি + নাসিক্য
অনুরণনযুক্ত উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জন-ধ্বনি — ২১৩

খ. রূপান্তরিত চম্পা — ঐ — ২০০

গ ছন্দান্তরিত চম্পা — ঐ — ১৬০

৪। ক মুক্তদল — : চম্পা — ১৮৩.
রূপান্তরিত চম্পা — ১৮৮,
ছন্দান্তরিত চম্পা — ১২৭

খ. রুদ্ধদল — : চম্পা — ৭৪, রূপান্তরিত চম্পা — ৬৬,
ছন্দান্তরিত চম্পা — ৭৩

গ. সম্যক্ রুদ্ধদল — : চম্পা — ১৬,
রূপান্তরিত চম্পা — ১৯,
ছন্দান্তরিত চম্পা — ১৪

এর পার্থক্যের প্রকার সন্ধান করব। প্রথমেই ছন্দের টানে ভাষারীতির পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সাধুরীতির ভাষাতে যে গাম্ভীর্য. চলিতরীতিতে তা লুপ্ত হয়েছে। দুই রীতির ধ্বনিব্যঞ্জনা আমাদের সংস্কারে দুই জাতের বোধ জাগায়।

এই রূপান্তরে সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যঞ্জন র ৩৮টি। তার সঙ্গে আছে ৪টি রেফ বা খণ্ড র। মোট ৪২টি কম্পনজাত ধ্বনি। এর পরেই সর্বাধিক ব্যবহৃত ধ্বনি শ। স আর হ-য়ের সঙ্গে একত্র গণনা করলে শ ৩৪+স ১+হ ১২=৪৭টি উষ্মধ্বনি। স্বরান্ত ঘৃষ্ট চ ৩+ছ ২+জ ৮+ঝ ২=মোট ১৫ আর স্বরান্ত স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ খ ৮+ঠ ১+থ ১+ফ ২+ধ ৪+ভ ৩=মোট ১৯, সর্বমোট ১৫+১৯=৩৪টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনি। ৪৭টি উষ্মধ্বনির সঙ্গে উষ্মতাধর্ম-প্রাপ্ত ৩৪টি ধ্বনি যোগ করলে উষ্ণশ্বাস গ্রীষ্মের পরিবেশ রচনার ধ্বনির সংখ্যা পাই ৮১টি। মূল কবিতার চেয়ে ৯টি কম।

স্বতন্ত্র গণনায় শ-য়ের পরেই অধিক পরিমাণে এসেছে ন, তারপরেই ম-ধ্বনি। ২৩টি ন, ২১টি ম মিলে ৪৪টি নাসিক্য ব্যঞ্জন। মূল কবিতার ৬৯টি অনুরূপ ধ্বনি থেকে ২৫টি কম। প্রথম স্তবকের **মধু**, নি**শ্বা**সে, য**খ**ন, **খি**ন্ন, ক**ঠি**ন, কু**ঞ্জে** পদগুলিতে ৬টি, দ্বিতীয় স্তবকে কু**ঞ্জে**, **জন্মক্ষ**ণে, **শূ**ন্য পদে ৪টি, তৃতীয় স্তবকে **হ**নু, **চ**ম্পা, না**হি** পদে ৩টি, চতুর্থ স্তবকে স্ব**র্ণ**ম**ঞ্জি**ম, **চ**ম্পা পদে ৩টি উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনে, নাসিক্য ধ্বনির মাধুর্য মিশ্রিত হয়েছে। এরকম ধ্বনির মোট সংখ্যা ১৬। অর্থাৎ ৮০টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনির ভিতরে ১৬টিতে গ্রীষ্মতাপের সঙ্গে অনুরাগের মধুর সন্তাপ প্রকাশ পেয়েছে। এই ১৬টি ধ্বনিকে অতিরিক্ত নাসিক্যগুণ বিস্তারের জন্য ৪৪টি নাসিক্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যোগ করে ৬০টি মাধুর্যগুণান্বিত ধ্বনি হিসেবে ধরলেও মূল কবিতার ৬৯টি নাসিক্য +২১টি নাসিক্য মাধুর্যসম্পন্ন উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জন-- মোট ৯০টি ধ্বনির কাছে আসতে পারছে না। আমরা 'চম্পা' এবং তার ভাষান্তরের আলোচনায় দেখেছি উষ্মতাধর্মী আর নাসিক্য গুণান্বিত ব্যঞ্জনের পরস্পর সহযোগই 'চম্পা'র মূল অনুভবটিকে ব্যঞ্জনা দেয়। বলা যায় 'চম্পা'কে ফুটিয়ে তোলে।

উপস্থিত ছন্দান্তরে এরপর স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসেবে সর্বাধিক ব্যঞ্জন ত, ১৯টি। এ পদ্যবন্ধে এ পর্যন্ত অনালোচিত দন্ত্য বর্গের অন্য কোমল ধ্বনি দ, ৯টি। ১৯+৯=২৮। বাকি ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি দুটিকেও কোমল উপাদান হিসেবে গণনা করতে হবে। দুটি হসন্ত ঘোষ ঘৃষ্ট জ-ও এই দলে স্থান পাবে। ২টি জ, ১৫টি ব আর ৩টি গ যোগ হয়ে (২৮+২+১৫+৩)— হল ৪৮টি। এই উপাদানধর্মী কোমল ধ্বনিগুলির সঙ্গে আলোচ্য পদ্যে আরো ৩২টি অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি রয়েছে।

কবিতার 'উঠছে' আর 'মূর্ছাহত' পদের হসন্ত ঠ আর ছ অক্ষর দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্বনি দুটিও উচ্চারণে যথাক্রমে প্রায় ট্ আর চ্ হয়ে উঠেছে বলে এ দুটিকে এই দলে গণ্য করছি। মোট ৮২টি উপাদানধর্মী ধ্বনির অর্ধেকের বেশি ধ্বনিই কোমল। এ ধ্বনিব ব্যবহার 'চম্পা'র অঙ্গগঠনের উপযোগী। মূল কবিতাতে এ ধ্বনি ছিল ৪৬টি সংখ্যায় দুটি বরং কম।

মাধুর্য এবং লালিত্যের বাহন ল-ধ্বনি এ কবিতায় এসেছে ১০টি। মূলে ছিল ১৪টি।

সব মিলিয়ে 'চম্পা' কবিতার উপস্থিত রূপান্তরে দেহগঠনের উপাদানে দুটি কোমল ব্যঞ্জন মূলেব চেয়ে কম আছে। কিন্তু অন্য সকল বিশেষ ব্যঞ্জনাবাহী ব্যঞ্জন-ধ্বনি মূল কবিতায় সংখ্যায় অধিক রয়েছে।

চোদ্দ.

ছন্দান্তবে মোট অর্ধস্বর বা ব্যঞ্জন আছে ৪টি, মূল কবিতার সমান সংখ্যক। 'ধরায়' আর 'স্থবায়' পদশেষের ২টি হসন্ত এ্। 'সবাই' শব্দশেষের ১টি হসন্ত ই্। 'রৌদ্র' শব্দে ১টি হসন্ত উ্। এই ৪টি অর্ধস্বব, আমবা জানি, কবিতায় কিঞ্চিৎ উষ্মতা সঞ্চারের সহায়ক হয়েছে।

পনেরো.

স্বরবৃত্ত ছন্দের 'চম্পা'-রূপেও, মূলেরই মতো, ও-স্বরধ্বনি সবচেয়ে বেশি, এবং তারপরেই ব্যবহার-ক্রমের দিক থেকে রয়েছে আ-ধ্বনি। সংখ্যা যথাক্রমে ৫১ আর ৩৬। অন্য অর্ধসংবৃত ধ্বনি এ ৩১টি। সংবৃত ই ৩৪, উ ১৯। সংবৃত-অর্ধসংবৃত মিলে ১৩৫টি স্ববধ্বনি। অর্ধবিবৃত ২৩টি অ আর ১টি অ্যা-কে বিবৃত আ-র সঙ্গে যোগ করলে ৬০টি মুক্ত আর প্রায়-মুক্ত স্বভাবের ধ্বনি পাওয়া যায়। অর্থাৎ মূল কবিতার মতো এ কবিতায়ও চম্পার চলা সংবৃত-অর্ধসংবৃত।

ষোলো.

মুক্তদল-রুদ্ধদলের হিসেব থেকেও ছন্দান্তরিত 'চম্পা'র চলার গতি সম্পর্কে ধারণা করা যাবে।

	মুক্তদল	রুদ্ধদল
প্রথম স্তবক	৪৩	১৭
দ্বিতীয় স্তবক	৪২	১৮
তৃতীয় স্তবক	৪১	১৯
চতুর্থ স্তবক	৪১	১৯

বক্তব্যনিরপেক্ষভাবে পূর্বাপর সব স্তবকেই মুক্ত ও রুদ্ধদল বিন্যাসের ধরন প্রায় এক। মূল কবিতায় কিন্তু বাচ্যার্থের সঙ্গে দলবিন্যাসের সংগতি রক্ষিত হয়েছিল। তাছাড়া মোট মুক্ত ও রুদ্ধদলের ভিতরে পার্থক্যও মূল কবিতায় ছিল অনেক বেশি। মূলে মুক্তদল ছিল ১৮৩টি, রুদ্ধদল ৭৪টি। এ কবিতায় মুক্তদল মোট ১২৭টি, রুদ্ধদল ৭৩টি, উভয় কবিতাবন্ধের মুক্ত ও রুদ্ধদলের গড় হিসেব করলে বোঝা যায়— আসল 'চম্পা' অন্তর্নিহিত মাধুর্যবশে যতটা স্বচ্ছন্দগতি ছিল, আমাদের গড়ে-তোলা এই দ্বিতীয় 'চম্পা'র চলন সেই স্বাচ্ছন্দ্য পায় নি।

সম্যক্ রুদ্ধদলের হিসেব করে দেখা যাচ্ছে মূল কবিতার এরকম সম্পূর্ণ অবরোধ যেখানে ১৬টি দলে, ছন্দান্তরে ১৪টি। '**দৃ**প্ত' '**স্ব**র্গ' 'বারে**ক**' '**চ**ক্ষু' '**সূ**র্য' 'ক**ম্প্র**' 'রৌ**দ্র**' 'তী**ব্র**' 'দে**ব**' '**মূ**র্ছাহত' '**স**ত্তা' 'উ**ঠ**ছে' '**সূ**র্য' 'দিনদে**ব**' — এই চোদ্দটি পদের রুদ্ধদলগুলি প্রলম্বনের কোনো সুযোগ পায় না। ১৪ আর ১৬-র ভেদ অবশ্য তত গ্রাহ্য করবার মতো নয়।

সতেরো.

অনুপ্রাসের হিসেব নিলে স্বরবৃত্ত ছন্দে ঢালা পদ্যে মূল কবিতার চেয়ে ঘাটতি দেখা যাবে মনে হয় না। কারণ, স্বরবৃত্ত ছন্দে অনুপ্রাসের সুস্পষ্ট ঝংকার প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। চতুর্মাত্রিক পর্বারম্ভের অনতিব্যবহিত প্রস্বরের পৌনঃপুনিকতা একটা প্যাটার্ন বা ছাঁদ তো সৃষ্টি করেই, ছন্দের ঝোঁক নানা রকমে বিন্যস্ত যুক্তধ্বনির রুদ্ধদল-সংঘাত যেন দাবি করতে থাকে। ছন্দান্তরিত 'চম্পা'তে রুদ্ধদলের ঘাত-বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। ১৬টি ছত্রের ভিতরে ১২টি ছত্রেই এই সংঘাত সুপ্রকট। প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে, দ্বিতীয় স্তবকের চারটি চরণেই, তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে, আর চতুর্থ স্তবকের চারটি চরণেই রুদ্ধদলের বিশেষ বিন্যাস ও সংঘাত লক্ষণীয়। কবিতার প্রথম ছত্রটিতেই শুধু অনুপ্রাস একরকম নেই ('শেষ নিশ্বাসে' ছাড়া), বলা যায়। দ্বিতীয় স্তবকের

শেষ পঙ্‌ক্তি, তৃতীয় স্তবকের প্রথম ও চতুর্থ ছত্র এবং চতুর্থ স্তবকের প্রথম ছত্রে উষ্মধ্বনির অনুপ্রাস রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে এসেছে ক-ধ্বনির অনুপ্রাস, পরের পঙ্‌ক্তিটিতে খ-য়ের। ছন্দান্তরটি কাছেই ছাপা রয়েছে বলে পঙ্‌ক্তিগুলি উদ্ধার করে দেখানো নিষ্প্রয়োজন মনে হচ্ছে। তবে, দু-একটি অংশ বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। যেমন— 'বিশ্ব যখন গ্রীষ্মতাপে খিন্ন নত' চরণে 'ই'-কারের বদ্ধ ধ্বনিগুলো দু-মাত্রা পরে পরে সমান দূরত্বে পরবর্তী ও-ধ্বনিসমেত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'মূর্ছাহত সত্তা মম' অংশে পরপর দুবার রুদ্ধদলের পর আ অ ও স্বরধ্বনিবিন্যাসে মিলের সুষমা লক্ষণীয়ভাবে ফুটেছে।

'চম্পা'র ছন্দান্তর রচনায় ধ্বনিসংঘাত বা অন্যবিধ অনুপ্রাসের জন্য কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল না। প্রয়াস ছিল, বাচ্যার্থ বজায় রেখে নির্দিষ্ট মাপের কাঠামোতেই কী করে 'চম্পা'র বক্তব্যটুকু আঁটিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু মিলগুলো ছুটে এসেছে ছন্দেরই ঝোঁকে।

আঠারো.

'চম্পা', তার ভাষান্তর, এবং ছন্দান্তর পর্যালোচনা করে আসলের সঙ্গে নকলের প্রধান ভেদ ধরা পড়ল— সংগীতধর্মে। উষ্মধ্বনি গ্রীষ্মের পরিবেশ রচনার জন্যে জরুরী সন্দেহ নেই, কিন্তু যে তাপ প্রকৃতিকে শুষ্ক রুক্ষ করে তুলেছে সেই তাপকেই মধুর রসের মতো সহজে পান করে চম্পা লাবণ্যে পরিপূরিত হয়ে উঠছে। এই মাধুর্যসম্পন্ন লাবণ্যের আয়োজনের ধ্বনি নির্দেশের জন্যে সাংগীতিক নাসিক্য ব্যঞ্জন, আর সন্নিহিত উষ্মধ্বনিতে নাসিক্যগুণের গোপন সঞ্চার ছিল অপরিহার্য। মূল কবিতায় উষ্মধ্বনি আর নাসিক্য ব্যঞ্জনা কেমন হাত মিলিয়ে চম্পার লাবণ্য বিকাশের বাণী ধ্বনিতেও সংবহন করেছে, সে তথ্য আমরা আগেই জেনে নিয়েছি। আর দেখেছি, রূপান্তর দুটিতে নাসিক্য ব্যঞ্জনের সেই নিভৃতচারণা ভিতরে ভিতরে কাজ করে নি বলে উষ্মতাই সেখানে হয়ে উঠেছে প্রধান। কেবল গ্রীষ্মতাপের কথা 'চম্পা'র বাইরের পরিবেশ রচনা করতে পারে মাত্র, নাসিক্য ব্যঞ্জনার আনুকূল্য ছাড়া অন্তর্গূঢ় রঞ্জকত্বের ইঙ্গিত যায় হারিয়ে। কাজেই, দেখা যাচ্ছে, কবি তাঁর বিশেষ মুহূর্তের স্পন্দিত আত্মাকে যে ছন্দোবাণীতে বিকশিত করে তৃপ্ত হন, সার্থক কবিতার ক্ষেত্রে, তার পরিবর্তন কাব্যাত্মার ক্ষতিসাধন করছে। পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে ব্যক্ত ওই মতটি বিচিত্র পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখা গেল।

গ. সর্বহারার অবয়ব

সর্বহারা

ব্যথার সাঁতার-পানি ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে পাগল ! কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোর ঘর ?
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,
হাট তুলে দে সর্বহারা ;
মেঘ-জননীর অশ্রুধারা
ঝরছে মাথার 'পর,
দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি
দুলিয়ে তরু-কর ॥

কন্যারা তোর বন্যাধারায়
কাঁদছে উতরোল,
ডাক দিয়েছে তাদের আজি
সাগর-মায়ের কোল ।
নায়ের মাঝি ! নায়ের মাঝি !
পাল তুলে তুই দে রে আজি
তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী
তরঙ্গে খায় দোল !
নায়ের মাঝি ! আর কেন ভাই ?
মায়ার নোঙর তোল্ !

ভাঙন-ভরা আঙনে তোর
যায় রে বেলা যায় ।
মাঝি রে ! দেখ্ কুরঙ্গী তোর
কূলের পানে চায় ।

যায় চলে ঐ সাথের সাথি,
ঘনায় গহন শাওন রাতি,
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি,
ঘুমুস্ নে আর হায়।
ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
এতই কি রে দায়?

হীরা মানিক চাস্ নি কো তুই
চাস্ নি তো সাত ক্রোড়,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র
ভরা অভাব তোর।
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তিহরা,
একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,
একটি প্রদীপ-আলো-করা
একটু কুটীর দোর।
আসলো মৃত্যু আসলো জরা,
আসলো সিঁদেল-চোর।

মাঝি রে, তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল্।
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয়-পথিক চল্‌বি ফিরি
দ'ল্‌বি পাহাড় কানন গিরি
হাঁকছে বাদল ঘিরি' ঘিরি'
নাচছে সিন্ধুজল!
চল্ রে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল্॥

এক.

কবিতাটির পটভূমি তৈরি হয়েছে অথৈ জলে ঘেরা চোরাবালির চরের দৃশ্য দিয়ে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ঘনীভূত হয়ে উঠছে, তাতে প্রলয়ের আভাস সুস্পষ্ট। সর্বহারার দুর্গতির প্রতীক হিসেবে তার আবাসস্থল আর প্রতিবেশের এই ছবি দেখেছেন কবি। নিঃসম্বলের পায়ের নীচে দৃঢ় মাটি নেই, আছে চোরাবালি। আর, চোরাবালির চরকে ঘিরে যে লোনাজল তা দুঃখীজনেরই অশ্রুপাথার— 'ব্যথার সাঁতার-পানি'। আকাশের বিদ্যুৎইঙ্গিত, মেঘজননীর অশ্রুবর্ষণ, আর অপর তীর থেকে মাটিমায়ের হাতছানি 'সর্বহারা'কে ঐ বিপজ্জনক বাসভূমি পরিত্যাগ করবার মিনতি জানাচ্ছে। অথচ, আশ্চর্য বিভ্রমবশে 'সর্বহারা' চোরা-বালির চরেই তার ক্রন্দন-ভরা মাদুর তথা 'মাদুর-ভরা কাঁদন' পেতে নিদ্রাগত। নিশ্চিত বিনাশের মুখে বাসা-বাঁধা নিশ্চিন্ত 'সর্বহারা'কে কবি বেদনার্ত চিত্তে 'পাগল' বলে সম্বোধন করে তার অন্তরে পরিস্থিতি চেতনার উদ্‌বোধ ঘটাতে চান।

শক্ত মাটির কূলে সর্বহারাদের উত্তরণ ঘটাবার জন্যে একটি তরণীর কল্পনা করা হয়েছে, যার কর্ণধার তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর দিয়ে তেজীয়ান্ অশ্বের মতো অপেক্ষমাণ জলযানটিকে তীরে নিয়ে যেতে পারবে, যদি অর্থহীন মায়াবন্ধন ছিঁড়ে রওনা হওয়া যায়। কবির আহ্বানের সুরে করুণার মূর্ছনা। সুধীর যুক্তির সাহায্যে বাস্তব অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাবার প্রয়াস। সর্বহারার চাহিদা অতি সামান্য— 'একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র-ভরা'। একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ভরে-তোলা, একটি প্রদীপে আলোকিত একটু কুটীর দুয়ারে একটি ছিন্ন মাদুরের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। ব্যস্। কিন্তু হত-ভাগ্যদের এইটুকু প্রত্যাশার মুখে ভিড় করে আসে সিঁদেল-চোরের উপদ্রব, আসে মৃত্যু আর জরা। এই পরিস্থিতিতে চোরাবালির এলাকা ছেড়ে সত্বর বেরিয়ে পড়তে হবে। মিথ্যার উপরে, আগ্রাসী প্রতিবেশের উপরে নির্ভর না রেখে প্রলয়-পথিকের মতো দৃঢ় ভিত্তির উপরে সংগ্রাম স্বীকার করতে হবে জীবনে।

যোগ্য কর্ণধারকে কবি আহ্বান করছেন— শক্ত মাটির বুকের প্রতিঘাতে পদতল রক্তাক্ত হলেও সেই পথেই সর্বহারাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে চলতে। পরিবেশে যে প্রলয় ঘনিয়ে উঠেছে সেই প্রলয়ের মুখোমুখি হওয়া জরুরী এখন। কিন্তু চোরাবালির উপরে দাঁড়িয়ে বাঁচবার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হয় না, দাঁড়াবার স্থানটি চাই সুদৃঢ়। মিথ্যামোহ ত্যাগ করে কঠিন জীবনযুদ্ধ শুরু করবার উপযুক্ত জমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে, দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য যে-কোনো দুর্গমতা পদদলিত করা সম্ভব।

দুই.

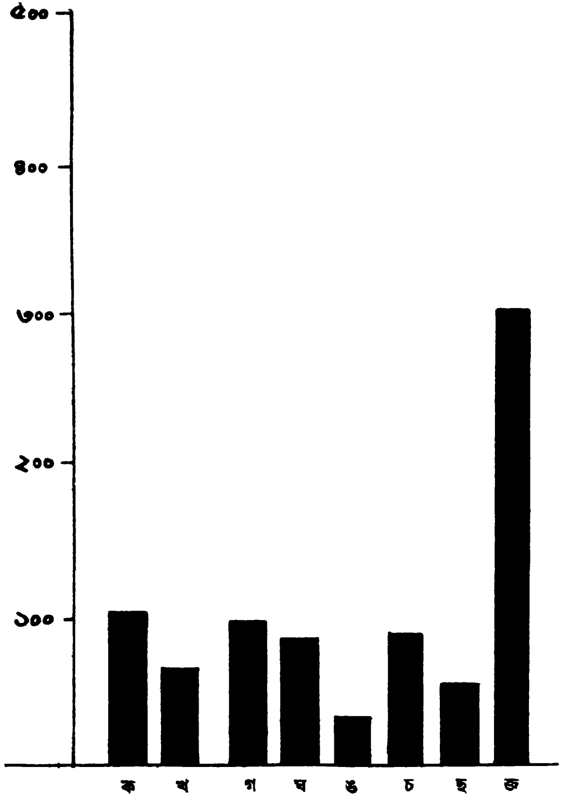
কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতার চলন স্বরবৃত্ত ছন্দে বাঁধা। তবে, সর্বহারার জন্য প্রগাঢ় মমতার অনুভব কবিতাটির গতিতে স্বরবৃত্তসুলভ ঝোঁকের প্রাধান্যের চেয়ে সুরেলা ভাবই ফুটিয়ে তুলেছে বেশি। আবার জায়গায় জায়গায় বক্তব্যের অনুকূল দৃপ্ত বেগও যথোচিত মিশেছে। 'তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী / তরঙ্গে খায় দোল' বা 'একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র / ভরা অভাব তোর' কিংবা 'শক্ত মাটির ঘায়ে হউক / রক্ত পদতল। / প্রলয়-পথিক চল্‌বি ফিরি / দ'ল্‌বি পাহাড় কানন গিরি' ইত্যাদি অংশে স্বরবৃত্তঘাতের বলিষ্ঠতা এসেছে। ধ্বনিগতভাবে সুরময়তার উৎস বিশেষ চরিত্রের ব্যঞ্জনের ব্যবহার এবং যুক্তদলের অধিক প্রয়োগ— সে বিষয়ে ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করব।

তিন.

'সর্বহারা' কবিতার সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন র— ৮৪টি। এর সঙ্গে আছে একটি রেফ বা খণ্ড র তারপরেই ন— সংখ্যায় ৩৬টি। তার সঙ্গে ২০টি ম আর ৬টি ঙ যোগ করলে— মোট নাসিক্য ব্যঞ্জন পাই ৬২টি। এই কবিতায় অনুনাসিক প্রভাব আরো এসেছে ১০টি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বরের উচ্চারণে। কোমল স্বভাবের ত-ধ্বনি এ কবিতায় ন-য়ের পরেই— ৩৫টি। কোমল ব্যঞ্জনার ল ৩০টি। অন্যান্য কোমল নাদ ঘোষ ব্যঞ্জনের ভিতরে দ ২৫টি, ব ১৪টি, গ ৭টি, ড় ৫টি, ড ২টি, আর হসন্ত ঘ ১টি— মোট ৫৪টি। উল্লিখিত ব্যঞ্জনগুলি সবই মধুর আর কোমল। ১০টি অনুনাসিক স্বরের প্রভাব গণনা করলে, সব মিলিয়ে ২৭৬টি ধ্বনিতে মধুর আর কোমল ব্যঞ্জনা রয়েছে বলা যায়। (কম্পনজাত ৮৫ + নাসিক্য ৬২ + চন্দ্রবিন্দু ১০ + ত ৩৫ + ল ৩০ + দ ২৫ + ব ১৪ + গ ৭ + ড় ৫ + ড ২ + হসন্ত ঘ ১)।

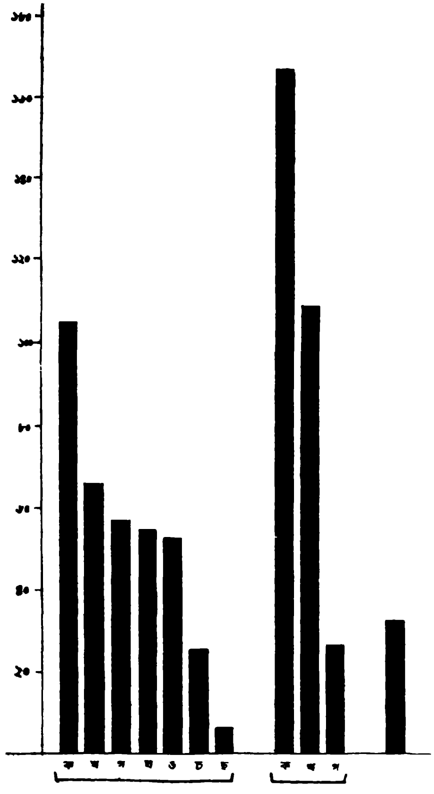
সাধারণ উপাদানধর্মী ব্যঞ্জন এই কাবতায় আছে ৫৩টি। ২৮টি ক, ১০টি ট, ১৩টি প, ১টি হসন্ত চ, আর 'মাঝি রে, দেখ্‌ কুরঙ্গী' বিন্যাসে 'দেখ্‌' শব্দের শেষে পরবর্তী 'কুরঙ্গী' শব্দারম্ভের ক-য়ের প্রভাববশে ক-ভাবাপন্ন ১টি হসন্ত খ।

'সর্বহারা'তে হুতাশব্যঞ্জক উষ্মধ্বনি আছে ৩৩টি। ২১টি শ, ৯টি হ, আর ৩টি স। সেইসঙ্গে কবিতায় আরো উষ্মতা বিস্তার করেছে ৪০টি স্বরান্ত ঘৃষ্টধ্বনি, আর ২৯টি স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি। উষ্মতাযুক্ত ব্যঞ্জন সংখ্যার যোগফল হল ১০২। ২টি খণ্ড ত-র উচ্চারণশেষের ঈষৎ উষ্মতার কথাও খেয়াল রাখা দরকার। অর্ধ-



সর্বহারা

ক.	উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি—	১০২
	(২টি খণ্ড ৎ বাদ দিয়ে)	
খ.	নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি—	৬২
গ.	নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি + চন্দ্রবিন্দু + নাসিক্য অনুরণন-যুক্ত উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি—(৬৩ + ১০ + ২৬)—	৯৮
ঘ.	কম্পনজাত ব্যঞ্জনধ্বনি—	৮৫
ঙ.	পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি—	৩০
চ.	উপাদানধর্মী কোমল ব্যঞ্জনধ্বনি—	৮৯
ছ.	সাধারণ উপাদানধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি—	৫৩
জ.	গ + ঘ + ঙ + চ =	৩০২



সর্বহারা ২, ৩, ৪

২। ক. আ / আঁ — ১০৫
খ. ও — ৬৬
গ. অ — ৫৭
ঘ. এ / এঁ — ৫৫
ঙ. ই / ইঁ — ৫৩
চ. উ — ২৬
ছ. অ্যা — ৬

৩। ক. মুক্তদল — ১৬৭
খ. রুদ্ধদল — ১১১
গ. সম্যক্‌ রুদ্ধদল — ২৭

৪। অর্ধস্বর বা অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি — ৩৩

ব্যঞ্জনের সংখ্যা এ কবিতায় ৩৩টি। অর্ধধ্বনির উচ্চারণে প্রারম্ভিক বা শেষ-প্রান্তিক চাপ বায়ুতে যে উষ্মতা সঞ্চার করে তার পরিমাণ সব ক্ষেত্রে এক না হলেও এই-সব ধ্বনির প্রভাব কবিতার আবহ সৃষ্টিতে যুক্ত হয়েছে, মনে রাখা দরকার। কবিতাটিতে মধুর কোমল ধ্বনির ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও, সর্বহারার জন্য বেদনাউচ্ছ্বাসবশে উষ্মধ্বনির প্রাধান্যও অতি স্বাভাবিক।

কোনো পদে বিন্যস্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন আশপাশে কিছু দূব পর্যন্ত আপন মাধুর্যগুণ বিস্তার কবে, আমরা জানি। অনুনাসিক স্বরের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। যেমন, উপস্থিত কবিতার 'সাঁতার', 'বেঁধেছিস্', 'বাঁধন ছেঁড়া' ইত্যাদি পদে উষ্ম এবং স্বরান্ত বিন্যাসেব কারণে উষ্মতাযুক্ত ব্যঞ্জনে সন্নিহিত স্ববের অনুনাসিকতার গুণ সঞ্চারিত হয়েছে। পুরো কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে ২৬টি উষ্মতাগুণযুক্ত ধ্বনিতে নাসিক্য ব্যঞ্জন আব অনুনাসিক স্বরের মাধুর্য-ব্যঞ্জনা রয়েছে। স্তবকের ভিত্তিতে বিবরণ দেওয়া যাক—

প্রথম স্তবকে—	সাঁতাব, বেঁধেছিস্, শূন্যে, জননীর	৪
দ্বিতীয় স্তবকে—	বন্যাধারায়, মাঝি, মাঝি, তুফান, মাঝি, কেন ভাই	৬
তৃতীয় স্তবকে—	ভাঙন, ঘনায়, গহন, শাওন, ঘুমুসনে, বাঁধন ছেঁডা	৮
চতুর্থ স্তবকে—	ঘুম, শ্রান্তি, ছিন্ন, সিঁদেল	৪
পঞ্চম স্তবকে—	মাঝি, হাঁকছে, সিন্ধুজল	৪
	সর্বমোট	২৬

কাজেই, ১০২টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনির ভিতরে ২৬টিতে নাসিক্য-মায়া সঞ্চরণ করেছে। কবির মমত্ববোধ এই মাধুর্যপূর্ণ হুতাশের ধ্বনিতে নিবিড়তা এনেছে।

এখন হিসেব করলে দেখা যাবে, ২৭৬টি মধুর আর কোমল ব্যঞ্জনগুণান্বিত ধ্বনির সঙ্গে আরো ২৬টি উষ্মধ্বনির মধুর ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে কবিতার মূলস্বরে মমতার অনুভবকেই বড়ো করে তুলেছে।

চার.

'সর্বহারা'তে আ-স্বরধ্বনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। ৯৮টি মৌখিক, আর ৭টি অনুনাসিক 'আঁ'— সবশুদ্ধ ১০৫টি। অর্ধসংবৃত ও আছে ৬৬টি। অর্ধবিবৃত অ ৫৭টি। অর্ধসংবৃত মৌখিক এ ৫৩টি আর অনুনাসিক এঁ ২টি— মোট

৫৫টি। সংবৃত মৌখিক ই ৫২টি, অনুনাসিক ইঁ ১টি— মোট ৫৩টি। অপর সংবৃত স্বর উ আছে ২৬টি। অর্ধবিবৃত অ্যা ৬টি। এখন শুধু সংবৃত ধ্বনিগুলিকে একত্র করলে— ৫৩টি ই/ইঁ আর ২৬টি উ মিলে হয় ৭৯টি স্বর। মোট বিবৃত স্বরের চেয়ে অনেক কম। মোট অর্ধসংবৃত ও ৬৬+এ/এঁ ৫৫— একুনে ১২১টি ধ্বনি মোট বিবৃত স্বরকে অনেক ছাড়িয়ে যায়। মোট অর্ধবিবৃত ধ্বনি রয়েছে— অ ৫৭+অ্যা ৬=৬৩টি। বিবৃত-অর্ধবিবৃত স্বরের চেয়ে সংবৃত-অর্ধ-সংবৃত স্বরই সংখ্যায় বেশি। মোটামুটিভাবে, এতে কবিতার ভিতরে একটি চাপের অস্তিত্ব অনুমান করা চলে। তবে স্বরবাহিত ব্যঞ্জনের অধিকাংশে মাধুর্য ও কোমলতার স্পর্শ ঐ চাপের সঙ্গে কবির সহানুভূতির করুণা আমাদের বোধে সঞ্চালিত করে।

স্তবক অনুযায়ী হিসাবে দেখা যায়, কবিতার প্রথম স্তবকে সংবৃত ই উ আর বিবৃত আ ব্যবহারক্রমে লক্ষণীয় ভেদ আছে—

	ই উ	আ
প্রথম স্তবক	৭+৬=১৩	২০
দ্বিতীয় স্তবক	৭+৫=১২	২৬
তৃতীয় স্তবক	৬+৫=১১	২৫
চতুর্থ স্তবক	১৫+৭=২২	১৯
পঞ্চম স্তবক	১৮+৪=২২	১৫

কবিতার শুরুতে সুরেলা মমতার ভাব ছিল বেশি, শেষে এসেছে উদ্দীপনের বেগ। সেইজন্যেই প্রথম দিকের খোলামেলা আ-য়ের ব্যবহার কমে সংবৃত ই উ-য়ের আধিক্যে শেষভাগে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের আহ্বানে চোয়াল-চাপা দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে।

পাঁচ.

আমরা এর আগে যে দুটি কবিতা বিশ্লেষণ করেছি, তাতে রুদ্ধদলের চেয়ে মুক্ত-দল পেয়েছি বেশি। 'সর্বহারা' কবিতায়ও ১১১টি রুদ্ধদলের পাশে মুক্তদল রয়েছে ১৬৭টি। আবার, রুদ্ধদলের ভিতরেও প্রলম্বিত-ধ্বনিতে-রুদ্ধ দল আছে ৮৪টি। অর্থাৎ ১৬৭টি মুক্তদলের সঙ্গে এই ৮৪টি রুদ্ধদলের একটা প্রচ্ছন্ন যোগ রয়েছে। তার মানে, কবিতাটির সাংগীতিকতা বিধানে মুক্ত ধ্বনিগুলির সঙ্গে প্রলম্বিত-ধ্বনিতে-

রুদ্ধ দলগুলির সহযোগ আছে। কিন্তু এও লক্ষ করতে হবে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় সম্যক্‌ভাবে রুদ্ধদল ছিল মাত্র ১৬টি, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 'চম্পা'-তেও ছিল ১৬টি। আর, স্বরবৃত্ত ছন্দের ধর্মের টানেই 'সর্বহারা' কবিতাতে সম্যক্‌ রুদ্ধদল এসেছে ২৭টি। 'সর্বহারা'দের উদ্‌বুদ্ধ করবার কাজে সম্যক্‌ রোধের এই আয়োজন দরকারী ছিল। প্রথম স্তবকে সম্যক্‌ অবরোধ ছিল ৫টি দলে (তড়িৎ, হাট, সর্বহারা, মেঘ, ডাক্‌ছে), দ্বিতীয় স্তবকে ২টি দলে (কাঁদছে, ডাক), তৃতীয় স্তবকে ১টি দলে (দেখ্‌), চতুর্থ স্তবকে ১২টি দলে (মানিক, সাত, একটি, ক্ষুদ্র, মৃৎপাত্র, অভাব, একটি, একটি, প্রদীপ, একটু, মৃত্যু) আর পঞ্চম স্তবকে ৭টি দলে (শক্ত, হউক, রক্ত, পথিক, হাঁক্‌ছে, নাচ্‌ছে, যাত্রী)।

স্বতন্ত্র স্তবকগুলির বাচ্যার্থের দিকে মন দিলে দেখা যায়, প্রথম স্তবকে বিষয়ের উপস্থাপনায় স্নেহমিশ্রিত তিরস্কারে 'পাগল' সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাকে হাট তুলে দেবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলিষ্ঠভাবে। এ স্তবকে সম্যক্‌ রুদ্ধদলের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্তবকে ক্রন্দনের বিবরণ এবং সেই 'মাদুর-ভরা কাঁদন' ছেড়ে 'মায়ার নোঙর' তোলার ব্যাকুল আবেদন স্থান পেয়েছে। ব্যাকুল সুরের দরুন সম্যক্‌ রুদ্ধদলের সংখ্যাও প্রভূতভাবে কমে গেছে। সামান্য ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার অসংগতি এবং এ দুর্দশার পিছনে 'সিঁদেল চোরে'র ভূমিকার প্রসঙ্গে চতুর্থ স্তবকে আসছে সর্বাধিক সম্যক্‌ভাবে রুদ্ধদলের বিন্যাস। শেষ স্তবকে 'প্রলয়-পথিক' হবার দীপ্ত আহ্বানেও আছে পূর্ব স্তবকের ভাবের অনুসরণ।

ছয়.

আগেই বলেছি, সর্বহারাকে উদ্দীপ্ত করবার কবিতা হলেও, এ কবিতায় সুরেলা ভাব স্পষ্ট। এর উৎস হিসেবে কবিচিত্তের সংবেদনার কথাও আমরা জানি। ঐ বেদনার সংবাহনে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে এ কবিতার অনুপ্রাসময়তা। প্রথম স্তবকের শুরুতেই 'ব্যথার সাঁতার' বিন্যাসের মতো পদে পদে মিল এই কবিতায় পূর্বাপর রয়েছে। 'পানি ঘেরা / চোরা', 'কন্যারা তোর বন্যাধারায়', 'ভাঙন ভরা আগুনে', 'ঘনায় গহন শাওন', 'ঐ কাঁদনের বাঁধন', 'শক্ত মাটির ঘায়ে হউক / রক্ত', 'চল্‌বি ফিরি / দল্‌বি', 'সিন্ধুজল ! / চল্‌ রে জলের যাত্রী।' কবিতার সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন র-য়ের অনুপ্রাস এ কবিতায় অনেক, তালিকা দেওয়া

বাহুল্য মনে হয়। 'তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী / তরঙ্গে খায় দোল' চরণযুগলে ত-য়ের তালের সঙ্গে মুক্তদল-রুদ্ধদলের লীলাও লক্ষ করবার মতো। 'কুরঙ্গী তোর কূলের পানে'তে অপ্রত্যাশিতভাবে ক-এ উ-কারের মিল ছাড়াও, আছে শেষ দলটির পূর্ব পর্যন্ত মুক্ত-রুদ্ধ-মুক্ত দল সন্নিবেশের সাম্য। 'আস্‌লো মৃত্যু আস্‌লো জরা, / আস্‌লো সিঁদেল-চোর' অংশে ৪টি শ আর দুটি স্বরান্ত চ আর জ-য়ের উষ্মতায় সর্বহারার বঞ্চনাময়তার অসহায়ত্ব শ্বসিত হয়ে উঠছে।

একই পদের একাধিক ব্যবহারও ধ্বনিসুষমা এনেছে। দ্বিতীয় স্তবকে 'নায়ের মাঝি' পদ আছে তিনবার। চতুর্থ স্তবকে ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা বোঝাবার জন্য তিনটি 'একটি' পদের পর প্রায়-অনুরূপ 'একটু' শব্দে সামান্যতা প্রতিপাদন হয়েছে সুযোগ্য উপায়ে। আর এই ধ্বনির ঐক্য, নির্দেশ করেছে ভাবের ঐক্য। 'একটু-কুটীব' পদের ধ্বনিবিন্যাসে পরপর ক আর ট-য়ের স্বরধ্বনির ওলটপালটেই পরস্পর মিল আকর্ষণীয় হয়েছে। 'একটু-কু' বিন্যাস ধ্বনিনির্দেশে 'একটুকু' বা 'যৎসামান্য' ভাবটিও ধরিয়ে দেয়। সর্বহারার অভাবের পরিমাণকে যেমন একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের ছবিতে ভবে দেখানো হয়েছে তেমনি 'একটি' থেকে 'একটু'— ধ্বনির এই সংবৃতিকেও ধ্বনিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে 'আস্‌লো' পদ ক্রমিক আঘাতের মতো নির্দিষ্ট ব্যবধানে তিনবার উচ্চারিত হয়েছে— 'আস্‌লো মৃত্যু আস্‌লো জরা, / আস্‌লো সিঁদেল-চোর'।

'সর্বহারা'কে ভালোবেসে, তাকে আপন ভাগ্যপরিবর্তনের প্রেরণা দিতে কবিতাটিতে মধুর মিনতির সঙ্গে চোরাবালির মায়া ছেড়ে শক্ত মাটির পথে সংগ্রাম করে রক্তাক্ত হতে বলা হয়েছে। সে বলা বাচ্যার্থে যেমন, তেমনি কবির অন্তর্গত ভাবের সঙ্গে ধ্বনির সার্থক যোজনায় কবিতার সর্বাবয়বে অভিব্যক্তি পেয়েছে।

ঘ. আমাকে একটি কথা দাও

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
সহজ মহৎ বিশাল,
গভীর ;— সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন,
আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর।

সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো :
সেই দিনের— আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন
সেই উজ্জ্বল পাখিনীর— পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন ।

এক.

জীবনানন্দ দাশের 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্য থেকে সংকলিত নামহীন এই কবিতাটির বহিরঙ্গের ধ্বনি কবিতার অন্তর্লোকের কী পরিচয় আভাসিত করেছে, অমরা এই প্রবন্ধে সেটি বুঝবার চেষ্টা করব ।

বাচ্যার্থে প্রকাশ, বিশেষ একটি কথার জন্য কবির হৃদয়ে আলংকারিক অর্থে 'পিপাসা' জেগেছে । সেই 'কথা'টিকে পাঁচটি উপমানের মালা গেঁথে তুলনা করা হল । ১. আকাশের মতো ২. চেনা হাতের মতন ৩. রাত্রির বাতাসের মতো ৪ দিনের আলোর মতন ৫. পাখিনীর মতন । প্রতিটি উপমেয়ের বিশেষণও আছে. কখনো-বা আছে কিছু ইতিকথা । ১ সেই আকাশ-- যা সহজ মহৎ বিশাল. সর্বোপরি গভীর । প্রথম তিনটি বিশেষণ পরপর বলে কমা চিহ্ন দিয়ে, পরের লাইনে আলাদা করে বিন্যাস করা হয়েছে 'গভীর' শব্দটি । অধিক গুরুত্ব দেবার মানসেই মনে হয় । ২. সেই চেনা হাত— যা 'সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহ-বলিভুকদের রক্তে মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে' সহজ পরিচয়ে স্বতঃপ্রকাশ । তা ছাড়া এ হাত কবির চিরকাল ভালোবেসে আসা প্রেয়সীর । ৩. সেই রাত্রির বাতাস— যা 'নক্ষত্রালোকিত' এবং 'নিবিড' । ৪. সেই দিনের আলো— যা 'অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন' । ৫. সেই পাখিনী— যে উজ্জ্বল, এবং সন্তপ্ত প্রেমের সম্মুখে 'অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন' ।

এ কবিতায় 'সেই' বিশেষণটি ভাবের আরেকটি যোগসূত্র বেঁধেছে বাক্য থেকে বাক্যান্তরে । 'সেই নারীর' কথাটি প্রথমে এসেছিল 'চেনা হাতের' অধিকারিণীর পরিচয় নির্দেশের জন্যে । বাক্যের পূর্ণচ্ছেদের পরে তিনটি উক্তিতে 'সেই' পদ যখন ফিরে ফিরে আসে, তখন এর যোগ কি সেই নারীর সঙ্গেই নয় ? নাকি এর ইঙ্গিত কবির আবহমান কালের ভালোবাসার দিকে ? তাঁর চিরকাল ভালোবেসে আসা রাত্রির বাতাস, দিনের আলো, আর পাখিনীর সর্বসমর্পণের প্রতি ? আবহমান কালের ভালোবাসার সঙ্গে দিনরাত্রির বিশেষ বিশেষ অবস্থার যোগাযোগ-

অনুভব এই প্রকৃতিপ্রেমিক কবির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু. সেই নারীর সঙ্গে বিশেষ সব দিনরাত্রির স্মৃতি যুক্ত হয়েই শাশ্বত ভালোবাসার আবহ হয়ে উঠছে না কি ছবিগুলি ? আর, পাখি-পাখিনীর উপমায় সহজ মহৎ বিশাল এবং গভীর এক প্রণয়স্মৃতির সঙ্গে আবহমান কাল ভালোবেসে আসা নারীর সম্পর্কের দ্যোতনা কি নেই 'সেই' পদের পৌনঃপুনিক প্রয়োগে ? এ-সবই অবশ্য আবার কবির প্রার্থিত 'একটি কথা'র উপমা।

কবিতার শেষে উজ্জ্বল পাখিনীর প্রসঙ্গে আর-একটি উপমেয়-উপমান এসেছে— প্রণয়ী পাখির পিপাসার সঙ্গে প্রদীপ্ত অগ্নির তুলনায়। এ তুলনা কবির পিপাসা-কেও ভাস্বর করে। কিন্তু এই আগ্নেয় পিপাসা সুবিপুল প্রেমের অভিষেকে স্নিগ্ধ হবার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে অতীত-সুনিবিড় কোনো মিলনস্মৃতিতে নিবিষ্ট। কবিতার শেষে প্রার্থনার স্বরও যেন গলে-যাওয়া মোমের কোমলতা অঙ্গীকার করে স্নিগ্ধতায় দ্রবীভূত। একবার, তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে দিনানুদৈনিক মালিন্যের অপনোদন-আকাঙ্ক্ষায় সংক্ষোভের স্বর জেগেছিল, তারপরেই সকল উত্তেজনা শমিত করে শান্ত সংবেদে কাঙ্ক্ষিত বাণীর প্রতিরূপ সৃষ্টিতে নিমগ্ন হয়েছেন কবি। এবং, এই প্রতিরূপগুলিকে অভিব্যক্তি দিতে দিতে কবি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত 'কথা'র 'সহজ মহৎ বিশাল, গভীর'তা আস্বাদ করেছেন। পাঁচটি উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সাধারণ গুণের পরিচয় ঐ চারটি বিশেষণে বলা হয়েছিল।

কবিতাটিতে জীবনানন্দীয় গুণ লক্ষ করি সহজ ভাষায় প্রগাঢ় অনুভূতি জড়ানো 'চেনা হাতের' উল্লেখে। পাখির স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে 'পাখিনী' শব্দপ্রয়োগও জীবনা-নন্দ-সম্ভব। বিদেশী শব্দকেও সংলগ্ন ন-যুক্ত ধ্বনির অনুপ্রাস-সজ্জার ভিতর দিয়ে বেশ খাপ খাইয়ে নেন জীবনানন্দ— 'এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন'।

দুই.

কবিতাখানিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন ত আর র। ২৪টি করে আছে এই দুই ধ্বনি। ত-য়ের মতো কোমলস্বভাবের অন্য ব্যঞ্জনগুলির কথা এইখানেই বলে নেব। ল এই কবিতায় আছে ১০টি। ঘোষতার দরুন কোমলস্বভাব হিসেবে বিবেচিত অন্য ব্যঞ্জনগুলির ভিতরে ব রয়েছে ৬টি, দ ৫টি, গ ৩টি, ড ১টি, ড় ১টি, আর হসন্ত জ ২টি। মোট ১৮টি। র-ব্যঞ্জনও ঘোষতার দরুন হাই সাহেবদের

বর্ণনায় মধুর-কোমল শ্রেণীতেই স্থান পেয়েছে। কোমল ব্যঞ্জনগুলিকে একসঙ্গে সাজালে পাই— ত ২৪ + ল ১০ + বিভিন্ন ঘোষ ব্যঞ্জন ১৮ + র ২৪ = মোট ৭৬টি।

নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলিও মধুর আর ঘোষ। এতে ন আছে ২২টি, ম ১৬টি। মোট ৩৮টি নাসিক্য ব্যঞ্জন। ৭৬টি মধুর আর কোমল ধ্বনির সঙ্গে ৩৮টি মধুর নাসিক্যধ্বনি যোগ হলে, মোট ১১৪টি কোমল-মধুর ব্যঞ্জন পাওয়া যায় আলোচ্য কবিতায়।

ব্যঞ্জনাশক্তিতে লঘু বলে অঙ্গগঠনের উপাদানমাত্র বলে চিহ্নিত করা যায় ১২টি ক, ৬টি প, আর ১টি ট-কে। মোট ১৯টি ধ্বনি।

এই কবিতায় উষ্মধ্বনি রয়েছে ২৬টি— শ ১৫ + স ২ + হ ৯। উষ্মতাধর্মী স্বরান্ত ঘৃষ্ট চ ৩ + ছ ১ + জ ৫ = ৯টি, স্বরান্ত মহাপ্রাণ খ ৪ + থ ১ + ধ ১ + ভ ৩ = ৯টি— আর হসন্ত মহাপ্রাণজাতীয় খণ্ড ৎ ১১টি। ৯ + ৯ + ১ = ১৯টি উষ্মতাধর্মী আর ২৬টি উষ্মধ্বনি— একযোগে ৪৫টি উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জন। এই ৪৫টি ব্যঞ্জনের ১০টিতে আবার সন্নিহিত নাসিক্য ব্যঞ্জনের অনুরণন সঞ্চারিত হয়েছে। যেমন— **চে**না, **সমস্ত**, আব**হ**মান, অন্ত**হী**ন, এঞ্জিন-**চঞ্চ**ল, পা**খি**নীর, অন্তিম**শ**রীরিণী পদগুলির মোটা হরফে ছাপা ১০টি উষ্মতাযুক্ত ধ্বনিতে। তাই, ৩৮টি নাসিক্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে ঐ ১০টি ব্যঞ্জনের নাসিক্য অনুরণন যোগ হচ্ছে।

কবিতা বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে আমবা দেখে আসছি, উষ্মতাধর্মী ধ্বনি আর নাসিক্যগুণান্বিত ধ্বনির পরস্পর সহযোগ কবিতাব ব্যঞ্জনায় বিশেষ মাধুর্যপ্রভাব বিস্তার কবে। কবিতার ব্যঞ্জনগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে সাজাচ্ছি— উষ্মতা-ধর্মী, নাসিক্যগুণান্বিত, কোমল (ত, ল, এবং অন্য ঘোষ ধ্বনিগুলি), ক ট প চ্— এই ব্যঞ্জনা, গুণে, হীন উপাদানধর্মী ব্যঞ্জন। এ ছাড়া প্রায়শ বহুল ব্যবহৃত র-ধ্বনিটিকে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা মধুর পর্যায়ে রেখেছেন, আমরা দেখেছি। নাসিক্য, কোমল ও মধুর ধ্বনিগুলির সঙ্গে উষ্মতাময় ধ্বনিগুলির আবহরচনার ক্ষমতায় বিশেষ চারিত্রিক ভেদ আছে। ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ কবিতায় উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনের অপরাহত প্রভাব আছে, তবু, সেখানে অন্যান্য কোমল-মধুর ধ্বনির সূত্রে কবিতায় নিহিত মাধুর্যের অনুভব ব্যঞ্জিত হয়েছে।

জীবনানন্দের এই কবিতাটিতে মোট ব্যঞ্জনের সংখ্যা ১৭৮টি। তার ভিতরে নাসিক্যপ্রভাব-যুক্ত ৩৫টি ধ্বনি উষ্মশ্বাস ছড়ায়। ১৭৮ থেকে ৩৫ বাদ দিলে ১৪৩টি ধ্বনি থাকে। তার থেকে ১৯টি ক ট প বাদ দিলে ১৪৩ — ১৯ = ১২৪টি ধ্বনিতে কোমলতা আর মাধুর্যের দ্যোতনা রয়েছে।

ব্যঞ্জন ব্যবহারে উষ্মশ্বাস এবং কোমলতা ও মাধুর্য গুণের অনুপাত থেকে বোঝা যায়, কবিতাটি প্রার্থনামূলক হলেও এই চাওয়াতে না পাওয়ার হুতাশের চেয়ে মাধুর্যের বোধই বেশি। ফলে, কবিতার মূলস্বরটি হয়েছে কোমল-মধুব। এই বিচার থেকে বলা যায় যে, প্রার্থিত বস্তুর উপমা হিসেবে আবহমান কাল ধরে ভালোবেসে আসা বিষয়গুলির উল্লেখ করতে গিয়ে কবি সেই ভালো-লাগার রসে আপ্লুত হয়েছেন। বিশেষ ধরনের ভালোবাসার স্মৃতিতে সেইবকমের ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা মাধুর্যে নিষিক্ত হয়েছে।

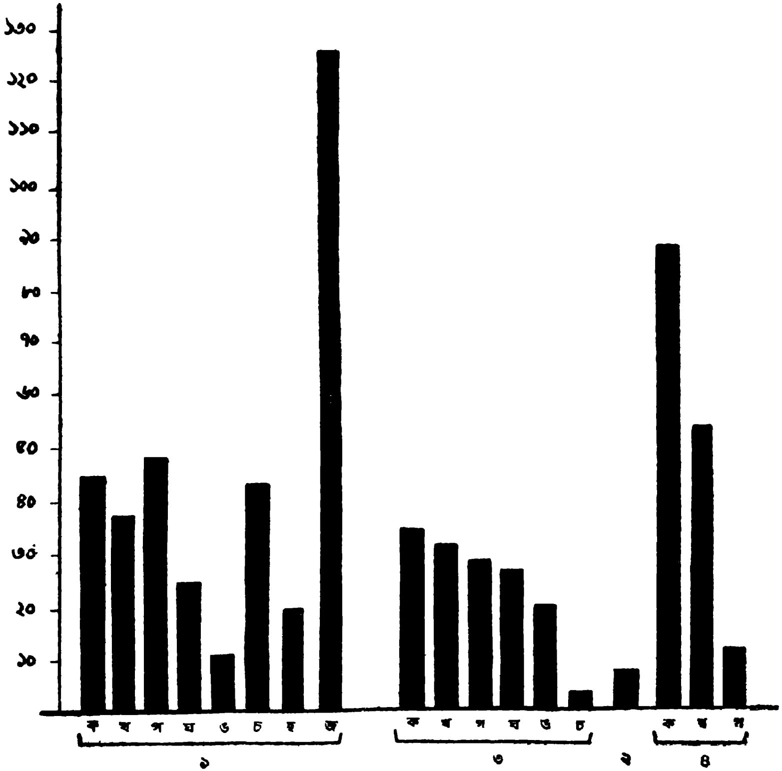
তিন.

অর্ধস্বর বা অর্ধব্যঞ্জনেব সংখ্যা কবিতাটিতে সবসমেত ৬টি। ১টি ছাড়া সব কটি হসন্ত। অর্ধস্বব বা অর্ধব্যঞ্জনের উচ্চারণে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরের প্রভাবের চরিত্র অনুসারে কিছু উষ্মতা দেখা দেয়। সন্নিহিত স্ববের উপর এই নির্ভরতার দরুন এ-সব ধ্বনির উষ্মতা পরিমাণের হিসেব করতে অনেক খুঁটিনাটি বিবেচনায় যেতে হয়। অত সূক্ষ্ম বিচাবে না গিয়ে, এ কবিতার ৬টি অর্ধস্বর বা ব্যঞ্জনকে ৩টি পূর্ণ ধ্বনির কাছাকাছি উষ্মতাসঞ্চারী হিসেবে ধরলেও, উষ্মতাধর্মী ধ্বনি নাসিক্য ব্যঞ্জনের মোট সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে না— সমান দাঁড়াবে। আর উষ্মধর্মের পাশে এ কবিতায় তার তিন গুণের বেশি মধুর-কোমল ধ্বনিগুলির ভূমিকার কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

চার.

স্বরধ্বনির হিসেব নিয়ে, এ কবিতাতে অর্ধসংবৃত ও-স্বর সবচেয়ে বেশি পাই। বিবৃত আ তার পরেই, কিন্তু অনেক পিছনে। আর, সংবৃত ই ধ্বনি আর অর্ধসংবৃত এ তার চেয়ে খুব পিছিয়ে নেহ। ও ৩৪টি, আ ২৯টি, ই ২৮টি, এ ২৬টি। অর্ধ-বিবৃত অ এই কবিতায় ১৯টি, সংবৃত উ সাকুল্যে ৩টি। সংবৃত আর অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি মোট ৩৪+২৮+২৬+৩=৯১, বিবৃত আর অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি ২৯+১৯=৪৮টি। বিবৃত-অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি সংখ্যায় সংবৃত-অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনির প্রায় অর্ধেক। আমরা লক্ষ করেছি, প্রথম ধরনের ধ্বনিগুলিতে মুক্তির ভাব, এবং দ্বিতীয় ধরনের ধ্বনিতে সংবরণের চাপ অনুভব করা যায়।

৯ ছত্রের এই কবিতাটিতে আরো একটি ব্যাপার চোখে পড়ছে— ই আর ও



১। উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি — ৪৫

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি — ৩৮

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি + নাসিক্য অনুরণনযুক্ত উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি —

৩৮ + ১০ = ৪৮

কম্পনজাত ব্যঞ্জনধ্বনি — ২৪

পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি — ১০

উপাদানধর্মী কোমল ব্যঞ্জনধ্বনি — ৪২

(= ১২৪)

সাধারণ উপাদানধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি — ১৯

২। অর্ধস্বর বা অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি — ৬

৩। স্বরধ্বনি ও — ৩৪
" আ — ২৯
" ই — ২৮
" এ — ২৬
" অ — ১৯
" উ — ৩

৪। মুক্তদল — ৮৮
রুদ্ধদল — ৫৩
সম্যক্ রুদ্ধদল — ১১

প্রথম ছত্রে সংখ্যায় ১ থেকে বেড়ে গিয়ে শেষ ছত্রে যথাক্রমে ৬ আর ৮ হয়েছে। আর, আ ৭ থেকে যাত্রা শুরু করে দ্বিতীয় ছত্রে ১টি হয়ে গিয়ে, পরে আবার কিছুটা বাড়লেও শেষ ছত্রে সম্পূর্ণ উধাও হয়েছে। মনে হয়, কবিতাটিতে আবেগের চাপ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। কিন্তু এ চাপ শ্বাসরোধকারী হয় নি, কারণ, ন ম ত ব ধ্বনিগুলি পরিবেশে পূর্বাপর কোমল মাধুর্যের ব্যঞ্জনা বিস্তার করছে। শেষ ছত্রে ত আর ন রয়েছে ৪+৪=৮টি, ম আর র রয়েছে ৫+৫=১০টি; সবমোট ১৮টি। তুলনায়, চাপযুক্ত শ ১+ই ৬+ও ৮=১৫টি। অর্থাৎ মধুর এবং কোমল ধ্বনির প্রভাবে প্রার্থনার ঐকান্তিকতার চাপের সঙ্গে প্রশান্তির স্বর কবিতাশেষে যুগপৎ জেগেছে।

পাঁচ.

কবিতাটিতে মোট দল বা সিলেব্‌ল ১৪১টি। তার ভিতরে ৮৮টি মুক্তদল, আর ৫৩টি রুদ্ধদল রয়েছে। চরণভিত্তিক দলবিন্যাসের একটি সারণী দেওয়া যাক।

	মুক্তদল	রুদ্ধদল
প্রথম চরণ	১১	৩
দ্বিতীয় চরণ	৩	৩
তৃতীয় চরণ	১৩	৬
চতুর্থ চরণ	১০	৬
পঞ্চম চরণ	১৫	৪
ষষ্ঠ চরণ	৯	৭
সপ্তম চরণ	৫	১১
অষ্টম চরণ	১০	৬
নবম চরণ	১২	৭

পঞ্চম চরণে মুক্তদল আর সপ্তম চরণে রুদ্ধদলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অনাদিকাল থেকে অব্যাহত বয়ে-আসা চির-ভালোবাসার কথা বলতে পঞ্চম চরণের ১৫টি মুক্ত-দলের অবাধ গতি সাহায্য করছে। 'আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর'। সপ্তম পঙ্‌ক্তিতে আলোর অনিবার পক্ষচালনার কথা ব্যক্ত করতে ১১টি রুদ্ধদল এল। ডানা কোথাও-না-কোথাও বদ্ধ থেকেই সঞ্চালিত হবে নিশ্চয়ই। 'সেই দিনের—আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন' ছত্রের বদ্ধ নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার মতো। প্রলম্বনধর্মী ন-ধ্বনির অনুপ্রাস

এখানে রুদ্ধদলের সীমাকে অতিক্রমণ করছে। যৌগিক ধ্বনিশেষের অর্ধস্বর বা র ল ধ্বনিতে, অথবা ন ধ্বনিতে রুদ্ধ এই পঙ্‌ক্তির ১১টি রুদ্ধদল। ঐ কটি ধ্বনির কোনোটিই সম্যক্‌ভাবে রুদ্ধ হয় না, আমরা জানি। রুদ্ধতা সত্ত্বেও যথাযথ রুদ্ধতা এল না— ডানার অন্তহীন চঞ্চলতার ধ্বনিনির্দেশ এ উপায়েই ধরা পড়েছে চরণটিতে। 'জাফরাণের ফুলে'র বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেমন বলেছিলেন—'এ কী চঞ্চলতার ডানা বৃন্তে বাঁধা ?', তেমনি প্রশ্ন করা যেতে পারে এই রুদ্ধদলের অনিরুদ্ধ স্পন্দন সম্পর্কে। আলোর অন্তহীন কম্পনে অগ্রগতি নয়, নিয়ত চাঞ্চল্যের বোধ জাগে। সেই জন্যে উষ্মজাতীয়, কম্পনজাত, এবং তরল ও নাসিক্য প্রলম্বিত ধ্বনিতে রুদ্ধদলগুলি অগ্রগতিহীন স্পন্দনের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করল সার্থকভাবে।

ছয়.

সমগ্র কবিতাটিতেই সম্যক্‌ভাবে রুদ্ধদলের সংখ্যা কম। ৫৩টি রুদ্ধদলের মাত্র ১১টি সম্পূর্ণ রুদ্ধ। এক**টি**, সহ**জ**, মহ**ৎ**, ভু**ক**, র**ক্তে**, রা**ত্রি**র, **নক্ষ**ত্রালোকিত, **উজ্জ্ব**ল, অ**গ্নি**র, প্রদী**প্ত**— এই ১০টি পদের ১১টি চিহ্নিত দল পুরোপুরি অবরুদ্ধ। অন্য রুদ্ধদলগুলিকে ধরে থেকে ধ্বনিস্রোত দলকে সামান্য ছাপিয়ে যাবার সুযোগ পায়। অনবরুদ্ধ ব্যঞ্জনের এই ঈষৎ প্রলম্বিত স্বভাবের কথা আমরা ব্যঞ্জনধ্বনি-চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছি। বাস্তবিক, অনবরুদ্ধ ব্যঞ্জনে সমাপ্ত রুদ্ধদল ভাষার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে রুদ্ধ অথচ অনিরুদ্ধ— এই যৌগিক বৈশিষ্ট্যের যোগান দেয়।

সাত.

সুনিবদ্ধ কাব্যছন্দ নেই এ কবিতায়। বক্তব্যের স্বর অনুযায়ী যতিপাত করে পাঠ করা চলে কেবল। নিরূপিত ছন্দের স্থলে— কবিতায় লাবণ্য এসেছে বক্তব্য বিষয়ের, আর তুলনার রূপগুলির অন্তর্লীন সৌন্দর্যে। আর, অবিরল অনুপ্রাসের প্রয়োগে।

'সহজ মহৎ বিশাল' এবং পরের লাইনের 'গভীর' বিশেষণ চারটির প্রত্যেকটি দ্বি-দল শব্দের প্রথম দল মুক্ত ও দ্বিতীয় দল রুদ্ধ। এই ধ্বনিগত ঐক্য পদ কটির উচ্চারণে অনুপ্রাস এনেছে। 'সহজ মহৎ বিশাল' পঙ্‌ক্তির উষ্মতাজাত ধ্বনিসাম্য লক্ষ করবার মতো। কবির প্রত্যাশার ধ্বনি ঐ উষ্মতায় উচ্চারিত হয়েছে। তৃতীয় চরণে আছে ও-স্বরধ্বনি আর ত ব্যঞ্জনের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ— 'সমস্ত ক্লান্ত

হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে'। পঞ্চম চরণে স্বরান্ত জ ভ ছ এবং হ আর ৩টি শ-ধ্বনির উষ্মতায় অনুপ্রাস ঘটেছে— 'যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর'। ভালোবাসার উষ্মশ্বাস উষ্ণধ্বনির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছত্রটিতে। সপ্তম পঙ্‌ক্তির ন-ধ্বনির অনুপ্রাস মাধুর্যের কথা 'এঞ্জিন' শব্দ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। অষ্টম ছত্রে ৩টি শ, ১টি স, ২টি স্বরান্ত জ, আর ২টি স্বরান্ত খ-য়ের উষ্মতা যেন পরস্পর ফিসফিস করে পাখি আর পাখিনীর প্রণয়কথা বলছে— 'সেই উজ্জ্বল পাখিনীর— পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে'। আর, শেষ পঙ্‌ক্তির র ম আর ত-ধ্বনির আবর্তিত বিন্যাসে কবির আকাঙ্ক্ষিত সেই 'কথা'র সহজ মাধুরী আমাদের বোধে সঞ্চারিত হয়।

'আমাকে একটি কথা দাও' কবিতার ধ্বনি এবং দল সমাবেশের ধরন এবং অনুস্যূত অনুপ্রাসব্যঞ্জনা কবির আত্মার প্রার্থনায় নমিত কোমল স্বরটিকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। চিত্র-খচিত কবিতাটি চিত্রে যা বলে, ধ্বনিতেও তার দ্যোতনা মুখর। কবিতাটিতে বক্তব্যের চেয়ে চিত্রই রয়েছে বেশি। উপর্যুপরি চিত্রে প্রার্থিত বিষয়ের প্রতিরূপ এঁকে রূপের ছন্দে, আর সংশ্লিষ্ট ধ্বনির সংকেতে কবি তাঁর একান্ত চাওয়ার সংবেদন আমাদের প্রাণে পৌঁছিয়েছেন।

পুনর্বার স্মরণ করা ভালো, কবিতা সৃষ্টির কালে কবি-আত্মার দীপ্ত শিখাটি স্বভাবতই উপযুক্ত ধ্বনি-অঙ্গে আত্মসমর্পণ করে। কোন্ ব্যঞ্জন বা স্বর কটি করে ব্যবহার করে সৃষ্টি সম্পন্ন করতে হবে, এ বিবেচনায় কবিকে কালক্ষেপ করতে হয় না। উপস্থিত ধরনের কৌতূহলী বিশ্লেষণ কাব্যের অবয়বের সঙ্গে আত্মার নিগূঢ় সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করে যুক্তিবাদী রসিক চিত্তকে তৃপ্ত ও তার রসাস্বাদকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারে।

ঙ. ভিখিরির আবার পছন্দ

এক.

কবিতায় ব্যবহৃত সমস্ত ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে অভিপ্রেত ব্যঞ্জনার অভিমুখী হতে পারে না। অর্থবান শব্দগুচ্ছকে মনের মতো করে সাজিয়েই কবি তাঁর অভীষ্টে উপনীত হন। অর্থযুক্ত শব্দের প্রত্যেক ধ্বনি যেমন আলাদা আলাদা ভাবে সে শব্দের অর্থের প্রতি নির্দেশ করতে পারে না— তেমনি কবিতায় বিন্যস্ত শব্দাবলীর সব ধ্বনিও ব্যঞ্জনার প্রতি একলক্ষ্য হতে পারে না। মূর্তিকে সৌষ্ঠব দিতে, কাঠামোকে

অবলম্বন করে তাতে মাটি চাপাতে হয়— নানা উপায়ে চিক্কণতা আনতে হয়। তেমনি শব্দকাঠামো দিয়েই সুকুমার কবিতার খাঁচাটি তৈরি হয়ে থাকে। তবে, এক শব্দের নানা প্রতিশব্দ থাকে বলে -- এক বক্তব্যকে নানা ভাষা আর ভঙ্গিতে প্রকাশ করা যায় বলে— কবিতার গূঢ় ব্যঞ্জনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ধ্বনিযুক্ত শব্দ চয়নের সুযোগ কবিদের হাতে থেকেই যায়। সেই সুযোগ চিক্কণতা-বিধানের উপায় হতে পারে তখন।

আমরা জানি, 'নিৰ্জ্জনের অন্ধকারে'[৩৩৪] জাত শ্রবণাতীত কাব্যধ্বনিটিকে মনের কানে শুনতে শুনতে কবিতার উপযোগী অঙ্গসৃজনে যত্নবান হন। তাই কাব্যভাষার শব্দকাঠামোর ভিতরে ভাবব্যঞ্জনার অনুকূল ধ্বনিযুক্ত শব্দাবলী স্বভাবত অগ্রাধিকার পায়। 'চম্পা' শব্দের হসন্ত ওষ্ঠ্যধ্বনি ম-য়ের উচ্চারণে নিবিড় নিম্নকণ্ঠ গাম্ভীর্য[৩৩৫] ধ্বনিত হয়। কিন্তু এই গুণের লাঘব ঘটে 'চাঁপা' শব্দে, মুক্ত ধ্বনিতে আ-কারের সঙ্গে অনুনাসিকতামাত্র যোগে।[৩৩৬] আ-কারে আবার আবেগ আপনাকে ধরে না রেখে অবারিত করে দেয়। তাই 'চম্পা' কবিতার 'আমি চম্পা'র স্থলে 'চাঁপা আমি' উচ্চারণে কথকের নামের গরিমা প্রকাশের গুরুত্ব কমে যায়। এর দরুন কবিকে 'চাঁপা' শব্দ ছেড়ে 'চম্পা' শব্দ সংকলন করতে হয়।

কবিতায় কোন্ উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের ধ্বনি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে, তা পরীক্ষা করে কবিতাটির মূলস্বরের সন্ধান করছি আমরা। কবিতার অভিধাগত অর্থের সঙ্গে বাক্ধ্বনির ও তার বিন্যাসের নানা তাৎপর্য মিলিয়ে দেখে ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে ধ্বনির ভূমিকা বিচারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, কবিতার দ্যোতনা অর্থসাপেক্ষ বটে, তবে বাক্ধ্বনি বা বিচিত্র ছন্দধ্বনির বিন্যাসবৈশিষ্ট্য শব্দগত অর্থমাত্রের চেয়ে গূঢ়তর তাৎপর্যে কবিতাকে দীপ্ত করতে পারে।

দুই.

শঙ্খ ঘোষের 'ভিখিরির আবার পছন্দ' কবিতাটিকে এবার বিশ্লেষণ করে দেখব আমরা। প্রথমে কবিতাটি উদ্ধৃত করি।

> থাক সে পুরোনো কাসুন্দি
> যুক্তিতর্ক চুলোয় যাক
> যেতে বলছ তো যাচ্ছি চলে
> ভাঙবার শুধু সময় চাই!

ভাঙবার শুধু সময় চাই
এ রাস্তা থেকে ও রাস্তায়
হব কদিনের বাসিন্দা
কে না জানে সব অনিত্য।

কে না জানে সব অনিত্য
নিয়ে যাই তাই খড়কুটো
বেঁচে যে রয়েছি এই না ঢের
ভিখিরির আবার পছন্দ।

ভিখিরির আবার পছন্দ
ঠিকই পেয়ে যাব যে-কোনো ঠাই
আবারও ভাঙার প্রতীক্ষায়
কেটে যাবে দিন আনন্দে।

কেটে যাবে দিন আনন্দে
ভাসমান সব বাসিন্দার
জীবন তো একই কাসুন্দি
ভিখিরির আবার পছন্দ![৩৩৭]

কবিতাটি নিরূপিত ছন্দের। চরণের প্রথম পর্বগুলিতে ষড্‌মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত-রীতির শাসন পাওয়া যাবে আগাগোড়াই, কেবল, 'ভিখিরিরাবার', 'ঠিকি পেয়ে যাব', 'আবারো ভাঙার', 'জীবন তো অ্যাকি' পড়তে হবে— এই যা। এত হিসেব না করেও আমরা এ-সব ক্ষেত্রে অমন পড়েই থাকি। শেষ পর্বগুলো কিন্তু স্বেচ্ছাচারী, কখনো চতুর্মাত্রিক কখনো পঞ্চমাত্রিক, বিভিন্ন স্তবকের পঙ্‌ক্তিতে বিভিন্ন রকম, কোনো স্তবকের সঙ্গে কোনো স্তবকের মিল নেই। খণ্ড পর্ব বলে পড়বার তেমন অসুবিধে হয় না। অন্য দিকে, হিসেবের ছন্দে খানিক হেলাফেলা করে কবিতাটি অন্যতর মিলের সুষমা জড়িয়ে নিয়েছে সর্বাঙ্গে। প্রতি স্তবকের শেষের চরণ পরের স্তবকের প্রথম চরণ হয়ে এসে মিল রচনা তো করছেই, 'থাক সে পুরোনো কাসুন্দি / যুক্তিতর্ক চুলোয় যাক' বলতেও প্রথম পঙ্‌ক্তির আরম্ভ আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষে 'থাক' আর 'যাক' মিলের চমক সৃষ্টি করেছে।

তা ছাড়াও প্রথম স্তবকে 'কাসুন্দি', দ্বিতীয়ে 'বাসিন্দা', তৃতীয়ে 'পছন্দ', চতুর্থে 'পছন্দ' আর 'আনন্দে' পদে 'ন্দ'-ধ্বনি প্রতি স্তবকে আবৃত্ত হবার অনতিপ্রকট মিলের সূত্রে অগ্রসর হয়ে শেষ স্তবকেব চারটি ছত্রে পরপর উচ্চারিত হচ্ছে। প্রতি চরণের শেষে 'আনন্দে', 'বাসিন্দার', 'কাসুন্দি' আর 'পছন্দ' সন্নিবেশে প্রারম্ভিক মুক্তধ্বনির পরেই বদ্ধধ্বনি-সংঘাতের সাম্য, অন্ত্যমিলশূন্য কবিতাটিতে অন্যরকমের এক ছন্দ জাগিয়ে তুলেছে।

শেষোক্ত এই সাম্য শব্দালংকারের পর্যায়ভুক্ত বটে, কিন্তু বিভিন্ন স্তবকে দূরে দূরে বিন্যস্ত ঐ ধ্বনিসাদৃশ্য পূর্বাপর কবিতাটিকে অন্যতর এক ঐক্যবন্ধনেও বেঁধেছে। সে কথা পরে বিশদ করব।

তিন.

'ভিখিরির আবার পছন্দ' কবিতায় ১৮৭টি ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। আর অর্ধব্যঞ্জন আছে ১৪টি। এই ধ্বনিগুলির উচ্চাবণ নিষ্পন্ন করবার জন্যে স্বরধ্বনি রয়েছে ১৫৯টি। উষ্মতাধর্মী ও নাসিক্যগুণান্বিত ধ্বনিগুলি কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে, কবিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা তার পরিচয় পাচ্ছি। তাই প্রথমেই এই দুই ধ্বনির হিসাব করে, পরে অন্য ধ্বনিগুলির হিসেব করব।

উষ্মধ্বনি এই কবিতায় আছে ১৬টি। ১৩টি শ+২টি স+১টি হ। স্বরান্ত ঘৃষ্ট আর স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি কবিতায় উষ্মতার প্রভাব বাড়িয়ে তুলেছে। স্বরান্ত ঘৃষ্টধ্বনি আছে ২৪টি। ৫টি চ+৬টি ছ+১৩টি জ। স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির সংখ্যা ১৯। খ ৫টি+ঠ ২টি+থ ২টি+ধ ২টি+ভ ৭টি+ঢ ১টি। ফলে উষ্মতাধর্মী ধ্বনির সংখ্যা দাঁড়াল ১৬+২৪+১৯=৫৯টি।

নাসিক্য ব্যঞ্জন ন এই কবিতায় রয়েছে ২৬টি, ম আছে ৩টি, ঙ-ও ৩টি। মোট ৩২টি। এর সঙ্গে 'বেঁচে' আর 'ঠাঁই' পদের দুটি এঁ আর আঁ স্বরের অনুনাসিক ব্যঞ্জনাও গণনা করতে হবে। তা ছাড়া সন্নিহিত নাসিক্য ব্যঞ্জন ও অনুনাসিক স্বরের রণনযুক্ত উষ্মতাপূর্ণ ধ্বনিগুলির হিসেব নেওয়া দরকার। কা**সু**ন্দি, **ভা**ঙবার, **স**ময়, **ভা**ঙবার, **স**ময়, বা**সি**ন্দা, **জা**নে, **জা**নে, বেঁ**চে**, প**ছ**ন্দ, প**ছ**ন্দ, **ঠাঁ**ই, **ভা**ঙার, বা**সি**ন্দার, কা**সু**ন্দি, প**ছ**ন্দ পদের মুদ্রিত মোটা হরফের ১৬টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনিতে নাসিক্যগুণের সঞ্চার হচ্ছে। অর্থাৎ ৩২+২+১৬=৫০টি ধ্বনি নাসিক্যগুণান্বিত।

এখানে মনে রাখতে হবে, শেষোক্ত ১৬টি ধ্বনি উষ্মতাগুণসম্পন্নও বটে। উষ্মতার সঙ্গে নাসিক্যরণন যুক্ত হয়ে হুতাশের সঙ্গে বেদনা-মধুর নিবিড়তা ব্যঞ্জিত করে।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির ভিতরে ঘোষধ্বনির সংখ্যা সুপ্রচুর। ফলে ঘোষতার দরুন কোমলধর্মযুক্ত ধ্বনির সংখ্যা প্রায় কবিতাতেই যথেষ্ট সংখ্যক দেখা যায়। উপস্থিত কবিতাতে ১৮টি ব+১২টি দ+১টি ড=মোট ৩১টি ব্যঞ্জনে ঘোষতার ফলে কোমলতা দেখা দেবার কথা। ত-ধ্বনিটিতেও কোমল ব্যঞ্জনা আছে বলে বাঙালির রায় পেয়েছি আমরা ব্যঞ্জনধ্বনিচরিত্র প্রসঙ্গে। এ কবিতায় ত ব্যবহার হয়েছে ১৩বার। ললিত ও তরল ঘোষধ্বনি ল আছে ৩টি। সর্বমোট কোমল ধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে ৩১+১৩+৩=৪৭টি।

মধুরস্বভাব র-ধ্বনি কবিতাটিতে আছে ২২টি। এটিও ঘোষধ্বনির শ্রেণীভুক্ত। ব্যঞ্জনাশক্তিতে উনো ক আছে ১৭টি, হসন্ত চ ১টি, প ৬টি, ট ৩টি। এই ২৭টি ব্যঞ্জনকে নিতান্ত কাঠামো তৈরির উপাদান বলা যেতে পারে।

এখন, আধিক্যক্রম অনুযায়ী ধ্বনি কটিকে সাজিয়ে দেখা যাক।

উষ্মতাধর্মী ধ্বনি	৫৯
নাসিক্যগুণাশ্রিত ধ্বনি	৩২+২+১৬
কোমলস্বভাবের ধ্বনি	৪৭
কাঠামো তৈরির জন্য উপাদানজাতীয় ধ্বনি	২৭
মধুরস্বভাব ধ্বনি	২২

অতগুলি উষ্মতাব্যঞ্জক বাক্‌ধ্বনির সঙ্গে কবিতার আত্মার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলেই ধারণা হয়। মধুর র-ধ্বনি কটিকে কোমলস্বভাবের ধ্বনির সঙ্গে একত্র গণনা করলে অবশ্য উষ্মতাগুণযুক্ত ৫৯টি ধ্বনির চেয়ে ঐ-সব ধ্বনি সংখ্যায় বেশি হবে। ২২+৪৭=৬৯টি কোমল-মধুর ধ্বনি। নাসিক্যগুণসমৃদ্ধ ধ্বনি ও ঘোষ ধ্বনি, সে কথাও মনে রাখতে হবে। তবু, স্বতন্ত্রভাবে উষ্মতাপূর্ণ ধ্বনির সংখ্যাধিক্য নিশ্চয়ই তাৎপর্যবাহী।

এখানে আরো কয়েকটি ধ্বনির কিঞ্চিৎ উষ্মতা আমরা হিসেবে আনতে পারি। অর্ধব্যঞ্জন বা অর্ধস্বরগুলির উষ্মতার গুণে সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির প্রভাব তারতম্য ঘটায় জেনেও, এই-সব ধ্বনির উচ্চারণে বাতাসে যে ঈষৎ চাপ সৃষ্টি হয়— সে কথা মনে রাখা দরকার। আলোচ্য কবিতাটিতে ৩টি স্বরান্ত এবং ১১টি হসন্ত অর্ধব্যঞ্জন— মোট ১৪টি ঈষৎ উষ্মতাধর্মী ধ্বনি রয়েছে।

চার.

অভিধাগত অর্থের অনুসরণে বোঝা যায়, কবিতাটিতে নগরীর যেখানে সেখানে বাসা-বাঁধা ভাসমান মানুষকে ঠাঁই নাড়ার জন্যে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। মাথা গুঁজবার তাগিদে এ রাস্তা থেকে তাড়া খেয়ে ও রাস্তায় গিয়ে খড়কুটো নিয়ে বাসা বাঁধতে হবে আবার। দুর্গতজনের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সব সত্ত্বেও দুঃখী মানুষ এটুকু জানে— 'বেঁচে যে রয়েছি এই না ঢের!' মনের ভিতরে যতই আপত্তি বা আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি থাকুক না কেন সে-সব চাপা দিয়ে, উপস্থিত খানিকটা সময় চাওয়া যায় শুধু ঘর ভেঙে নিয়ে সরে যাবার। কারণ, ব্যাপারটা পুরোনো— নতুন তর্কবিতর্কে ফল নেই। ঘর বাঁধা, আবার ভাঙা, আবার বাঁধা— এ স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে। এমনি করে সুখে দুঃখে ভাসমান বাসিন্দাদের দিন কেটেই যায়।

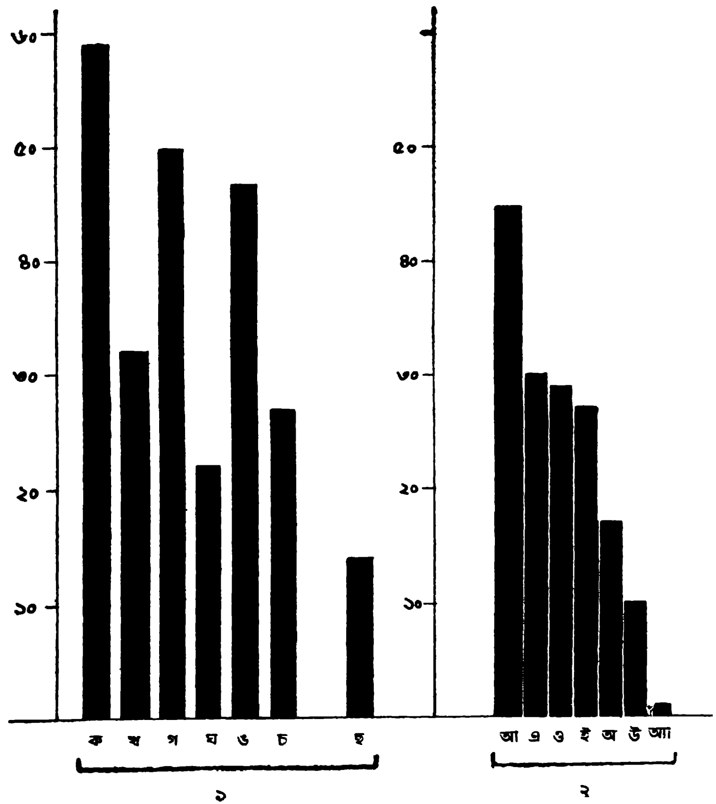
'কে না জানে সব অনিত্য' কথাটি কবিতাটির ভিতরে ঢাকতে সমগ্র মানব-জীবনের গভীর দার্শনিক ভাবনার ছায়া ঘনিয়ে তোলে। বক্তব্যটির সন্নিবেশে বক্রভাব থাকলেও, মূলত প্রসঙ্গটি দার্শনিক বটে।

উষ্মতাপূর্ণ শিসধ্বনিতে বাতাসের চলাচল যে হুতাশ সৃষ্টি করে— আলোচ্য কবিতার হতাশ ক্ষোভ এবং লাঞ্ছনার নিরুপায় স্বীকৃতির ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে, অর্থাৎ মূলস্বরের উচ্ছ্বাসে তা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলতে হয়।

পাঁচ.

স্বরধ্বনির হিসেব নিতে গিয়ে দেখা যায়, উদার প্রকৃতির আ-য়ের ব্যবহার এই কবিতায় সর্বাধিক— ৪৫টি। কাছাকাছি ধর্মের অর্ধবিবৃত অ ১৭টি। অপর অর্ধ-বিবৃত স্বর অ্যা ১টি। তার অর্থ, খোলামেলা ধ্বনি রয়েছে— ৪৫+১৭+১= ৬৩টি। আর ওদিকে সংবৃত ই উ যথাক্রমে ২৭টি আর ১০টি, অর্ধসংবৃত এ ও যথাক্রমে ৩০টি আর ২৯টি। চাপা বা প্রায়-চাপা স্বর তাহলে একুনে ৯৬টি। এই হিসেব থেকে ধারণা করা যায় যে, এ কবিতার প্রধান স্বরটি চাপা। উষ্ম ধ্বনির আধিক্য যে ক্ষোভের ইঙ্গিত এনেছিল, তার সঙ্গে সংবৃত-অর্ধসংবৃত ধ্বনির সংখ্যাধিক্য মিলে কবিতাটির ভিতরে চাপা ক্ষোভের প্রাধান্য নির্দেশ করছে। কিন্তু উদার আ-ধ্বনির সংখ্যাধিক্যের কি কোনো তাৎপর্য নেই?

স্বরধ্বনির বিন্যাস প্রসঙ্গে, কবিতাটিতে 'একই' শব্দের একটিমাত্র অ্যা-ধ্বনির



ভিখিরির আবার পছন্দ ১, ২

১।	ক.	উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি—	৫৯
	খ.	নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি—	৩২
	গ.	নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি+চন্দ্রবিন্দু+ নাসিক্য অনুরণনযুক্ত উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি— (৩২+২+১৬)	৫০
	ঘ.	কম্পনজাত ব্যঞ্জনধ্বনি—	২২
	ঙ.	উপাদানধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি—	৪৭
	চ.	উপাদানধর্মী অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি—	২৭
	ছ.	অর্ধস্বর/অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি—	১৪

২। আ স্বরধ্বনি — ৪৫

এ „ — ৩০

ও „ — ২৯

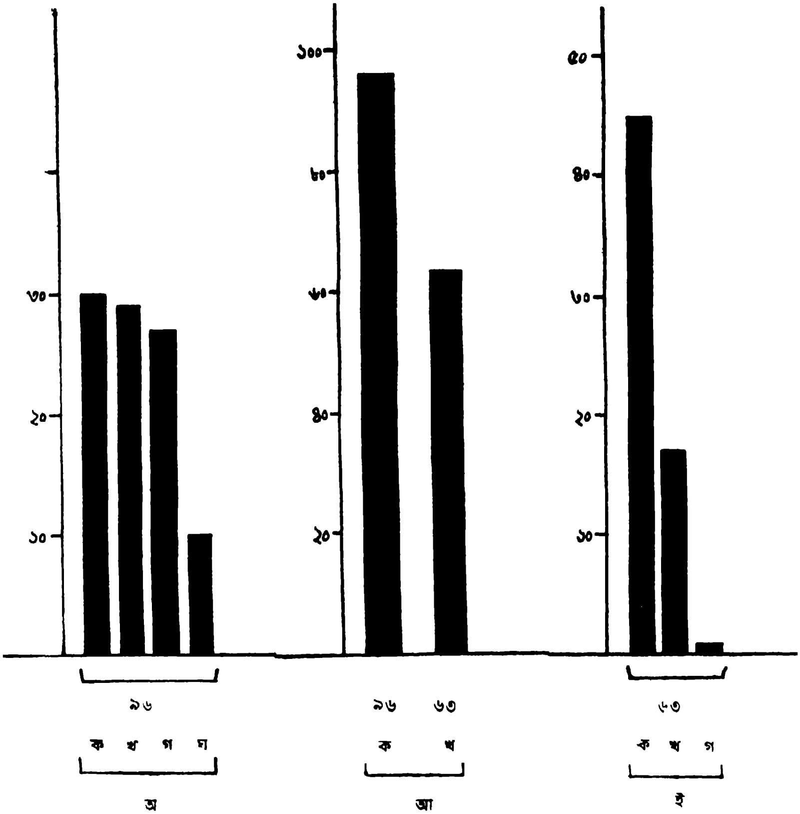
ই „ — ২৭

অ „ — ১৭

উ „ — ১০

অ্যা „ — ১

অ। ক. এ স্বরধ্বনি—৩০
খ. ও " —২৯
গ ই " —২৭
ঘ. উ " —১০
আ। ক. এ+ও+ই+উ স্বরধ্বনি— ৯৬
খ. আ+অ+অ্যা স্বরধ্বনি— ৬৩
ই। ক. আ স্বরধ্বনি—৪৫
খ. অ স্বরধ্বনি —১৭
গ. অ্যা স্বরধ্বনি— ১



বিষয়ে ওই স্বরধ্বনিচরিত্র স্মরণ করি। 'ধ্বনি-বিচার' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অ্যা-র পরে ক-যুক্ত দুটি শব্দের প্রসঙ্গে 'খ্যাঁকর্খেঁকে'[৩৩৮] মানুষের 'বিরক্তি'র, আর 'ড্যাকরা'-র[৩৩৯] 'ডাকাবুকো' চরিত্রেব প্রতি নির্দেশ করেছেন। 'জীবন তো একই কাসুন্দি' বক্তব্যে জীবন সম্পর্কে বিরক্তি বক্তার ভিতরে একটি বেপরোয়া ভঙ্গি এনেছে বললে ভুল হয় না।

'থাক' 'যাক' 'যাচ্ছি' 'চুলোয় যাক' ইত্যাদি পদের আ-কার ই-কার উ-কারে সংশ্লিষ্ট উষ্মতাধর্মী ধ্বনিগুলি হিসহিসানো স্বর ফুটিয়ে তুলেছে। আ-কারের উদারতা রুদ্ধদলে ঠেকে গিয়ে উষ্মতা প্রকাশ করেই স্তব্ধ হচ্ছে।

ছয়.

এবারে. উপস্থিত প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে .উল্লিখিত একটি ধ্বনির পূর্বাপর উপস্থিতির বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ধ্বনিবিন্যাসের গুরুত্বের কথাও আসবে।

চতুর্থ স্তবকের শেষ চরণটির আগে পর্যন্ত প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে একাধিক উষ্ম অথবা উষ্মতাধর্মী ধ্বনির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু স্তবকটির শেষ চরণের প্রথমাংশে 'যাবে' শব্দে একটিমাত্র স্বরান্ত ঘৃষ্টধ্বনিতে শুধু উষ্মতা রয়েছে। আর, সবশেষে 'দিন আনন্দে' বলতে দ-য়ের পরে ন আর ন-য়ের পরে দ দু-ধার থেকে বয়ে এসে মিলল এক ঝুলনের ছন্দে— 'কেটে যাবে দিন আনন্দে'। ঠিক এইখান থেকে কবিতাটির স্বরে ঘটে যায় বিবর্তন। হতাশ ক্ষোভ আর লাঞ্ছনাকে তুচ্ছ-করা আপন ভাগ্যের ব্যাজস্তুতিমূলক শ্লেষ-ভরা এই আনন্দের ছন্দে— পঞ্চম স্তবকে গিয়ে একক কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় বহুর সমস্বর। 'ভাসমান সব বাসিন্দার' উক্তিতে একের কথা সকলের কথা হয়ে ওঠে। ওই 'আনন্দে'র ছন্দ পঞ্চম স্তবকের পূর্ববর্তী চরণ থেকেই 'সব' অর্থাৎ সংহত অনেকের কণ্ঠধ্বনির জানান দিয়ে আসছিল। এর পর, কবিতার উপসংহারের তিনটি ছত্রে উষ্মধ্বনি আছে কি নেই— ভাববার অবকাশ থাকে না আর। বরং সম্মেলক উচ্চারণে 'ভাসমান সব বাসিন্দার', 'জীবন তো একই কাসুন্দি' বলতে সেই হসন্ত ন-য়ের মিলের ছন্দটাই দুলতে থাকে। এমনিভাবে 'ভিখিরির আবার পছন্দ' স্তরের হতাশ্বাস-করুণ বক্তব্যও দলবদ্ধ উচ্চারণে ছন্দের ঝোঁকে হৃদয়ভারকে লঘু করে দেয়। বিদ্রূপের সুর শেষ

ছত্রটিতে বেশ জেগে থাকে। শুনতে পাই, মুখভঙ্গি করে 'বড়োসাহেবের বিবিগুলি নাইতে নেমেছে' বলবার মতো তির্যক লীলাচটুল স্বর।

শেষ চারটি ছত্র যেন কোরাসে বলা হয় স্লোগানের মতো। সকলে মিলে দুর্ভোগ পোহাবার যৌথশক্তিতে দুঃখীজনের শেষ কথা 'ভিখিরির আবার পছন্দ' এইভাবে হয়ে দাঁড়ায় তাচ্ছিল্য প্রকাশের জোরালো জিগির। কবিতার শেষ স্তবকে ধ্বনির এই বিবর্তনে কবিতাটিতে নতুন দ্যোতনা জাগে। কবিতাটির আদ্যন্ত-বিস্তৃত উগ্রতার পাশে পাশে গোপনে সঞ্চরণ করে ন্দ-ধ্বনিটি অতর্কিতে পর্যুদস্ত করেছে উগ্রতাকে। ক্ষোভ দমন করে দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হবার মনোবল অর্জিত হয়েছে বাক্‌ধ্বনির এই ছন্দিত বিন্যাসে। তাই পর্বে ব্যবহৃত প্রায় এক পঙ্‌ক্তি-গুলিই শেষ স্তবকে গিয়ে অন্য স্বরে মুখর হচ্ছে। এই-সব কারণেই কি এ কবিতায় সম্মিলিত হিসাবে সংবৃত-অর্ধসংবৃত ধ্বনির আধিক্য সত্ত্বেও, স্বতন্ত্র হিসাবে উদার আ-ধ্বনির প্রাধান্য ঘটেছে? স্তবক ভিত্তিতে লক্ষ করলে দেখা যায়, 'কে না জানে সব অনিত্য' বলে শেষ করা দার্শনিকভাবের স্তবকটিতে উদার আ-ধ্বনি এসেছে সর্বাধিক।

মূল স্বরের পরিবর্তন প্রসঙ্গে, ছন্দের দিক থেকে দেখতে পাই কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত চালের টানা সুর অন্তরে ধরে রেখেছে। উপসংহারে অস্বীকৃত দুঃখজ্বালা মাত্রাবৃত্তের টানে প্রথমাবধি ভিতরের ব্যথার মতো রয়েই গেছে। তবে, চরণের শেষ পর্বগুলিতে মাত্রার অসমতা তথা স্বেচ্ছাচার কি ধরে নি জ্বালা-জর্জর অসহিষ্ণু মনোভাবকে? খণ্ড পর্বের মাত্রার ছন্নছাড়া চাল কি জানিয়ে দেয় না ছন্দ কেটে যাওয়া দুঃস্থ জীবনের গতি-বিপর্যাসের সংবাদ? মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় খণ্ড পর্বেও সচরাচর মাত্রার এ হেন অসাম্য দেখা যায় না বলেই, এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক মনে হচ্ছে না। 'চুলোয় যাক', 'যাচ্ছি চলে', 'সময় চাই', 'এই না ঢের' খণ্ড পর্বগুলিতে ৪ মাত্রার স্থলে ৫ মাত্রার সন্নিবেশ মুখ-ঝামটা দেবার ভাবটিকে বেশ ফুটিয়ে তুলেছে। উদ্‌ধৃত পদ কটিতে উগ্রতাধর্মী ধ্বনির প্রভাবও অবশ্য গণনার বিষয়।

কবিতার শেষভাগের যূথবদ্ধ উচ্চারণেও সেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দই বহাল আছে। আর, মাত্রাবৃত্ত ছন্দচারণ সত্ত্বেও, ভাষার কথ্যভঙ্গির দরুন এ কবিতায় আগাগোড়াই একটা ঝাঁঝালো সুর তো আছেই, শেষে সমস্বর আবৃত্তিতে বলিষ্ঠতা এসে মাত্রা-বৃত্ত সুরের মন্থরতা ছাপিয়ে যাচ্ছে।

কবিতার বক্তব্যে কোনো প্রতিবাদের কথা আসে নি। কিন্তু ধ্বনি-ব্যবহার-

বৈশিষ্ট্যে, চাপা ক্ষোভ থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্ঘশক্তির দৃপ্ত প্রকাশে বাস্তব অবস্থার প্রতি উপেক্ষা ধ্বনিত হল। জীবনের প্রয়োজনে, চরম দুরবস্থায় দল বেঁধে চলবার উদ্যমে উত্তেজনায় শিরার ভিতরে দবদবিয়ে উঠল প্রাণ। একই কাব্যছন্দ উপান্ত্য স্তবকের 'দিন আনন্দে' বিন্যাসের লীলায় শেষ স্তবকে পেয়ে গেল নতুন ছন্দ— নতুন তাৎপর্য।

ছয়.

কবিতা পাঠের স্বরভঙ্গিও খেয়াল কববাব বিষয়। প্রতি স্তবক শেষের পঙ্‌ক্তিটি পরের স্তবকে ফিরে এলেও, দ্বিতীয়বার পাঠের ভঙ্গি এক নয়। প্রথম স্তবক শেষে উচ্ছেদকারীর প্রতি খানিকটা ঝংকাব মিশিয়ে বলা কথা--'ভাঙবার শুধু সময় চাই' —পরের স্তবকের আবম্ভে আত্মগত উক্তির মতো, অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠ। দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণ পাঠে দার্শনিক আবহ তৈাব হয়— 'কে না জানে সব অনিত্য'। পরের স্তবকে ঐ কথা আবার, খড়কুটো নিয়ে সবে যাবার তৎপরতার ভূমিকা হচ্ছে। এব পর ঐ স্তবকের বাকি দুটি পঙ্‌ক্তিতে ভাগ্যেব পবিহাস আলোচনায় ব্যঙ্গের সুর তীব্রতব হয়— 'বেঁচে যে রয়েছি এই-না ঢের / ভিখিরির আবাব পছন্দ'। পুরো কবিতাটির ভিতবে এইখানে একবার, আব সবশেষে 'ভিখিরির আবার পছন্দ' উক্তির পর আর-একবাব বিস্ময়চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ স্তবকে ব্যঙ্গ মন্দীভূত হচ্ছে সনিশ্বাস দুর্ভাগ্য স্বীকাবের ধরনে। তবে, এই স্তবকেই অবস্থার অনিশ্চয়তাকে বক্রদৃষ্টিতে দেখে নতুন সাহসের ছন্দ জাগছে শেষ পঙ্‌ক্তির 'কেটে যাবে দিন আনন্দে' উক্তিতে। মনের মেঘও কেটে যাচ্ছে বলে, শেষে, আরো বহুকে একই দুর্দশার সামিল দেখে, অসম জীবনব্যবস্থাকে হৈ হৈ করে ধিক্কার-জানানো বিদ্রূপ হতে পেরেছে সবশেষের উচ্চারণ— 'ভিখিরির আবার পছন্দ!'

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি

এক.

কবিতার পিছনে কবির বাস্তব জীবন-কথা সন্ধান করা সংগত হোক / না হোক, কোনো কোনো কবিতার ক্ষেত্রে পাঠকের মনে বাস্তব ঘটনার ছবি অনিবার্যভাবে জেগে ওঠে। ১৩০৯ সালের 'স্মরণ' কাব্যে, সেই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে প্রয়াত মৃণালিনী দেবীর শোকগাথা বিন্যস্ত হয়েছে, সে কথা সকলেই জানেন।

'আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সংগোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।'

'স্মরণ'-এর এই ব্যাকুল উচ্ছ্বাস তিরিশ বছর পরের অগ্রহায়ণে রচিত 'মূল্যশোধ' কবিতা থেকে ক্রমে বিবর্তিত রূপে 'শেষ সপ্তক'-এর 'এক' নম্বর কবিতায় সংযত গভীর বেদনার নিদর্শন হয়ে উঠেছে। আর 'মূল্যশোধ'-এ যে অনুভূতি বাস্তব স্মরণকালের অব্যবহিত বলে মনে হয়--- ক্রমরূপান্তরে তা শিল্প হিসেবে হয়ে ওঠে সার্থকতর।

১ অগ্রহায়ণ তারিখাঙ্কিত 'মূল্যশোধ' প্রথমে ১৩৩৯ সালের 'রূপ-রেখা' পত্রে ছাপা হয়েছিল। 'শেষ সপ্তক'-এর ভাদ্র ১৯৫৮ সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে 'মূল্যশোধ' এবং তার পাঠান্তরের সঙ্গে গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠের ভেদ নির্দেশ করা আছে।[৩৪০] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত '234' অভিজ্ঞানযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে 'রূপ-রেখা'র ছাপা পৃষ্ঠার উপরে বয়োবৃদ্ধ কবির কম্পিত হস্তের কাটাকুটি এবং সংযোজন দেখতে পাওয়া যায়। একই বাচ্যার্থ প্রকাশের প্রকারভেদ— এই তিন রূপে লক্ষণীয়। একই বক্তব্যকে একই ছন্দে কবিতায় সাজাতে কাটাকুটি করতে হয় কেন, সেইটি সন্ধানের বিষয়।

এই নিবন্ধে 'ধ্বনি'র ভূমিকা ও পরিধি প্রসঙ্গে আমরা বলেছি, কবিতা হচ্ছে শব্দ আর নিঃশব্দের গ্রন্থনা। শব্দ যা বলে, নিঃশব্দের এলাকায় চলে তার দ্যোতনা। নিঃশব্দের সেই অবকাশ রেখে, শব্দকে থাকতে হবে উচিত সীমার ভিতরে।

অবনীন্দ্রনাথের বচন আছে— কী আঁকব আর কী লিখব কেবল সেই জানাটাই জানা নয়, কতটুকু আঁকব না কতটুকু লিখব না সেই জানাটাই আসল জানা।[৩৭১] শিল্পোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে এই বলবার আর না বলবার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কবিতার কাটাকুটির ক্ষেত্রে শব্দ আর নিঃশব্দের সীমা নির্ধারণ অন্যতম বিবেচনার বিষয় বলে মনে হয়।

'রূপ-রেখা'য় প্রকাশিত মূল শোধ কবিতা পাণ্ডুলিপতে তার পাঠান্তর. আর শেষ সপ্তক'-এর প্রথম কবিতার মধ্যে বাক্ধ্বনি ব্যবহারে সংখ্যাগত তেমন তারতম্য নেই। 'মূল্যশোধ' আর তার প্রথম পাঠভেদে এ বিষয়ে যাও-বা পার্থক্য আছে, অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত রূপের সঙ্গে প্রথম রূপের ভেদ তার চেয়ে কমেছে। পাঠ তিনটি উদধৃত করে, তারপরে ধ্বনিব্যবহারের একটি তুলনাত্মক সারণি উপস্থাপন করছি।

'রূপ-রেখা'য় প্রকাশিত 'মূল্যশোধ' –

তোমাকে পেয়েছি বলে জেনেছিলেম,
কোনো দাম কর নি দাবি।
দিন গেছে রাত গেছে,
দিয়েছ ডালি তোমার উজাড় করে।
একবার আড়চোখে চেয়ে
ভাণ্ডার ভরেছি অনায়াসে আনমনে।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে পূর্ণ করে,
যাচাই করি নি
আপন গর্বে ছিলেম উদাসীন॥

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
'তুমি আমার রাজা,
তোমাকে যা দিই—
তোমার রাজকর যে তার চেয়ে অনেক বেশি,

আরো দেওয়া হল না
কেননা, আরো যে আমার নেই।'
বলতে বলতে তোমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।
আজ তুমি গেছ চলে,
আর ফিরবে না কোনো দিন।

এত দিন পবে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা।
নিয়েছি মাথায় তুলে, নিয়েছি বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে মাটিতে
যেখানে তোমাব দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।
প্রাণ ভরে উঠল বেদনায়
ঢেলে দিলেম তোমার উদ্দেশে।
এত দিনে তোমার দাম দেওয়া হল
পেলেম তাই পূর্ণ করে॥

'রূপ-রেখা'র ছাপা পৃষ্ঠাতে বর্জন-সংযোজন করা পাঠ—

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে
তাই যাচাই করি নি
কোনো দাম কর নি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় করে।

আডচোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে।
পর দিনে গেলেম ভুলে।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে পূর্ণ করে॥

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
'তোমাকে যা দিই--
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি,
আরো দেওয়া হল না
আরো যে আমার নেই।'
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে ॥

আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন রাতের পর রাত আসে
তুমি আর আস না।
এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,—
নিয়েছি তুলে বুকে।

যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।
তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে ॥

'শেষ সপ্তক'-এ মুদ্রিত পাঠ—

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয় নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য কর নি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় ক'রে।

আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে ;
পর দিনে মনে রইল না।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে,
'তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি ,
আবো দেওয়া হল না,
আরো যে আমার নেই।'
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে।
আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পব দিন আসে, রাতের পর বাত.
তুমি আস না।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার বত্নমালা.
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়েব চিহ্ন আছে আঁকা
তোমাব প্রেমেব দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।

বাক্‌ধ্বনি ব্যবহারের তুলনাত্মক সাবণি—

	মূল্যশোধ	দ্বিতীয় পাঠান্তর	শেষ সপ্তকের 'এক'
নাসিক্য ব্যঞ্জন (ন ম ঙ হ্ন)	৭৩	৬৪	৬৯
কোমল ব্যঞ্জন (ত দ ল ব গ ড ড)	১১১	১০২	১০৩
মধুর ব্যঞ্জন (র রেফ)	৪৬	৫২	৫৪
উষ্ম ও উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জন (শ স হ এবং উষ্মতাধর্মী স্বরান্ত চ ছ জ ঋ ঠ থ ফ ঢ ধ ভ)	৬৫	৫৪	৫৯
অবশিষ্ট উপাদান জাতীয় ব্যঞ্জন (ক ট প)	৩২	৩২	৩১
অর্ধস্বর / অর্ধব্যঞ্জন (ই্ এ্ ও্)	২৪	২৩	২৫
সংবৃত স্বরধ্বনি (ই উ)	৫৯	৫৩	৫৪
অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি (এ ও)	১৩৯	১২৮	১৩১
বিবৃত স্বরধ্বনি (আ)	৭৩	৬৭	৬৯
অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি (অ অ্যা)	১৯	২১	২৩
মোট ধ্বনি	৬৪১	৫৯৬	৬১৮

'মূল্যশোধ'-এ ধ্বনিব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে বেশি— ৬৪১টি। দ্বিতীয় পাঠে তার চেয়ে ৪৫টি ধ্বনি কম আছে— মোট সংখ্যা ৫৯৬। গ্রন্থে গৃহীত পাঠে আদি কবিতা থেকে ২৩টি ধ্বনি কমে গেছে— মোট ধ্বনির সংখ্যা ৬১৮টি। এই ধ্বনিসংযমের ফলে ব্যঞ্জনা কিছুই ব্যাহত হয় নি। বরং কতটা না বললে না-বলা

কথার ঝংকার পাঠকচিত্তকে রণিত করবে— সেই দিকে কবির দৃষ্টি সজাগ থেকেছে। স্পন্দিত অনুভূতিটিকে একবার লিখে ফেলবাব পর সংস্করণের কালে সচেতন শিল্পবিচার কবিকে আনুকূল্য দিয়েছে।

কবিতাটির আদিরূপে প্রেমের 'দাম'-এর প্রসঙ্গ এসেছে। চূড়ান্ত রূপে, শেষে একবার 'দাম' কথাটি থাকলেও অন্যত্র 'দাম'-এর স্থলে 'মূল্য' ব্যবহার করেছেন কবি। সাধুরূপের ঐ প্রয়োগ বিষয়ের সমুচিত গাম্ভীর্যকে ধরেছে। 'শেষ সপ্তক'-এর কবিতায় 'দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত' এর সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, অনেক পরের চরণ 'দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত' উক্তি ভাষাগত প্রায়-সমতায় ছন্দের ইঙ্গিতে অবস্থাবিপর্যয় দ্যোতিত করে। 'মূল্য-শোধ'-এর 'আজ তুমি গেছ চলে'র পরে 'আর ফিরবে না কোনো দিন' বর্জিত হয়ে 'দিনের পর দিন আসে' ইত্যাদি চরণ বিন্যাসে— দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলে যাওয়ার সঙ্গে 'তার' চলে-যাওয়া, আর দিনের পর দিন রাতের পর রাতের আসার সঙ্গে 'তার' না আসার ভাবগত বৈপরীত্য ধ্বনিত করছে সুচারু-বিন্যাসের শিল্পসংগত কৌশলে। একে বলা যায় ভাবের ছন্দের ব্যঞ্জনা। এ ইঙ্গিত প্রথম পাঠে ছিল না।

'আড়চোখে চেয়ে / আনমনে নিলেম' বলতে 'আডচোখে' 'আনমনে' পদে আ-স্বরধ্বনির পর একটি হসন্ত ব্যঞ্জন, তার পরে ও-কারান্ত আর এ-কারান্ত ব্যঞ্জনের বিন্যাস 'আডচোখে' যাওয়াব সঙ্গে 'আনমনা' ঔদাসীন্যকে ধ্বনিসূত্রে সম্পর্কবদ্ধ করছে। আবার 'শবতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে পূর্ণ করে' চরণে 'পূর্ণিমা' আর 'পূর্ণ' পদের ধ্বনির অতিসাম্য দূর করে 'শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ' পরিবর্তনে আরম্ভের শ আর চরণশেষের শ-য়ের মিলে মৃদুতা এসেছে। অর্থের দিক থেকেও প্রেমের নিবেদন লগ্নে পরিবেশের সহযোগের ইঙ্গিতে বক্তব্যের সংগতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

কবিতাটির শেষ পাঠে যে বাক্‌সংযমের কথা বলেছি, তার আরো একটু অবকাশ ছিল মনে হয়। কে জানে, অহরহ কর্মব্যস্ত কবি উপযুক্ত অবসর পেলে হয়তো এই পরিবর্তনের জন্যে কলম তুলে নিতেন! নায়কের উদাসীন গর্ব যখন লোকান্তরিতা গৃহলক্ষ্মীর চরণচিহ্নের কাছে অবনত, তখনই বক্তব্যের পূর্ণচ্ছেদ ঘটতে পারত। প্রেমের দাম দেওয়া হল, বা পূর্ণ করে পাওয়া হল— খুলে বলবার প্রয়োজন ছিল না আর। এ বিবৃতি যেন এসে গেছে নিছক প্রথম লেখা

রূপটির 'মূল্যশোধ' নামের পথ ধরে। 'মূল্যশোধ'-এর 'তুমি আমার রাজা', 'আর ফিরবে না কোনোদিন', বা 'প্রাণ ভরে উঠল বেদনায়, ঢেলে দিলেম তোমার উদ্দেশে' যেমন দ্বিতীয় পাঠে সম্মার্জিত হয়েছে, শেষ দুই চরণের বিবৃতি দুটিও তেমনি পরিত্যক্ত হতে পারত।

এ রকমের বর্জনের নজির আছে রবীন্দ্রনাথে। যেমন শতবার্ষিকী সংকলন 'বিচিত্রা'য় দেখি, 'শিশুতীর্থ'-এর পাণ্ডুলিপিচিত্রের শেষ দুই চরণ মুদ্রিত পাঠ থেকে অপসৃত। গৃহীত পাঠের কবিতার অন্তিম পদ 'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের পাণ্ডুলিপিচিত্রে দেখা যায় এর পর আরো ছিল— 'পূর্বদেশের বৃদ্ধ মনে মনে বললে, / 'আমার দেখা হল।' ' ছাপবার সময়ে এই দুই পঙ্‌ক্তি ছাঁটাই করে জয়ধ্বনির রেশ ছড়িয়ে যাবার অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

দুই.

বর্জন আর সংযোজন করতে করতে কখনো কখনো এক কবিতা থেকে জন্ম নিয়েছে দুই কিংবা তার অধিক কবিতা। 'কল্পনা' কাব্যের 'দুঃসময়' ও 'অসময়' কবিতা, আর এ দুয়ের মূল— 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থে মুদ্রিত 'স্বর্গপথে' কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্রের কথা সকলেই জানেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, সঞ্চয়িতা, বা স্বতন্ত্র কাব্যগুলির নতুন সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে কবিতার পাঠান্তর সংক্রান্ত নানা তথ্য আছে। যেমন, ১৩৪৪ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে আলমোড়ায় বসে লেখা 'ছড়ার ছবি'র পাণ্ডুলিপিতে (১৭৮ক) 'বইচে নদী বালির মধ্যে' আর 'মরুর মতো ভাঙা' ছত্র দিয়ে শুরু দুটি কবিতা পাওয়া যায়। কিন্তু পরে অন্য পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্জন আর যোজন করতে করতে সেই দুটি কবিতা 'রিক্ত' নামে একটি কবিতায় রূপ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে পরবর্তী রূপান্তরকেই সর্বদা মান দিয়েছেন— এমনও নয়। একটি কবিতার ক্ষেত্রে, পূর্ব রূপটিকেই গ্রাহ্য করার ঘটনা আমাদের বিস্মিত করে। কবিতাটি 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'চৌরপঞ্চাশিকা'। 'ভারতী'র ১৩০৬ সালের ভাদ্র সংখ্যায় ঐ কবিতার একটি গম্ভীর রূপ ছাপা হয়েছিল। কিন্তু ১৩০৭ সালে প্রকাশিত 'কল্পনা'য় মুদ্রিত হল পাণ্ডুলিপিতে একদা 'নির্মমভাবে লাঞ্ছিত বা বর্জন-চিহ্নিত'[৩৪২] পাঠ! 'কল্পনা'য় গৃহীত পাঠের প্রথম স্তবকের পরে গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত 'ভারতী'তে ছাপা পাঠান্তরটির প্রথম স্তবক উৎকলন করছি।

১. ওগো সুন্দর চোর,
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যাব
কনকচাঁপার ডোর।
কত বসন্ত চলি গেছে হায়,
কত কবি আজি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চিরশয্যায়
ওগো সুন্দর চোব—
কোনো গানে আর ভাঙে না যে তা‹
অনন্ত ঘুমঘোর!

২. বহু বর্ষ হতে তব বিপুল প্রণয়
বেদনাবিহীন—
দীপ্তশিখাসম তব স্পন্দিত হৃদয়
স্তব্ধ বহু দিন—
হে বিহ্লণ কবি,
বিদ্যা তব কনকচম্পকগৌর ছবি
মধ্যাহ্নে খসিয়া পড়া চম্পকের মতো
ধূলিশয্যাগত
বহুবর্ষশত
বিরহের মিলনের সুতীব্র তাপন
চিরসমাপন।

গ্রন্থে গৃহীত কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রবাহিত। এই তানময় গাত প্রাচীন কবির কাব্যে কীর্তিত বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনার স্মৃতিচারণের জন্যে সংগত দূরকালের মহিমার অনুকূল বলে বোধ হয়ে না। তদুপরি, 'চোর' শব্দ সম্পর্কে আমাদের বদ্ধ সংস্কার 'ওগো চোর' সম্বোধনে প্রী।ত অনুভব করে না। অন্য পক্ষে, 'বিহ্লণ'কে সম্বোধন করে, তাঁর শ্লোক-ধৃত প্রণয়ের স্মৃতিপ্রসঙ্গ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যোগ্য গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য পেয়েছে। 'কল্পনা'র 'চোরপঞ্চাশিকা'র তারিখ '২৩ বৈশাখ ১৩০৪,/পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত:/৪জ্যৈষ্ঠ'। আব গম্ভীর ছন্দের পাঠটির তারিখ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪। অর্থাৎ কবি নিজেই যোগ্যতর অবয়ব সন্ধান করে কবিতার রূপান্তর

সৃষ্টি করেও, পরে অজ্ঞাত কারণে পূর্বতন পাঠটিকেই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। কোথাও কোনো বোঝাবুঝির ভুলে এ প্রমাদ ঘটেছে কি? না কি রূপান্তরেও প্রার্থিত স্বাচ্ছন্দ্য আসছিল না বলে পূর্বরূপটিই গ্রন্থে ঠাঁই পেল?

তিন.

পাঠান্তরের ক্ষেত্রে ছন্দান্তরই আমাদের বেশি চমকিত করে। কারণ, আমরা জানি কাব্যছন্দ মৌল অনুভবের স্বর থেকেই আপন স্পন্দ বুঝে নেয়। ছন্দে ঠিক স্পন্দটি না এলে কবিতা স্ফূর্তি হারাবে। যেমন ঘটেছিল 'খেয়া'র 'প্রভাতে' কবিতার পূর্বরূপের ক্ষেত্রে। 'স্মরণ'-এর পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে ৮+৬ পর্বের অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শুরু করে কাটাকুটি করতে করতে তখনকার মতো সে কবিতা সম্পূর্ণ করবার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মজুমদার পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খণ্ডের (যাতে 'স্মরণ'-এর কবিতা লেখা হয়েছিল) পাতায় লেখা হয়েছিল— 'পরিপূর্ণ আজি মোর অশ্রু সরোবর / কূল ছাপাইয়া গেছে দিক্ দিগন্তর!/ প্রভাতে উঠিয়া দেখি / মাঝে ফুটিয়াছে একি / শতদল পদ্মখানি সম্পূর্ণ সুন্দর! / সমস্ত আকাশ আজি তারি মুখপরে / নীরবে চাহিয়া আছে পরম আদরে। / বাতাস থামিয়া আছে / সুদূর তীরের কাছে—/ বিহঙ্গ গাহে না গান জানি না কি বিস্ময়ের ভরে।'—এই পাঠের নানান জায়গায় কেটে নতুন পঙ্‌ক্তি কিংবা পদ যোজনা করে দীর্ঘতর ৮+১০ মাত্রার পর্ব বিন্যাস করে লিখবার চেষ্টা করেছেন। উপরের উদ্‌ধৃতির শেষ চরণটি বেশি লম্বা হয়ে পড়েছে দেখে মনে হয়, ঐ ছত্র লিখবার আগেই তার উপরের অংশগুলির পর্বের মাত্রাসংখ্যা বৃদ্ধি করে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন কবি। তাই এই চরণটিতে কাটাকুটি ছাড়াই ৮+১০ মাত্রার পর্ব পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘ পর্ববিন্যাসেও কবিপ্রেরণা আর বোধির সংশ্লেষণে সম্ভূত স্পন্দ কাব্যছন্দে প্রাণ পেল না। এই গঠনেও ছন্দ প্রায়শ হোঁচট খেয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। 'এক বরষার রাতে এ আমার অশ্রুসরোবর / কল ছাপাইয়া গেছে কোথা চলি দিক্ দিগন্তর! / প্রভাতে উঠিয়া দেখি / মাঝে ফুটিয়াছে একি / শূন্যবনে একমাত্র শতদল সম্পূর্ণ সুন্দর! / সমস্ত আকাশ আজি অনিমেষ তারি মুখপরে / নিস্তব্ধ চাহিয়া আছে সুগভীর প্রশান্ত আদরে।' বাকিটা যেমনকার তেমনি আছে। খসড়াটি উপর-নীচে টানা দাগে আগাগোড়া কেটে দেওয়া।

'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের শ্রাবণ ১৩৬৩ সংস্করণে 'প্রভাতে' কবিতার মুখোমুখি ঐ

পাণ্ডুলিপিচিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সহজ স্রোতে 'খেয়া' কাব্যে মুদ্রিত পাঠে কবির উপলব্ধিটি সত্যি সত্যি 'সম্পূর্ণ সুন্দর' পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। 'এক রজনীর বরষণে শুধু / কেমন করে / আমার ঘরের সরোবর আজি / উঠেছে ভরে। / হেরো হেবো মোর অকূল অশ্রু- / সলিল মাঝে / আজি এ অমল কমলকান্তি / কেমনে রাজে। / একটিমাত্র শ্বেতশতদল / আলোকপুলকে কবে ঢলোঢল্, / কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্ / এমন সাজে / আমার অতল অশ্রুসাগর- / সলিল মাঝে!'

'খেয়া'র গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে— 'মূল রচনার কাল ১৩০৯ পৌষেব ৭ হইতে ১১ তারিখের মধ্যে; খেয়ার কবিতাটি ১৪ শ্রাবণ ১৩১২ তাবিখে রচিত।' তা হলে চূড়ান্ত গঠনের সঙ্গে আদি খসড়াব ব্যবধান তিন বৎসর কালের।

চার.

গান থেকে কবিতা, আবার কবিতা থেকে গান সৃষ্টি কববাব ফবমায়েশি কাজে ববীন্দ্রনাথকে আমরা গররাজি দেখি নি। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের ইতিহাস, এবং সে গ্রন্থে গানকে কবিতা করে তোলা, পরে আবার সেই কবিতাতে সুবারোপের ঘটনা স্মরণ করা যেতে পাবে। কবিতা রচনার বেলাতেও সৃষ্টির খেলায় তাঁকে আমবা অক্লান্ত দেখি। কাব্যছন্দে বাঁধা উৎকৃষ্ট কবিতার বক্তব্যকে গদ্যছন্দের ধাঁচে সাজিয়ে কবিতা গড়েছেন— এমন নজিরও তাঁর রচনায় রয়েছে। এতে তফাৎ কী দাঁড়ায় তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

১৯৩৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্ববে লেখা 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু' ('প্রান্তিক') কবিতা, আর ১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'শেষ সপ্তক'-এর 'আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি'-- একই বাচ্যার্থের এই দুটি কবিতাকে নিয়েই আমবা প্রথমে প্রসঙ্গটি বুঝবার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে রচনাকালের উল্লেখ নেই। তবু নানা কারণে 'শেষ সপ্তক'-এর কবিতাটিকেই পরবর্তী রচনা বলে মনে হয়। ঐ কাব্যের গ্রন্থপরিচয়েও এরকমই বলা হয়েছে— 'শেষ সপ্তকের তেইশ···সংখ্যক কবিতার সহিত প্রান্তিক (১৩৪৪) গ্রন্থের পনেরো···সংখ্যক কবিতা তুলনায়। ছন্দোবদ্ধ ঐ···কবিতার রচনা···১৩ / ৯ / ১৯৩৪ [২৭ ভাদ্র ১৩৪১]···তারিখে, ফলত শেষসপ্তক-ধৃত কবিতার পূর্বেই মনে হয়'। 'প্রান্তিক' গ্রন্থের শেষেও 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু' কবিতার ক্রমিক সংখ্যা

উল্লেখ করে বলা হয়েছে— '১৫ সংখ্যক কবিতাটি 'বিচিত্রা'র ১৩৪১ কার্তিক সংখ্যায় 'শরৎ' নামে মুদ্রিত হয়। শেষ সপ্তকের তেইশ সংখ্যক কবিতা ইহার গদ্য-রূপান্তর বলা যাইতে পারে।'

'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু' কবিতাটি সাধুভাষায় সমিল প্রবহমাণ ছন্দের দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে নিবদ্ধ। কবিতার মোট ১১৫৬টি ধ্বনির ভিতরে ব্যঞ্জনধ্বনি ৬২০টি, অর্ধব্যঞ্জন ২৫টি আর স্বরধ্বনি ৫১১টি।

নাসিক্য ব্যঞ্জন ঙ ন ম কবিতায় আছে ১১৭টি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো ৫টি অনুনাসিক স্বরের নাসিক্য ব্যঞ্জনা। দুয়ে মিলে সংখ্যার হিসেবে ১২২টি। উষ্মতাধর্মী ধ্বনিই এই কবিতায় সবচেয়ে বেশি। ৬৭টি শ স হ, ৫৪টি স্বরান্ত চ ছ জ ঝ, ৩৭টি স্বরান্ত খ ঘ ঠ থ ধ ভ, আর ২টি খণ্ড ৎ— মোট ১৬০টি। এই ব্যঞ্জন-গুলির মধ্যে ৪৩টি ধ্বনিতে সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জন আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। **স**ম, পু**ঞ্জ**, মে**ঘ**ভার, মূর্ছা, অ**স**ম্মানে, **যে**ন, **ভূ**মি, **ক্ষী**ণ**শ্বা**স, প্রা**চী**নতা, আঁ**খি**, **শূ**ন্যে, **হে**ন, **শ**ঙ্খ, **চ**ন্দন, **চ**মকিত, অনির্ব**চ**নীয়, **যে**ন, উ**জা**ন, অক**স্মা**ৎ, **যে**ন, **যে**ন, অ**জা**নিত, বি**স্ম**য়, **যে**ন, **ভ্র**মরের, দে**হ**মন, **ছি**ন্ন, **স**মস্তের, মা**ঝে**, **যে**ন, **জী**র্ণ, র**জ**নীর, মি**শা**য়ে, প**শ্চি**ম, নাম**হী**ন, মা**ঝে**, **সং**সার, স**হ**মরণের, বধূ**স**ম। ১২২টি নাসিক্য ধ্বনির সঙ্গে উপরে চিহ্নিত ৪৩টি উষ্মতাধর্মী ধ্বনিতে সঞ্চারিত নাসিক্য ব্যঞ্জনা একত্রে হিসেব করলে ১৬৫টি নাসিক্যগুণান্বিত ধ্বনি উষ্মতাধর্মী ধ্বনির মোট পরিমাণকে ছাপিয়ে যায়। তবে ১৬০ আর ১৬৫তে প্রভেদ তত বেশি নয়। ব্যঞ্জনগুলির ভিতরে এই দুই ধ্বনির প্রভাবই কবিতাটিতে প্রধান। এখানে উল্লেখ করা ভালো, নাসিক্যগুণ কেবল উষ্মধ্বনিতেই সঞ্চারিত হয়— তা নয়। নাসিক্য-ব্যঞ্জন আপনার উভয়পার্শ্বের যে-কোনো ধ্বনিতেই মধুর ব্যঞ্জনা বিস্তার করে; তবে অন্যান্য ধ্বনির চেয়ে উষ্মধর্মের উপর এই গুণের প্রভাব বিশেষ তাৎপর্যবহ বলে এ আলোচনা অপরিহার্য হয়। উষ্মধর্মের দীর্ঘশ্বাসে মাধুর্যগুণের সংযোগ দুঃখবেদনার সঙ্গে মধুর অনুভবের মিশ্র বোধ সূচনা করে।

মধুর আর কোমলস্বভাবী অন্য ধ্বনির সংখ্যাও এই কবিতায় কম নয়। ত ৬৫টি, অন্যান্য কোমল গম্ভীর ঘোষ ব্যঞ্জন— ল ৪৪টি, হসন্ত জ ১, গ ১৬, দ ২৪, ব ৩৭, ড় ২, রেফ ১২, আর র ৭২টি। মোট ২৭৩টি। ৩৪টি ক, ৩টি ট, ২৯টি প, আর ৪টি হসন্ত চ এই ৭০টি ধ্বনিকে ব্যঞ্জনাশক্তিতে লঘু উপাদানশ্রেণীতে ফেলা যায়। ব্যঞ্জনধ্বনির হিসেব থেকে বলা চলে উষ্মতাধর্মী ধ্বনির যথেষ্ট সদ্‌ভাব সত্ত্বেও

নাসিক্য ব্যঞ্জনার অধিকতর প্রভাব এবং কোমল ও মধুর ধ্বনির সংখ্যাগরিষ্ঠতা কবিতাটিতে কোমল মধুর স্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। বরং কোমল মাধুর্যের সঙ্গে উষ্মতার যোগ উপলব্ধির নিবিড়তা নির্দেশ করছে— যেমন আমরা 'চম্পা' কবিতায় দেখেছি।

এইবার পুরো কবিতাটি সংকলন করে বাচ্যার্থের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমি-পানে
অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা.
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বদ্ধপ্রায়। শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে,
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে,
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা॥

আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে
আপনারে দেখি আমি আপন-বাহিরে; যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল—

সর্ব দেহ মন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে ; রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বননীলিমায়
বিস্তরিল রহস্য নিবিড় ॥

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ -সম।

সহমরণের বধূর সঙ্গে সমতা ঘোষণার দরুন, কবিতাতে মৃত্যুর সাথে বোঝাপড়ার ব্যাপারটি চলে এসেছে। 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থ রোগমুক্তির পরবর্তী কাব্য হিসেবে সুপরিচিত বলে মৃত্যুপ্রসঙ্গের কথা মনে হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কবিতাটির রচনাকাল ইংরেজি ১৯৩৪ সাল। সমগ্র 'প্রান্তিক'-এ ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর কবিতা তিনটি এ কাব্যের অন্যান্য কবিতার বছর তিনেক আগের লেখা। কিন্তু ১৩৪১ সালের ১৫ বৈশাখ তারিখেই ১৪নং কবিতায় কবি লিখছেন— 'যাবার সময় হল বিহঙ্গের'। ১৬ নম্বর কবিতা আরো আগের, ৭ বৈশাখ ১৩৪১ তারিখের। এই সনেটটিতে পথিক হিসেবে দ্রষ্টা কবি এ জগতের কীর্তিনাশা ধারা প্রত্যক্ষ করে শেষে যদিও বলছেন 'তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে / অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে'— তবু, জাগতিক বিনাশের কথা তাঁর চেতনায় জাগরূক— সে সংবাদ পাচ্ছি। ১৫ নম্বর কবিতা 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু'র প্রস্তাবনাতেই সূর্যের বিরুদ্ধে মেঘের অবরোধ-ব্যূহের ছবি আলোর সঙ্গে ঘোর অন্ধকারের বিরোধের সূত্রে শ্বাসরোধকারী আবহ তৈরি করে। তারপরেই ঐ অবরোধের তুলনা হল 'ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা'।

পরের স্তবকে 'শরৎ'-এর জয়শঙ্খ আলোর অপরাজেয় দীপ্ত বিকাশে উঠল ঝলমলিয়ে। কবিতাটির আদি নাম 'শরৎ', রচনাকালও শরৎ। ফলে বর্ষার

ঘনঘটাকে অকলঙ্ক হাস্যচ্ছটায় অবহেলে অপসৃত করবার এই বাণীকে ঋতুগাথা মনে করবার বাধা হয় না। কিন্তু ভিতরমুখে চরণ চলছে এর পর। পরিবেশ-বর্ণনা-অন্তে তরুণ আলোকে অনির্বচনীয় নবীনের দর্শন পাবার কথাসূত্রে এল আত্মপ্রসঙ্গ। তীর্থযাত্রী কবি যেন দূর ভবিষ্যতের তীর থেকে বিপরীত স্রোতে ভেসে চলে এসেছেন আলোকিত বর্তমানে। এবারে এল 'প্রান্তিক' কাব্যের বহু আলোচিত সত্তাদর্শনের প্রসঙ্গ— 'আপনারে দেখি আমি আপন-বাহিরে, যেন আমি / অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি / সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন'। 'প্রান্তিকের কবিতা শারীরিক অতীতকে খুলে নেবার কবিতা।'[৩৪৩] পরিষ্কার বলা হল 'পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি, / নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয় / ঘুচালো সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয় / প্রকাশিল তার স্পর্শে'। এই বিকাশের বিস্ময়কর নূতনত্ব এইখানে যে, প্রভাতের গানে রজনীর মৌন যুক্ত হওয়াতে এ আলো অবিমিশ্র উজ্জ্বলতার প্রকাশ নয়। এই নূতন— স্পর্শে অভাবনীয়, শ্রবণে বিমিশ্র, দৃশ্যে নামহীন রহস্যে নিবিড়।

পশ্চিমদিগন্তের ঐ মৃত্যুঘনিমা সত্ত্বেও কবিতার শেষ স্তবকে চিরযাত্রী আত্ম-পরিচয়ে ভাস্বর কবিহৃদয়ে মুক্তিমন্ত্রের সংগীত বেজে উঠল। এর তুলনা দেওয়া হয়েছে সংসারযাত্রার প্রান্তে উপনীত সহমরণের বধূর অবস্থার সঙ্গে।

প্রান্তিক অনুভবের কবিতাই বটে। কিন্তু এর জন্যে বাস্তবিক কবির রোগাক্রান্ত দশা পার হয়ে আসতে হয় নি। এ কবিতা রচনার আগে কবি সিংহল থেকে ঘুরে এসেছেন। ২৬ আর ২৭ শ্রাবণ হলকর্ষণ উৎসব উপলক্ষে 'শ্রাবণ-গাথা'র অভিনয়ে 'নটরাজ' ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ৩১ আগস্ট সদ্য কারামুক্ত সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফার খানের 'যথোচিত সংবর্ধনা'র আয়োজন করেছেন। এবং প্রতি সন্ধ্যায় আশ্রমবাসীদেরকে কিছু-না-কিছু পাঠ করে শোনাচ্ছেন। সান্ধ্য বৈঠকে কখনো কখনো টেনিসন বা ব্রাউনিংয়ের কবিতা পড়ে মুখে মুখে তার অনুবাদও করছেন। ২১ অক্টোবরে গিয়ে উপস্থিত হলেন মাদ্রাজে।[৩৪৪]

ঐ কবিতা রচনার ঠিক পরদিনে লেখা 'প্রলয়' ঠাঁই পেয়েছে 'বীথিকা' কাব্যে (ভাদ্র ১৩৪২)। 'বীথিকা'য় ছাপা নানা কবিতায় রচনার তারিখ ১৯৩২, ১৯৩৪ ১৯৩৫। জীবনের শেষভাগে পরের কবিতা আগের গ্রন্থে, আগের কবিতা পরের গ্রন্থে ছাপানো চলছিল। 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কবিতা রচনায় 'ছড়িয়ে-পড়া বিশৃঙ্খল মনকে কোনো-একটা কেন্দ্রের দিকে নিয়ে আসার কাজে রুগ্‌ণতা'

সাহায্য করেছে কি-না— শঙ্খ ঘোষের এই প্রশ্ন 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু' কবিতার ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে যায়। শঙ্খ ঘোষ 'রুগ্‌ণতা' প্রসঙ্গটির বিস্তার করে আরো বলেছেন— 'দুঃখের নিবিড় উপলব্ধির মতো এও হয়তো সূক্ষ্ম মনের কাছে তীব্র-ভাবে অস্মিতাসূচক, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হবার এ এক যোগ্য মুহূর্ত। এই রুগ্‌ণতার আঘাতে এল শূন্যের বোধ, গহ্বরের বোধ, আর তারপরেই সে-গহ্বর দ্রুত ভরে উঠতে লাগল জ্যোতির্ময়গুলে, আর এইভাবে একাকার হয়ে এল দৃশ্য আর দ্রষ্টা।'[৩৪৫] কোনো দুঃখের নিবিড় উপলব্ধি আলোচ্য কবিতার উৎস হয়েছিল কি-না সে ইতিহাস কবির জীবনচরিতে পাই না। অভাবে, বার্ধক্যজনিত মৃত্যুভাবনার পীড়ায় কি কবি এমন চেতনার মুখোমুখি হয়েছিলেন— যা থেকে মৃত্যুমুখী রোগের আক্রমণের পূর্বেই তিনি আপনাকে দেখতে পাচ্ছিলেন আপনার বাহিরে ?

'শেষ সপ্তক'-এর 'আজ শরতেব আলোয় এই যে চেয়ে দেখি' কবিতাও কবির আশি বছর বয়স পার হবার পরের রচনা। এখানেও 'দৃশ্য' আর 'দ্রষ্টা'র একাকারত্ব ঘটিয়ে কবি বলছেন— 'আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে'। রচনাশৈলীর দিক থেকে পার্থক্য হয়েছে কথ্য ভাষায় অসমপঙ্‌ক্তির গদ্যছন্দে বক্তব্য বিন্যাসেব ফলে। সমিল প্রবহমাণ ছন্দে সাধুভাষায় আবেগের যে চাপ এবং তরঙ্গময়তা অনুভব করা গেছে, গদ্যছন্দে সেই চাপ মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ গতি এসেছে।

'শেষ সপ্তক'-এর গদ্য কবিতার ভাষায় আর 'কথা'র বা 'খবর দেবার ভাষা'য় তফাৎ আছে কি নেই, তা নিয়ে খানিকটা বাদানুবাদের সুর শোনা যায় কবির উক্তিতে। 'অনেকে মনে কবেন, কবিতা লেখা এতে সহজ হযেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঁধা ছন্দেই তো রচনা হুহু করে চলে, ছন্দই প্রবাহিত করে নিয়ে যায়; কিন্তু যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্বদা সতর্ক করে রাখতে হয়।'[৩৪৬] পত্রেও ক্ষোভ জানিয়েছেন 'লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই···চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্ম-রাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি'।[৩৪৭]

'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু' লিখবার কালে আবেগমুক্তির পরেই এর রূপান্তর রচনা হয়েছে মনে করা যায়। আবেগ-সংক্রমিত চিত্তের কবিতা, আর তার পরের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এখানে উদ্ধৃত করি— 'কোনো সদ্য-আবেগে মন যখন

কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভালো'।[৩৪৮] উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য কবির আবেগেব মুহূর্তটি বিষয়ে অবহিত নই। ছন্দোবেগের সূত্রে প্রথম কবিতায় আবেগের যে চাপ অনুভূত হয়, দ্বিতীয় কবিতায় তা সেই মাত্রায় নেই— এটুকুই শুধু বলা যায়। 'জীবনস্মৃতি' থেকে উদ্‌ধৃত কবির উক্তি অনুসারে অনুমান করতে হয়, প্রথম কবিতাও তা হলে আবেগের সঙ্গে অব্যবহিত নয়। কারণ, 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু' কবিতাব গাঢ় ভাবব্যঞ্জনাকে 'গদ্‌গদ' ভাব বলা চলে না! কবির হৃদয়াবেগের সঙ্গে প্রথম কবিতা রচনাকালের ব্যবধান থাকুক-না-থাকুক, দ্বিতীয় কবিতার সঙ্গে খানিক ব্যবধান ঘটেছে ঠিকই। এ অবস্থায় ব্যবধান-সংক্রান্ত অনুমানের পথ ছেড়ে বাস্তবে কবিতা দুটিতে কবিত্বের রঙ কেমন ফুটেছে, তাই দেখতে হবে।

'শেষ সপ্তক' গ্রন্থ প্রকাশের সমসাময়িক একটি পত্রে, কবিতায় বর্ণিত বোধের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। 'জীবন-আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে— এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফিরবার মুখে— বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়।'[৩৪৯] 'অবরুদ্ধ' শব্দটি এই সময়কার বিবরণেও চলে এসেছে। বাস্তবিক, বিষয়টির গাম্ভীর্য ভাষার ঐ গুরুত্ব দাবি করে। তবে, কোনো বিষয় সন্তোষজনকভাবে বলা হয়ে যাবার পর ফিরে বলতে গেলে সহজ হয়ে ওঠে বলেই হয়তো 'আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি' কবিতা ভাষা এবং বলার ভঙ্গিতে সেই সহজতা পেয়েছে। এই ভাষান্তর এবং ছন্দান্তরে কবিতাটির ধ্বনিব্যবহারের খতিয়ান নিয়ে দেখবার আগে কবিতাটি উদ্‌ধৃত করা যাক।

আজ শরতের আলোয় এই-যে চেয়ে দেখি
মনে হয়, এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে॥

কল্পনা করছি—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থযাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।
উজান স্বপ্নের স্রোতে
পৌঁছলেম এই মুহূর্তেই
বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে।
কেবলই তাকিয়ে আছি উৎসুক চোখে।
আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে—
অন্য যুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।
তাই তাকে নিয়ে এত গভীর কৌতূহল।
যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

আমার নগ্ন চিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খসে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে।
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায় নি,
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন—
ভোর হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন!

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকেব ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য ;
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি কবেই দেখতে পায়
মৃত্যুব ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

কবিতাটির মোট ৯১৬টি ধ্বনির ভিতরে ব্যঞ্জনধ্বনি ৪৮৮টি, অর্ধব্যঞ্জন ৩০টি, আর স্বরধ্বনি ৩৯৮টি। নাসিক্য ব্যঞ্জন কবিতায় আছে ৮৩টি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো ৪টি অনুনাসিক স্বরের নাসিক্য ব্যঞ্জনা। দুয়ে মিলে সংখ্যার হিসেবে ৮৭টি। সংখ্যার দিক থেকে উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনই সর্বাধিক। ৩৭টি শ স হ, ৫২টি স্বরান্ত চ ছ জ ঝ, ৩১টি স্বরান্ত খ ঘ ঠ থ ধ ফ ভ, ৩টি হসন্ত খ (দেখলেম, চোখ, দেখতে), ১টি খণ্ড ৎ। মোট ১২৪টি উষ্মতাবিস্তাবী ধ্বনি। এই ব্যঞ্জনগুলিব মধ্যে ২৮টি ব্যঞ্জনে নিকটবর্তী নাসিক্য ব্যঞ্জনেব গুণ সঞ্চারিত হয়েছে। যেন, **প্রথম**, দ**র্শ**নি, **উজ্জ্বান**, পৌ**ছ**লেম, মু**হূ**র্তেই, অন্য **যু**গের, অ**জ্ঞান**া, **সম**স্তের, মা**ঝে**, **জ**ন**শ্রু**তির, **জী**র্ণ, অনির্ব**চ**নীয়তায়, প**র্য**ন্ত, **সা**মনে, প্র**থম**, **চঞ্চ**ল, **যে**ন, **ভ্রম**ণ, আ**ধু**নিকের, **ছি**ন্নতাব, **ফাঁ**কে **ফাঁ**কে, স**হ**মরণের, **ছি**ন্ন। ৮৭টি নাসিক্যধ্বনির সঙ্গে ২৮টি নাসিক্যগুণান্বিত— সর্বমোট ১১৫টি ধ্বনির সংখ্যা উষ্মতাবিস্তাবী ধ্বনির চেয়ে কমই হয়। ৯টি ধ্বনির তফাৎ। এ কবিতার ক্ষেত্রেও ১২৪টি ধ্বনির উষ্মতা আব ১১৫টি ধ্বনির নাসিক্যগুণের প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে। মূল কবিতাটির মতো এই কবিতাটিতেও কোমল ও মধুর ধ্বনি বিস্তর। ত ৫৮টি, ল ২৬টি, অন্যান্য কোমল গম্ভীর ঘোষ ব্যঞ্জন— গ ১১, ড ১, ড় ১, দ ২০, ব ১৯, হসন্ত জ ৫, রেফ ৯, আর র ৭২টি। মোট ১৩৮টি কোমল মধুর ব্যঞ্জনাময় ধ্বনি; ২৮টি ক, ১টি ট, ২৮টি প, ১টি হসন্ত চ, আর 'দেখছি' পদের ১টি হীনপ্রাণ হসন্ত খ— এই ৫৯টি ধ্বনিকে ব্যঞ্জনাশক্তিতে লঘু উপাদানশ্রেণীতে ফেলব। উষ্মতাগুণযুক্ত ধ্বনি কিছু বেশি হলেও, শেষ পর্যন্ত ১৩৮টি মধুব কোমল গুণের ধ্বনির প্রভাবে 'সহমরণের' হুতাশের চেয়ে 'বধূ'র অন্তরমাধুর্যের ভাবই কবিতার মূল স্বর হয়ে ওঠে। জীবন-

আকাশের আলোর ম্লানিমায় অবরোধের অনুভব থেকে একাকিত্বের পীড়া, শূন্যতার বা গহ্বরের বোধ জাগলেও সে গহ্বর দ্রুত ভরে উঠতে থাকে 'জ্যোতির্মণ্ডলে'। মৃত্যু বা জরার আবরণ ছিন্ন হয়ে চির-যাত্রীর চোখে ভেসে ওঠে চিরজীবন।

ধ্বনিব্যবহার প্রণালীর দিক থেকে দুই কবিতায় মিল রয়েছে। বক্তব্য বিন্যাসে, আরম্ভেই কিছু কাট ছাঁট দেখা যায়। যেমন মূল কবিতার অবরোধের কথা আর ছবি পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় রূপে। 'প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ' উল্লেখে সংক্ষেপে জীর্ণতার বা পুরাতনের ক্লান্তির ইঙ্গিত এসেছে। শরতের আলোয় নতুন করে দেখা হল— সরাসরি এইটুকু খবর দেওয়া হচ্ছে। শরতের আবির্ভাব-বর্ণনার জাঁকও এ কবিতা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সাধুভাষায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ঐ ভূমিকা আর জাঁক সংগত হলেও, কথ্যভাষার গদ্যছন্দে বেমানান। 'প্রান্তিক'-এর কবিতার প্রথম স্তবকের ৭টি চরণ আর দ্বিতীয় স্তবকে শরতের অবতারণের জন্যে লেখা ৫টি মোট ১২টি, কিংবা, দুই স্তবক সন্নিহিত প্রান্তবর্তী ভাঙা চরণ দুটি জুড়ে নিয়ে বলা যায় ১১টি চরণের বদলে, রূপান্তরে মোটামুটি ছোটো দৈর্ঘ্যের ৫টি চরণে উপক্রমণিকা হয়ে গেল।

প্রথম কবিতার ২৪ ছত্রের দ্বিতীয় স্তবক, গদ্যছন্দে দু-টুকরো হয়ে গেছে। প্রথম ভাগে নাতিদীর্ঘ ১৫টি লাইন, দ্বিতীয় ভাগে তার চেয়ে দীর্ঘ ১৩টি লাইন। গুন্‌তিতে ৪ ছত্র বেড়ে গেলেও— মোট ধ্বনির হিসেবে 'প্রান্তিক'-এর কবিতায় দ্বিতীয় স্তবকে যেখানে মোট ৮২৪টি ব্যঞ্জন অর্ধব্যঞ্জন আর স্বরধ্বনি, সেখানে 'শেষ সপ্তক'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে একত্রে ৬০৯টি ব্যঞ্জন অর্ধব্যঞ্জন আর স্বর-ধ্বনি। রূপান্তরের অংশটিকেই অল্পতনু বলতে হবে।

কিন্তু, প্রসঙ্গের সরাসরি অবতারণার ফলে জীবনের বহুব্যবহার-জীর্ণতার কথা তেমন করে বলা হয় নি বলেই বুঝি দ্বিতীয় স্তবকে 'অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে'র নিজের দিকে নিজের 'উৎসুক চোখে' তাকিয়ে থাকবার কথা আর-একবার বলা হল। তা হোক, এই দ্বিতীয় উল্লেখও পাঠকের মনে পুনরাবৃত্তির বোধ জাগায় না। মূল কবিতাতেও একথা বার কয় আছে। তাতে আপনার জীর্ণতাছেদী নবীন রূপ দেখবার ঐকান্তিক ইচ্ছাটিকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পাঠের তৃতীয় স্তবকে আবার সে কথার পরপর একাধিক উল্লেখে সৃষ্টিকাজে অপেক্ষিত নির্মমতার অভাব অনুভব করি। 'জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে / যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত, / যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর / তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খসে'। নগ্ন চিত্ত সমস্তের মাঝে মগ্ন হয়ে অস্তিত্বের অনির্বচনীয় এবং সামগ্রিক মূল্যে উদ্‌ভাসিত হল— এই

প্রসঙ্গের মাঝখানে আর-একবার জীর্ণ উত্তরীয় খসে যাবার কথা কি এমন অপরিহার্য ? তা ছাড়া, 'যার' 'যা' 'তার' পদের বিন্যাসে বক্তব্য বিষয়কে পরস্পর অন্বিত করায় ভাষাতে আড়ষ্টতা এসেছে। উপরন্তু, প্রকাশভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে সংহতির অভাব।

পরের পর্যায়েই রহস্যের যবনিকা চঞ্চল হয়ে উঠছে আশ্চর্য বাঙ্‌ময়তায়। তৃতীয় স্তবকের শেষ দুটি ছত্রে প্রকৃতির ছবি এঁকে সেই বাণীর বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে / প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন!' কিন্তু তার আগের বিবৃতি যেন বোবা হয়ে রয়েছে। 'যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায় নি / জগতেব সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত / আমাব সামনে খুলেছে তার অচল মৌন'। 'যে' 'সেই' 'তার' এততর নির্দেশেও, ভাষায় সে মৌন খুলেছে কি? মূল কবিতার 'রজনীর মৌন সুবিপুল / প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল / পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বননীলিমায় / বিস্তারিল রহস্য নিবিড।' --অনেক সংহত প্রকাশে ব্যঞ্জনায় মুখর। কিন্তু রূপান্তরে প্রকাশটি না হল বিশদ-- না ইঙ্গিতস্পন্দিত।

দ্বিতীয় স্তবকেই 'অনাগত যুগ থেকে' ভেসে-আসা 'তীর্থযাত্রী'র সঙ্গে আমবা পরিচিত হয়ে গেছি। চতুর্থ স্তবকে আবার জানানো হচ্ছে 'আমাব এতকালেব কাছেব জগতে / আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক'। 'প্রান্তিক'-এ দূবের 'পথিকচিত্তে'র উল্লেখ এসেছে অন্য বক্তব্যের সূত্রে, সংক্ষেপে।

'প্রান্তিক'-এর উপসংহার আড়াই ছত্রে।— 'আজি মুক্তিমন্ত্র গায় / আমার বক্ষেব মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম, / সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ -সম।' 'শেষ সপ্তক'-এর শেষে ৯টি পঙ্‌ক্তি। বড্ড খুলে বলে দেওয়া হচ্ছে— 'তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে / দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।' এই অতিরিক্ত বিবরণের পরে এল আগের কবিতার সহমরণের বধূর তুলনা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে— 'সহমরণের বধূ / বুঝি এমনি কবেই দেখতে পায় / মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে / নূতন চোখে / চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ'। ভাষাভঙ্গিটি আঁটসাঁট আর ঋজু নয়।

তাহলে, মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ের প্রাক্কালীন ভাবনায় যতই নূতনের উপলব্ধি হোক, তার প্রকাশ গম্ভীর ওজন-করা চলন আর গাঢ় কণ্ঠস্বরই দাবি করে কি? যেমন আছে 'প্রান্তিক'-এর কবিতাটিতে? অন্তত আলোচ্য বিশেষ বোধের জন্যে 'প্রান্তিক'-এর অঙ্গ এবং ছন্দই যেন ছিল উপযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদকে 'শেষসপ্তক'-এ যে 'স্বাদ' 'ভঙ্গি' 'অচিন্ত্যের ইঙ্গিত'

আর 'আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযমে'র অস্তিত্ব বিষয়ে লিখেছিলেন, তার ভিতরে উপস্থিত কবিতায় কোথাও কোথাও স্বাদ আর ভঙ্গি আস্বাদ্য। কিন্তু, 'অচিন্ত্যের ইঙ্গিত' বেড়ে উঠে বিবৃতি হতে চায় বলে, সার্বিক নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সংযমের শাসনে গদ্যছন্দের এই কবিতাও সুঠাম দেহ পেতে পারত হয়তো। কবিতার শুরুতে তার প্রখর পরিচয়ও আছে। পাণ্ডুলিপিতে বার-কয় কাটাকুটি করলেও 'শেষ সপ্তক'-এর কপি তৈরি করবার তাড়ায়, এ কবিতা দরকারের চেয়ে বড়ো হয়ে পড়ল কি? তাঁরই ভাষায়, তাড়াহুড়োর চিঠির মতো?

'প্রান্তিক'-এর কবিতাটির গঠনে ধ্বনিসংঘাত অনেক বেশি। বিশেষত রুদ্ধদলের সুষম বিন্যাস বিষাদভাব থেকে প্রসন্নতায় উত্তরণের সহায় হয়েছে। অক্ষরবৃত্তের চাল ধ্বনির ঐ আড়ম্বর স্বতঃস্বীকার করেছে। কিন্তু ঐ কবিতার ধাঁচের অলংকরণ দ্বিতীয় কবিতায় স্বচ্ছন্দ হয় নি। যেমন— 'নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে' ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল প্রথম কবিতায়, কিন্তু রূপান্তরে 'আমার নগ্ন চিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে' চরণের অনুপ্রাস লঘু শোনাচ্ছে।

একই কবিতার কবিস্বীকৃত দুই রূপের ভিতরে আমরা তা হলে কি ভেদ পেলাম? বাক্‌ধ্বনি ব্যবহারের দিক থেকে তারতম্য নয়, তারতম্য দেখা দিয়েছে শব্দ-নিঃশব্দের হিসেবে। সার্বিক অঙ্গ-বিচারে, দ্বিতীয় কবিতায় কিছু অতিরিক্ত কথা পাওয়া গেল— যার বহু আবৃত্তিতে মন্ত্রবাণীর সংযমে হানি ঘটেছে। 'তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে / দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য'— অন্য-সব উল্লেখসূত্রে আভাসে জানাই ছিল যথেষ্ট।

'প্রান্তিক'-এর কবিতায় ভাষা আর ছন্দে বিষয়োচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমরা কবির আবেগের সঞ্চালন উপলব্ধি করি, অনুভব করি সংযমের শুদ্ধতা। মনে হয় না কবিতায় এমন কোনো বাণী ছিল— যা না বললেও চলত। অঙ্গবিশ্লেষণ করে কাব্যাত্মার অভিমুখে অগ্রসর হতে গিয়ে 'প্রান্তিক'-এর কবিতায় আমরা যে সুমিত গতিবেগ পাই, 'শেষ সপ্তক'-এর কবিতায় তা পাই না। সামগ্রিক বিবেচনায় বলতে হয়, কবির অন্তরের স্পন্দ 'প্রান্তিক'-এর কাব্য আঙ্গিকেই স্বাভাবিক 'সৃষ্টি'র ছন্দ পেয়েছে। 'শেষ সপ্তক'-এর পাতা ভরাবার জন্যে 'নির্মাণে'র তাগিদ শেষ পর্যন্ত আত্মায় আর অঙ্গে পরস্পর লীন হয়ে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে নি।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকাজে কত পরিবর্তন শিল্পসংগত হয়েছে, আমরা দেখেছি। কিন্তু সফল কবিতার এই ছন্দান্তরের ক্ষেত্রে সেই সংগতি দেখা গেল না।

পাঁচ.

যে বাণীর যে ছন্দ, বিশেষত কবিতামন্ত্রের ক্ষেত্রে, তা কি সত্যিই অন্য ছন্দে বিন্যাস করে একই লক্ষ্যে পৌঁছুনো যায় ? 'পত্রপুট'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত 'যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে' কবিতা (পৌষ ১৩৪৪) গদ্যছন্দে যে বাণী আমাদের প্রাণে ধ্বনিত করে, 'নবজাতক'-এর মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বদ্ধ 'বুদ্ধভক্তি' (৪ জানুয়ারি ১৯৩৮) কি পারে সেই একইভাবে আমাদের প্রাণিত করতে ? কবিতা দুটির কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করছি, তা থেকে ধরা পড়বে এর একটি ছন্দই কেবল গ্রাহ্য হতে পারে।

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভর্তি করতে
বেরোল দলে দলে।

সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তূরী ভেরী গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

রচনাকাল— পৌষ ১৩৪৪ — পত্রপুট

বুদ্ধভক্তি

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির,
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।

তুরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরো থরো।

রচনাকাল— ৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ --নবজাতক

প্রধানত সাধুরীতির ভাষা ব্যবহার সত্ত্বেও রুদ্ধদলের সংঘাতমুখর সুষম মিলযুক্ত মাত্রাবৃত্তের ছাঁদে সাজানো 'বুদ্ধভক্তি'কে অপ্রধান পদ্য বললে ভুল হয় না। 'দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে / সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে' বা 'ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল / ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুলে-এর মতো শিশুতোষ ছন্দ-চর্চার নিদর্শনের ভাব কবিতাটির অঙ্গে প্রকট হয়ে বক্তব্য বিষয়ের ভীষণতাকে ধ্বনি-ঝংকারের আড়ালে ঢেকে ফেলেছে।

পক্ষান্তরে, 'পত্রপুট'-এর কবিতাটির কথ্যভাষা— মুখের কথার জোরে বক্তব্য বিষয়ের ভীষণতার সঙ্গে সুস্পষ্ট ধিক্কারের ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। 'নবজাতক'-এর কবিতার ছন্দের মসৃণ গতিতে পাচ্ছি কবিনিন্দিত সেই 'হুহু করে' চলবার 'বাঁধা ছন্দে'র দোষ। গদ্যছন্দের 'সতর্ক' কাটাকাটা উচ্চারণে তিরস্কার তীব্রতা পেয়েছে।

কবিতা দুটি বেশ কাছাকাছি সময়ে লেখা। 'পত্রপুট'-এর কবিতাটি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' নামে মাঘ ১৩৪৪ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়। আর ফাল্গুন ১৩৪৪ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ ছাপা হয় 'বুদ্ধভক্তি'। অর্থাৎ পদ্য-ছন্দোবদ্ধ রূপটিই পরে ছাপা হয়েছে। গদ্যকাব্যসংগ্রহ 'পত্রপুট'-এর প্রথম প্রকাশ এই কবিতা রচনার ঢের আগে —১৩৪৩ সনের ২৫ বৈশাখে। ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের 'পত্রপুট'-এর 'সতেরো' নম্বর কবিতা হিসেবে ঐটি ছাপা হয়। কিন্তু তার দু-বছর পরে ১৩৪৭ সালের বৈশাখে 'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ 'নবজাতক'-এ স্থান দিলেন। অর্থাৎ এ রূপটিকেও কবি মর্যাদা দিলেন। কিন্তু কেন? আমাদের বিচার বলছে 'পত্রপুট'-এর র গদ্যছন্দেই কবিতাটি যথার্থ প্রাণস্পন্দিত হয়েছে।

দুই কবিতার তর-তম বিষয়ে কবির মনেও প্রশ্ন এসেছিল, তার প্রমাণ 'পরিচয়'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে 'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটি প্রকাশের জন্য পাঠাবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে ঐ বিচার পরিহারের জন্য ওকালতি-সুর। ১৩৭৯ সালের সাহিত্যসংখ্যা 'দেশ' থেকে পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলন করি।— 'বোমা অর্ঘ্য দ্বারা জাপানী কর্তৃক বুদ্ধপূজার উপর একটি কবিতা লিখেছি, পরিচয়-এ প্রকাশ করবে আশা করে পাঠালুম— বলে রাখি এরই গদ্য রূপান্তর গেছে প্রবাসীতে।

রাধা বড়ো না শ্যাম বড়ো এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। যদি বলো কেউ কারো চেয়ে কম নয় তা হলে সৃষ্টিকর্তা খুশি হবে।'

এ দুই কবিতার তুলনায় একটি কথা পরিষ্কার হয় যে, কাব্যছন্দের আশ্রয়ই কবিতার জন্যে সংগত— কোনো কোনো মহলে প্রচলিত এমন কথা মোটেই প্রমাণসিদ্ধ নয়।

আলোচ্য প্রসঙ্গে 'প্রান্তিক'-এর ১৬ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে 'শেষ সপ্তক'-এর 'চৌত্রিশ' সংখ্যক কবিতার তুলনা মনে আসে। উভয় কাব্যের গ্রন্থপরিচয়ে 'শেষ সপ্তক'-এর রূপরচনাই পরবর্তী বলা হয়েছে। 'প্রান্তিক'-এর কবিতাটি সমিল প্রবহমাণ দীর্ঘপয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সনেট। সমাসবদ্ধ পদ এবং রুদ্ধদল সংঘাতের প্রাচুর্যপূর্ণ গাঢ়বন্ধের রচনা। ১৬ সংখ্যক এই কবিতাটির বাচ্যার্থের আলোচনা, ১৫নং কবিতা প্রসঙ্গে একবার এসেছে। 'প্রান্তিক'-এর ঐ কবিতাটির মতো এটিতেও কবির পরিচয় পথিক হিসেবে। পথিক এবং দ্রষ্টা। তবে দ্রষ্টা হিসেবে আপন সত্তাদর্শন নয়, জীবনের সত্য দর্শনের কঠিন অভিজ্ঞতার প্রকাশ উপস্থিত কবিতায়। শেষ দুই চরণে, আপন দুঃখসুখে অসীমের হৃৎস্পন্দনের অনুভব ঘোষণাতে জীবনপ্রবাহের সঙ্গে আপনার সাযুজ্য ঘোষণা। অনিত্য জগতের অঙ্গ হয়েও অনশ্বর অসীমের সঙ্গে ঐকাত্ম্যের উপলব্ধি। ভাষায় চিত্রে ছন্দে বিরাটের সমুদ্ভাসকে, শেষে ব্যক্তির দর্পণে প্রতিফলিত করে দেখলেন কবি।

এখানে কবিতা দুটি উদ্ধৃত করা দরকার।

প্রান্তিক : ১৬

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তিনিঃস্ব আজি; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের; অন্তর্হিত বিজয়নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি; বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে ধুলায় প্রণত, যে ধুলার 'পরে মেলে
সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষু জীর্ণ কাঁথা, যে ধুলায় চিহ্ন ফেলে
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। দেখিলাম বালুস্তরে

প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধুসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনাপ্রদীপ্ত ভালোবাসা।
তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

শেষ সপ্তক : চৌত্রিশ

পথিক আমি।
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তি-নিঃস্ব।
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের
অবমানিত ভগ্নশেষ,
তার বিজয়নিশান
বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো
গেছে উড়ে;

বিরাট অহংকার
হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধুলায় প্রণত.
সেই ধুলার 'পরে সন্ধ্যাবেলায়
ভিক্ষুক তার জীর্ণ কাঁথা মেলে বসে,
পথিকের শ্রান্ত পদ
সেই ধুলায় ফেলে চিহ্ন.
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে
সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে।

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,
যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে
কোন্ মহাতরী

হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।
এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

'শেষ সপ্তক'-এর কবিতায়, গদ্যছন্দে কথ্যরীতিতে বক্তব্য বিন্যাস করা হল। কিছু কিছু সমাসবদ্ধ পদ অবিকল চলে এল বাচ্যবিষয়ের গুরুত্বের টানে। ক্রিয়া-পদের ব্যবহারেই এল প্রধান পার্থক্য। কথ্যভঙ্গিতে, সংবদ্ধ ভাব খানিকটা কমেই আসে। পূর্ব কবিতার সনেট বন্ধ এবং ছন্দের নিবিড় শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে চরণপাতে অবকাশ পাওয়া গেল কিছু। অথচ, কবির মন রইল 'সর্বদা সতর্ক', 'ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসনে'র স্থলে 'আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম'-এ ধ্যানস্থ।

ছত্রের নতুন বিন্যাসে কয়েকটি প্রসঙ্গ পেল স্বাতন্ত্র্য। কবিতার উপক্রমেই দ্রষ্টার আমিত্ব ঘোষিত হচ্ছে পূর্ণ বাক্যে— 'পথিক আমি'। প্রথম কবিতায়, বজ্রাঘাতে যে বিজয়নিশান 'অন্তর্হিত'— দ্বিতীয় কবিতায় বজ্রাঘাত প্রহারে তা 'গেছে উড়ে'। 'গেছে উড়ে' আলাদা ছত্রে বিন্যস্ত হয়ে বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম কবিতার দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির শেষে বলা 'বিরাট সম্মান' দ্বিতীয় কবিতার স্বতন্ত্র চরণে 'বিরাট অহংকার' রূপে প্রকট। 'প্রান্তিক'-এ বলা 'লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা'— 'শেষ সপ্তক'-এ সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে' চরণে একই ক্রিয়াপদের সবিরাম পৌনঃপুনিক বিন্যাস বেদনার তারে বারবার আঘাত করেছে। প্রতিটি বিষয়ের উচ্চারণ মমতাবোধে বিজড়িত।

দুই কবিতার শেষের উপলব্ধিতে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। পদ্যছন্দস্পন্দিত কবিতায়, কবি আপন সুখদুঃখের তরঙ্গময় বক্ষে 'অসীমের হৃৎস্পন্দন' অনুভব করেছিলেন। গদ্যছন্দে, আপন 'হৃৎস্পন্দনে' অনুভব করেছেন 'অসীমের স্তব্ধতা'। ছন্দোবন্ধের প্রভেদের কারণেই কি প্রথম কবিতার 'স্পন্দন'-এর অনুভূতি দ্বিতীয় কবিতায় 'স্তব্ধ' হল? প্রথম কবিতার ছন্দস্পন্দে আত্মীয়তা স্থাপনের সূত্রে যে আশা ধরে রাখবার চেষ্টা, দ্বিতীয় কবিতার গদ্যছাঁদ সে আশার পথে না গিয়ে বাস্তব স্তব্ধতার বোধকেই অঙ্গীকার করছে?

দুটি প্রকাশভঙ্গির এই তুলনা, কোনো কবিতার ঘাটতি নির্দেশ করবার জন্য নয়। তার সুযোগও নেই। সব মিলিয়ে কবিতা দুটি হয়ে উঠেছে দুই স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মূল কবিতার স্রষ্টার হাতে রূপান্তরে ভেদ দেখা দিলেও তা অনধিকার চর্চা হয় না। কবিতা হয়ে উঠলেই হল। পদ্যবন্ধের কবিতাকে গদ্যছাঁদে সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সৃষ্টির খেলায় মেতেছিলেন— এইবারে তার সফলতার কাছে আমরা নত হই। কবির কথাই স্বীকার করতে হয় যে, ফরমায়েশি লেখায় (এ ক্ষেত্রে কবির নিজেরই ফরমাশ) মোটরের এঞ্জিনটিকে বাইরে থেকে চালু করবার পর মোটর তার আপন গতি পেয়ে গেছে।[৩৫১] শিল্পী-কবি সচেতন চেষ্টা নিয়ে কবিতার রূপান্তরণ শুরু করে, পুনর্বার বোধের গহনে বিচরণ করেই বুঝি মোটামুটি একই বাচ্যার্থের আরেকটি সার্থক রূপ সৃষ্টি করলেন। সিদ্ধ কবি ক্ষেত্রবিশেষে আদি প্রেরণার উৎসে পুনরায় অবগাহন করে এক কবিতাকে দ্বিতীয় সার্থক রূপ অর্পণ করতে পারেন, এ সিদ্ধান্ত এবার অনিবার্য হল।

অনুচিন্তা

'ধ্বনি থেকে কবিতা' পর্যায়ে পাঁচটি কবিতার বিচারবিশ্লেষণ থেকে আমরা নিম্ন-লিখিত বিষয় বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি— বিশেষ জাতি-সংস্কারের আওতাভুক্ত মানুষ আপন ভাষার কবিতার বাচ্যার্থ-নিরপেক্ষভাবে ১. বাক্‌ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া, ২. ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য, ৩. মুক্তদল ও রুদ্ধদলের বিন্যাস. এবং ৪. অনুপ্রাসের ধ্বনিমাধুর্য ও ভাবগত ইঙ্গিতের সূত্রে— অর্থাৎ সর্বৈবভাবে ধ্বনিগুণে কাব্যাত্মার পরিচয় পেতে পারে কি-না। মিলিয়ে দেখবার জন্যে বাচ্যার্থের আলোচনাও অপরিহার্য হয়েছে। সামগ্রিক ধ্বনিস্রোত বাচ্য-অর্থের সীমা অতিক্রম করে যে ব্যঞ্জনা আভাসিত করে, কবিতার অন্তর্নিহিত দীপ্তিকে যে আশ্চর্য নিপুণতায় পাঠকের অন্তরে পৌঁছে দেয় তার সন্ধান আমরা পেয়েছি। যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের পথেই ঐ সত্য আত্মপ্রকাশ করেছে।

কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন কবির বিচিত্র ছন্দের সার্থক কবিতা আহরণ। বাংলার প্রধান তিন প্রকৃতির ছন্দ ছাড়া গদ্যছন্দের কবিতাও আলোচনার জন্যে নেওয়া হয়েছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'. অক্ষর-বৃত্তের 'চম্পা', স্বরবৃত্তের 'সর্বহারা', এবং গদ্যছন্দের 'আমাকে একটি কথা দাও'। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পঙ্‌ক্তিশেষের খণ্ড পর্বে বিশৃঙ্খল মাত্রাবিন্যাসের সাহায্যে অভিপ্রেত ব্যঞ্জনা বিকাশের বৈশিষ্ট্যের দরুন শেষ কবিতা 'ভিখিরির আবার পছন্দ' আলোচনায় এসেছে। মনোযোগ দাবি করবার মতন এরকম আরো কবিতা বাংলাসাহিত্যে আছে, সন্দেহ নেই। আমরা মূল বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার জন্য মাত্র, সীমিত সংখ্যক দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়েছি। আরো কবিতা বিশ্লেষণ করবার বাধা ছিল না, কিন্তু একটা কোথাও থামতেই হয়।

কবিতার আত্মানুসন্ধান করতে গিয়ে সকল কবিতার সব রহস্যই যে উদ্‌ঘাটিত করা হয়ে গেছে, এমন হতে পারে না। ধ্বনির বিন্যাসের আরো নানা রকম পর্যালোচনা সম্ভব। আমাদের অবলম্বিত পথে অগ্রসর হয়ে কত দূর যাওয়া চলে, কবিতার মর্মকে খানিকটা ছোঁয়া যায় কি-না, তার কিছু পরীক্ষা করা হল শুধু।

'ধ্বনি থেকে কবিতা'য় পৌঁছুবার চেষ্টায় আমরা ধ্বনিঘটিত নানাবিধ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিগুচ্ছের হিসেব করে সেগুলির চরিত্র অনুযায়ী ব্যঞ্জনা অনুধাবনের

চেষ্টা করেছি। তা থেকে পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন জাগতে পারে। যেমন, 'মাতাল' শব্দের নাসিক্য ম, কোমল ত, তরল ললিত মধুর ল, আর উদারস্বভাব আ-ধ্বনির সঙ্গে এব অভিধাগত অর্থের এবং মাতাল সম্পর্কে আমাদের ধারণার কোনো মিল পাওয়া যায় কি ? নিন্দার পরিমাণ বাড়িয়ে যদি 'মদো মাতাল' বলা হয়, তাতেও আগত ম-ধ্বনির নাসিক্য লাবণ্য আর দ-ধ্বনির ঘোষ মাধুর্য কি বাগর্থগত নিন্দার তীব্রতাকে ধারণ করবে না ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ওতে বাচ্য-অর্থ অনুযায়ী প্রবল নিন্দা প্রকাশ পাবারই কথা। কিন্তু কবিতার বেলা তার খণ্ড ছিন্ন অংশ বা শব্দের ধ্বনিচরিত্রমাত্র আমাদের গণনার বিষয় নয়। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'ধ্বনি বিচার'-এ স্বতন্ত্র শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। যে কারণে, 'স্থূলতার আধিক্যে যাবতীয় ভ-কারাদি শব্দ স্থূলতা মনে আনে' মন্তব্যের গণ্ডিতে 'ভালো' 'ভালোবাসা' 'ভাব' ইত্যাদি শব্দ চলে আসে বলে চমকে উঠতে হয়েছিল। যুক্তি হিসেবে, ভ-য়ের পাশে ল-য়ের বিন্যাস স্থূলতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করছে, অথবা, 'স্থূলতা' পদে ওজনে ভারি গুরুত্বের ভাব কল্পনা করলে 'ভাব' 'ভালোবাসা' শব্দে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির বিবরণ পাওয়া যায়— ইত্যাকার ব্যাখ্যা খাড়া করা যেতে পারে। ভাষা-সৃষ্টির আদিতে অর্থের ইঙ্গিতপূর্ণ ধ্বনির সমন্বয়ে শব্দ গঠিত হয়েছিল কি-না— সে-সব গবেষণার সাহায্যে স্বতন্ত্র শব্দের ধ্বনিগত তাৎপর্য বিকাশের যুক্তি অনুসন্ধান করা হয়তো সম্ভব। আমরা কোনো কোনো শব্দ বা পদের ক্ষেত্রে (যেমন, 'ভিখিরির আবার পছন্দ' কবিতার 'একই' পদ) তার স্বতন্ত্র ধ্বনিগত তাৎপর্য নির্দেশ করলেও, মূলস্বরের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং সংগতি প্রসঙ্গেই, সে-সব পদের ধ্বনিবিন্যাসকে গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল— কবিতার পূর্বাপর ধ্বনিপ্রবাহে সার্বিক ভাবের স্রোত বয়ে চলে। সেই প্রবাহে পড়ে 'মদো মাতাল'-এর মতো শব্দবন্ধও পূর্ণস্রোতস্বিনীর মূল স্বরভঙ্গিটিতেই বিলীন হবে।

তা ছাড়া, কবিতার আত্মানুসন্ধানে আমরা সর্ববিধ ইঙ্গিতের সূত্রে ব্যঞ্জনার প্রতি মনোনিবেশ করে অগ্রসর হয়েছি। বাচ্যার্থের আলোচনাতে যেমন, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় চলমান বিবরণের আকস্মিক সংকট থেকে দৃশ্যরূপের সংকেতেই উত্তীর্ণ হয়ে আমরা কবির অন্তঃশীল সৌন্দর্যভাবনার ধারার পূর্ণতর পরিচয় গ্রহণ করতে পেরেছি। 'চম্পা' কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে উষ্মধ্বনির প্রাধান্য নাসিক্য অনুরণনের গোপন সঞ্চারে কেমন নিবিড় আবেগের সন্তাপে রূপান্তর নেয়, বিশ্লেষণে তা জানতে পেরেছি। উদ্দীপ্ত হবার আহ্বান সত্ত্বেও, 'সর্বহারা' কবিতার স্বরবৃত্ত ছন্দের শ্বাসাঘাত-

প্রাধান্য কবির সমবেদনার অশ্রুসিক্ত মমত্বের বাহন হিসেবে সাংগীতিক হয়ে উঠে কেমন একই সঙ্গে করুণ, আবার ক্ষণে ক্ষণে দৃপ্ত হয়েছে— সেও আমরা দেখেছি। এও দেখেছি, বিদেশী 'এঞ্জিন' শব্দ যান্ত্রিক ক্রিয়ার ছবি হিসেবে এসেও এঞ্জিন-চঞ্চল' বিন্যাসে অনুপ্রাসের গুঞ্জন এবং পরস্পর রুদ্ধদলের বিন্যাসে মাধুর্য সঞ্চয় করে বাংলা কবিতার বাক্যবন্ধে কেমন সহজে মিশেছে। 'ভিখিরির আবার পছন্দ' কবিতার শেষ স্তবকের বাক্‌ধ্বনির উচ্চারণ প্রাক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্য সমবেত উচ্চারণের উৎসাহে ঝঙ্কৃত হয়ে উষ্মধ্বনির প্রভাবকে কেমন অগ্রাহ্য করেছে, তাও আমরা লক্ষ করেছি। সর্বভাবেই, কবিতার স্বতন্ত্র শব্দ বা ধ্বনির হিসাব শুধু নয়, ধ্বনিস্রোত আপন সত্তায় কেমন করে কবিতার মূলস্বরকে বহন করেছে— সেইটি ছিল উপলব্ধির সূত্রে যুক্তিসহভাবে নির্ধারণের বিষয়।

'বাংলা ভাষার ধ্বনিচরিত্র' আলোচনার সময় যত খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ এসেছে, তার সবই কবিতা বিশ্লেষণের বেলা উত্থাপিত হয় নি, কারণ, নির্বাচিত কবিতাগুলিতে সকল ধ্বনির ব্যবহার ঘটে নি। যেমন— 'মেজদি'র জ়, বা 'ফিরোজা'র ফ় জ় ইত্যাদি। কিন্তু তবু, এ ধরনের আলোচনার পটভূমি নির্মাণের জন্যে মান বাংলাভাষার প্রচলিত ধ্বনির সম্যক্ বিবেচনা অপরিহার্য ছিল, সন্দেহ নেই।

'রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি. উপস্থিত নিবন্ধের শেষ প্রবন্ধ। এইখানে দেখা গেছে. বস্তুভিত্তিক অনুসন্ধান সত্যসন্ধিৎসুর কাছে অনেক অজানা দিক খুলে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের লেখা একই কবিতার একাধিক রূপের অনুপুঙ্খ-বিবেচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় নিবন্ধে আমরা দাবি করেছিলাম, কাব্যাত্মার জ্যোতির্ময় রেখাটি নির্দিষ্ট একটি ছন্দেই কেবল প্রাণস্পন্দিত দেহ পায়। সেই অনুসারে বলা হয়েছিল, সার্থক কবিতার ছন্দের পরিবর্তন তার আত্মার সর্বনাশ-স্বরূপ। অথচ আবিষ্কার করা গেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তর কোথাও কোথাও দুই ছন্দ অঙ্গীকার করেও, উভয়ত্র সমান প্রাণদীপ্ত হতে পেরেছে। মহৎ সৃজনী প্রতিভা সম্পর্কে কি তবে ব্যতিক্রমের কথা ভাবতে হবে? আবার এ কথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথেরও সব কবিতার দ্বিতীয় পাঠকে সমালোচনার অতীত বলে মনে করা যায় নি।

জানি না অন্য কবিরাও এক উপলব্ধিকে বিবিধ অঙ্গ এবং ছন্দে ন্যস্ত করে সকল অবয়বকে একইরকম প্রাণে সম্পন্ন করতে পারতেন কি-না। এ নিবন্ধে গৃহীত কবিতাগুলির ক্ষেত্রে, সে রকম পাঠান্তরের নিদর্শন পেলে আমরা তা বিশ্লেষণ

করে সত্যসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে পারতাম। অভাবে সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতাটিকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে অনুবাদ করে দেখেছি। তাতে মূলের বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় নি। জানি, এ-ই সব দেখা নয়। কে জানে যোগ্যতর হাতে পড়ে ভিন্ন ছন্দেও ঐ কবিতা প্রাণতরঙ্গিত হতে পারত কি-না! আপন ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে অন্তরে সন্দেহসংশয় জাগিয়ে রাখা দোষের নয়। উল্লেখ করা যাক, এই 'চম্পা' কবিতাটির প্রতি অনুরাগবশত রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছিলেন। *Lover's Gift and Crossing* গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রূপান্তরটি উদ্ধৃত করলে দেখা যাবে, সে অনুবাদকেও আমরা মূলের প্রতিস্পর্ধী জীবন্ত সৃষ্টি হিসেবে গ্রহণ করতে পারছি না।—

Champa

I opened my bud when April breathed
her last and the summer scorched with
Kisses the unwilling earth. I came half
afraid and half curious, like a mischievous
imp peeping at a hermits cell.

I heard the frightened whispers of the
despoiled woodland, and the Kokil gave
Voiee to the languor of the summer ;
through the fluttering leaf curtain of my
birth chamber I saw the wovld grim, grey,
and haggard.

Yet boldly I came out strong with the
faith of youth, quaffed the fiery wine from
the glowing bowl of the sky, and proudly
saluted the morning, I, the champa flower,
who carry the perfume of the sun in my
heart.

'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ'-এর 'পরিশিষ্ট'-এ তাঁর ৮ খানি কবিতার আংশিক, এবং 'সন্ধান' ও 'জাদুঘর' কবিতা দুটির সামগ্রিক ভিন্ন পাঠ মুদ্রিত হয়েছে।

৫৮. John Lyons সম্পাদিত *New Horizons in Linguistics* গ্রন্থে E. C. Fudge রচিত 'Phonology' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫৯. 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব', পৃ. ১৮

৬০. 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৩

৬১. এই গ্রন্থের ভাষা অনেকাংশে সুনীতিকুমারের 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে'র বিভিন্ন সংস্করণের মতো. কেবল কিছু সংযোজন বিয়োজন আছে। গ্রন্থের 'রচনা' অংশ গোপাল হালদার রচিত, ব্যাকরণ অংশ সুনীতিকুমার ও অনিলকুমারের।

৬২. 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'. পৃ. ৩৩

৬৩. *Bengali Self-Taught*, পৃ. 7

৬৪. 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'. পৃ ৬১

৬৫. তদেব, পৃ. ৪৩

৬৬-৬৯. 'ভাষা-বোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', (পরিবর্ধিত) নবম সংস্করণ, পৃ. ।৵০, ৩, ৪, ৫

৭০ 'অনেক স্থলে ঐ প্রথম এ-কার প্রসারিত বা বিকৃত। যথা— এমন, কেমন, খেলা…।' তদেব, পৃ. ১০

৭১. *Bengali Phonetics*, পৃ. 18-9

৭২. আবদুল হাই, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯

৭৩. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, 'বাংলা ভাষা', পৃ. ১৩৭

৭৪. *A Bengali Phonetic Reader*, পৃ 19

৭৫. 'In many instances an educated speaker of S C B may hesitate to use a clear, unambiguous [ɔ] in a certain item because it sounds too affected or pedantic, but on the otherhand does not like to use a clear, unambiguous [o], which would stamp his diction as colloquial or even uneducated. In such instances, consciously or unconsciously, he may use an intermediate vowel which is neither clearly one nor clearly the other.' *The Phonemes of Bengali*, 'Language', vol 36. Number 1 (part 1) January—March 1960, p. 39
S C B=Standard Colloquial Bengali.